জলাঞ্জলি।

গ্রাম্য সামাজিক চিত্র।

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র সেন প্রণীত।

নূতন সংস্করণ।

প্রকাশক

শ্রীআশুতোষ ধর

আশুতোষ লাইব্রেরী

৩৯।১ কলেজষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ঢাকা ও চট্টগ্রাম।

১৩৩১।

মূল্য ১।• পাঁচ সিকা।

ঢাকা

আশুতোষ প্রেসে

শ্রীরেবতীমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

পরমারাধ্যা বৈকুণ্ঠগতা স্নেহময়ী

৺সারদাসুন্দরী দেবী

মাতৃ ঠাকুরাণীর উদ্দেশে

আমার

আদরের ধন এই গ্রাম্য আখ্যায়িকা

জলাঞ্জলি

ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে উৎসর্গ করা হইল।

মা, তোমার স্নেহের সন্তান

শ্রীঅমূল্য চন্দ্র।

REMARKS ON JALANJALI.

Jalanjali, Palmful of Water, by Akrur Chandra Sen, printed by Lachman Basak and published by Lalit Mohan Das at the Dacca Adarsha Press.

Remarks :—

A faithful picture of Hindu family life before the *introduction of English education and western culture.* The author is an admirer of the social and domestic regulations of the Hindus and sometimes expresses himself rather strongly against the influence of western ideas which disturb the peace of happy Hindu homes. Though the style is sometimes disfigured with East Bengal idioms, the book is written in good Bengali. The *writer displays an exceptional knowledge of the* details of Hindu domestic and social regulations.

Calcutta Gazette of ~~6th March~~, 188~~6~~8. 8th May

Extract from the Report of the Bengal Library for 188~~6~~8 :—

Fiction :—

The works of fiction are both numerous and interesting. Though the great writers are almost all silent the works of imagination received during the year show that the generation of writers who are to succeed will not be inferior to the generation preceding them. The younger generation will be distinguished by their intimate knowledge of the country and their affectionate appreciation of everything Indian. The melancholy idea that the happy state of things which is passing

away under the influence of Western Civilization will not come back again forms the background of every picture they draw. *Jalanjali* which appears to be the best work of the year, is full of this idea. It paints a Hindu family of the mofussil in affluent circumstances, with a widowed sister, an orphan nephew, numerous dependents and extensive family connections. It shows how under the old regulations everything tended to increase the happiness of the people and the wealth and influence of the family; how in the good old days whether in happiness or in misery, people used to get hearty sympathy from their relations and neighbours. But a change has come over the spirit of Hindu Society. The first thing that the educated youngmen of the family do is to question the motives of Lakshman Ray the head of the joint family, and while he is anxious to secure the prosperity and happiness of the younger members they do everything to give a rude shock to the good old man's honest prejudices. With a melancholy heart he leaves the family to lay his bones in the holy city of Benares. With his departure the good name of the family comes to an end. The youngsters offend everyone, and are cheated in return. Gradually they get hardened in the world and become great oppressors of the tenants, thus setting up in the place of Lakshman Raya's mild despotism, tempered by time honoured prejudices and honest religious convictions, a despotism soured by selfishness and want of sympathy.

"মায়াদেবী" সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ লোকদিগের অভিমত।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন ঃ—"মায়াদেবীর" ভাষা ঠিক আপনার "জলাঞ্জলির" ভাষার মত। আপনার বয়স কালে "জলাঞ্জলি" লিখিয়াছিলেন, বুড় বয়সে "মায়াদেবী" লিখিলেন। ভাষা কিন্তু সেই সমান মনোহর ও সমান হৃদয়-গ্রাহী, অলঙ্কার দিয়া ভাষাকে সাজাইবার চেষ্টা একেবারেই নাই। গল্পটিও বেশ সুন্দর, সেই সেকালের জিনিস; বিষয় লইয়া দুই ভায়ে রেষারেষি এবং পরিণামে পূর্ণ সৌভ্রাত্রের সৃষ্টি। মায়াদেবীর চরিত্রও বেশ হইয়াছে। এমন সব মেয়ে ছিল বলিয়াই সেকালের একান্নবর্ত্তী পরিবার এত সুখের জায়গা ছিল। আমি এখন বাঙ্গালা নভেল অনেক পড়িতেছি সবই একঘেয়ে "থোড় বড়ী খাড়া" আর "খাড়া বড়ী থোড়"। আপনার মায়াদেবী পড়িয়া মুখটা অনেক পরিমাণে বদলাইয়া লইয়াছি। এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত এম্.এ, বলেন ঃ—"আজ আপনার উপহৃত "মায়াদেবী" পাইয়া একরূপ এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়াছি। আপনি ভূমিকায় অতি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, আপনার চিত্র সরল সাদা বিশুদ্ধ পরিষ্কৃত জলে খড়ি মাটি সংযোগে আঁকা। বিশেষ সুখের বিষয় এই যে আপনার এ খড়িমাটি সরস্বতীর গায়ের বর্ণিকার মত ভিতরে বাহিরে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। আজ কালকার গল্প লেখকেরা যে স্থানে গল্প আরম্ভ করেন, আপনি সেইখানে শেষ করিয়াছেন, তাই ইহার সুষমায় আবিলতা ও সৌরভে মাদকতা প্রবেশকরিতে পারে নাই। ১২৭১ সনের পূর্ব্ববঙ্গ কেমন ছিল

জানিনা, তবে জানি ১৬৩০ সনের পূর্ব্ববঙ্গেও অনেক ইতরতা সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদির প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও কাশীনাথের মত ভ্রাতা ও দেবর এবং মায়ার মত গৃহলক্ষ্মী ভ্রাতৃবধূর ঐকান্তিক অভাব ঘটে নাই। মানুষের সমাজে যেমন কখনও ইতরতা বর্জ্জিত হয় না, তেমনি পুণ্য প্রভা বর্জ্জিত হয় না। শিল্পীর রুচি অনুসারেই তাহার তুলিকা কেবল পাপ বা পুণ্যের চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে ব্যাপৃত হয়। এখনকার কথা যাহাই হউক আপনি এমন একটা মনোহর প্রাচীন কথা বলিয়া ইংরাজীতে যাহাকে বলে Sex Novel তাহার হুবহু অনুকরণ দ্বারা উৎপাড়িত এই বাঙ্গালা সমাজের যথার্থ উপকার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মজুমদার এম,এ, বলেনঃ—
মায়াদেবী নামক একখানা গার্হস্থ্য-উপন্যাস পাঠ করিয়া একান্ত প্রীতি লাভ করিলাম। ইহার রচয়িতা বাবু অক্রূরচন্দ্র সেন, একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁহার "জলাঞ্জলি" নামক উপন্যাস খানা একদিন পূর্ব্ববঙ্গে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। "মায়াদেবী" তাহার বার্দ্ধক্যের রচনা। পাকা হাতের পাকা গাঁথুনী। আকারের ছোট হইলেও সুরস সারগর্ভ ও উপদেশাত্মক। একটা সোণার সংসার কেমন করিয়া পরিচালকের বুদ্ধির দোষে ছারেখারে যাইতে পারে, আর সহানুভূতি ও মমতার সোণার কাঠির স্পর্শ মাত্র তাহাই আবার কেমন করিয়া অমরাবতীতে পরিণত হয়, গ্রন্থকার নিপুণতার তুলিকাপাতে তাঁহার মায়াদেবীতে চিত্রিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের ঘরে ঘরে শিক্ষিতা মহিলার আবির্ভাব হইয়াছে, সত্য বটে ; কিন্তু তথাপি যেন অশান্তি, বিবাদ, কলহ লাগিয়াই আছে। কিসের অভাবে এমনটি হইতেছে তাহাই প্রবীন গ্রন্থকার চোখে আঙ্গুল দিয়া তাঁহার "মায়াদেবী" চরিত্রে দেখাইয়াছেন। আমারা গ্রন্থখানার বহুল প্রচলন কামনা করি।

ডাঃ, নরেশচন্দ্র সেন এম্‌, এ ল্যাডেন্স :—গল্প ও উপন্যাস বিষয়ে আজকালকার পাঠক সাধারণের রুচি যে দিকে দেখা যায় তাতে আপনার অনাড়ম্বর গার্হস্থ্য চিত্রখানি বাজারে বেশী বিক্রী হইবে সে ভরসা আমি করিতে পারি না। কিন্তু চিত্রখানি বড় স্নিগ্ধ ও মনোরম, একথা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি। আপনি যে সমাজ ও সময়ের চিত্র আঁকিয়াছেন সে সমাজ এখন নাই বলিলে চলে। তার ভাঙ্গনের গোড়া পত্তনের ইঙ্গিত আপনিই করিয়াছেন। হরনাথ ছেলেকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন, তার পর কি হইল, সে ইতিহাস যদি বিস্তারিত করিয়া লেখা হয় তবেই আজকার সমাজের চিত্র আসিয়া পড়ে। সেই অতীত লুপ্ত প্রায় সমাজের এই চিত্রখানি মর্ম্মজ্ঞ পাঠকের কাছে সমাদর পাইবে। আপনি সেই যুগের জীবনকে সমগ্র ভাবে আঁকিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহাতে আপনার গ্রন্থের গৌরব হানি করে না। সে যুগে যে কেবল আলোই ছিল, ছায়া ছিল না, শান্তি ছিল আপদ্‌ ছিল না, যে পল্লবগ্রাহী পাঠক আপনার বৈ পড়িয়া এ সিদ্ধান্ত করিবে সে মূঢ় ও ভ্রান্ত। তার ভ্রান্তির জন্য আপনি দায়ী নন। আপনি আঁকিয়াছেন আপনার স্নেহের তুলিকায় সে অতীত জীবনের সেই দিকটা যেটা বাস্তবিক সুন্দর ও মনোরম এবং যাহা চিরদিন স্মরণ করিয়া রাখিবার মত। এ চিত্র যে মুগ্ধ করে সেগুণ অতীতের নয় অতীত ও বর্ত্তমানের ভিতর মানব চরিত্রের শাশ্বত গৌরবের। এমন ছবি আঁকিবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। জীবনের দুঃখ দৈন্য পঙ্কিলতার মধ্যে যে এমন কিছু আছে যা চিরসুন্দর, তা মানুষকে নিত্যই স্মরণ করাইবার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আপনি এই চিত্র আঁকিয়াছেন অবাস্তব অপ্রাকৃত একটা উদ্ভট কল্পনা দিয়া নয়। সত্য অনাড়ম্বর স্বাভাবিক জীবনের রস লইয়া।

নিবেদন।

কি উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি লেখা হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে চাহি না, ইহার প্রথম কারণ, বিষয়টি আগে বলিয়া দিলে সবই ফাঁক হইয়া গেল দ্বিতীয় কারণ, আমরা যদি পূর্ব্বেই বলি আমাদের এই এই উদ্দেশ্য তাহা হইলে আপনারা নিজ ইচ্ছামত মনে মনে একটা আশা বাঁধিবেন। হয়ত,—হয়ত কেন?—নিশ্চয়ই আপনাদের সে আশা এ গ্রাম্য আখ্যায়িকা পড়িয়া পূর্ণ হইবে না; সুতরাং আপনারা নিরাশায় আমাদের এই বহু যত্নের "জলাঞ্জলি" জলাঞ্জলিই ভাবিবেন। এমন ফাঁদে আমরা পা দিব কেন? তবে ভাষা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। পাঠক মহাশয়গণ পড়ার পূর্ব্বেই এই কয়েকটি কথা মনে রাখিবেন।

১ম। এগ্রাম্য আখ্যায়িকা, তাহাতে লেখকও গ্রাম্য সুতরাং গ্রাম্য ভাষা ও গ্রাম্যতা দোষ অপরিহার্য্য।

২। এই আখ্যায়িকার দৃশ্য সুবিমল পবিত্র জাহ্নবী-সলিল-বিধৌত পশ্চিম বঙ্গ নহে, পঙ্কিলবারি পরিপূর্ণা উত্তমশীলা পদ্মা নদীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থান। এ স্থানের ছবি আঁকিতে চিত্রকর নিম্মল্ জলধারা বর্ণ মিশ্রিত করিতে বহুপ্রয়াস পাইয়াছেন বটে, কিন্তু পদ্মার জল এমনই পঙ্কিল যে শতবার "ফিলটার" করিয়াও সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং সম্ভবতঃ অনেক স্থলেই বর্ণ সংযোগের পারিপাট্য হয় নাই। তবে কথার মধ্যে এই যে, এ জল দেখিতে কাদা হইলেও উপকার বই অপকার করে না, সুতরাং চিত্রটা দেখিতে সম্পূর্ণরূপ সুন্দর না হইলেও কার্য্যে আসিতে পারে।

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র সেন।

দ্বিতীয় বারের নিবেদন।

৩৫ বৎসর পর জলাঞ্জলির নূতন সংস্করণ হইল। এত দীর্ঘকাল পরে সংস্করণ করাতে পাঠকের মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া একটা কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক। সে কৈফিয়ত আর কিছুই নয়। এ পৃথিবী এমনই একটি স্থান যে ইহাতে মানব যাহা মনে করে তাহা অনেক সময়েই করিতে পারে না। ঘটনা স্রোতে অনেক সময় তাহার দৃঢ় সংকল্প ও ভাসাইয়া নেয়। যাহা করণীয় তাহা সে না করিয়া বাজে-কাজে জীবনটা শেষ করিয়া ফেলে। কখনও বা রোগ শোক মনস্তাপে সে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই উভয় অবস্থাই আমার জীবনে ঘটিয়াছে।

জীবনের অন্তভাগে বন্ধুবান্ধব গণের প্ররোচনায় শুধু প্ররোচনায় নয় তাড়নায় জলাঞ্জলির পুনঃ সংস্করণ করিলাম। প্রথম সংস্করণে সমালোচক-গণ ইহাতে যে যে ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া ছিলেন, তাহা যতদূর সম্ভব সংশোধন করা হইল।

পরিশেষে সবিনয় নিবেদন এই যে, জলাঞ্জলির মুখ্য উদ্দেশ্য আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কি উপাদানে গঠিত ছিলেন, তাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি, শক্তি সামর্থ্য, আচার সংস্কার, রীতি নীতিই বা কিরূপ ছিল; সে কালের মহিলাগণই বা কি প্রকৃতির ছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষা ও ধর্ম্ম জ্ঞানইবা কিরূপ ছিল, তাহার একটা চিত্র তাঁহাদিগের বংশধর গণের নিমিত্ত অঙ্কিত করিয়া রাখা,—কৃতিত্বের নিমিত্ত নয়, পূর্ব্বস্মৃতি মধুময় বলিয়া।

ঢাকা
৬ই চৈত্র ১৩৩০।

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র সেন।

বিশেষ প্রার্থনা।

আমার বৃদ্ধাবস্থায় দৃষ্টি ক্ষীণতা হেতু কপি লিখিতে ও প্রুফ দেখিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ বিধায় স্থানে স্থানে ভুল পড়িয়াছে অতএব পাঠক মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্ততঃ নিম্নলিখিত স্থান গুলি সংশোধন করিয়া পড়িবেন যথা ৬৩ পৃঃ ৮ লাইন ছাইয়া স্থলে ছাড়িয়া পৃঃ ৮৪—১১ লাইন পাকে স্থলে থাকে পৃঃ ১২৮—৯ লাইন ধর্ম্মাগত স্থানে ধর্ম্মমত।

গ্রন্থকার।

জলাঞ্জলি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভবদ্বীপ নামে একটি গ্রাম। তথায় রামশরণ সেন নামক জনৈক বৈদ্যসন্তান বাস করিতেন। গ্রামটি পদ্মানদীর ধারে। তথায় বিশেষ কোন জমিদার কি নবাবী আমলের বুনিয়াদি বড় মানুষের বাড়ী নাই। এটী একটি পল্লীগ্রাম। ইহাতে কৃত্রিমতার কিছুই নাই। বাড়ী গ্রাম্য, ঘর গ্রাম্য, পুরুষ গ্রাম্য, যা দেখিবেন, তাহাই গ্রাম্য ও স্বাভাবিক। গ্রামখানির পূর্ব্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে সমতল শস্যপূর্ণ মাঠ। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কিছু প্রশস্ত, অর্দ্ধক্রোশ পরিমাণ হইবে। দক্ষিণ দিকে প্রায় তদর্দ্ধ। তৎপরই খরস্রোতা বিস্তীর্ণা পদ্মানদী। এই ভীষণ আবর্ত্তময়ী তরঙ্গিণী কত জনপদ, কত শস্যপূর্ণ প্রান্তর, পরিশেষে রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তি আত্মসাৎ করিয়া, দুর্দ্দমনীয় বেগে সমুদ্রাভিমুখে অবিরাম চলিয়া যাইতেছে। ক্রূরমতি দস্যুর হৃদয়েও যেমন সময়ে সময়ে দয়ার ভাব দেখা যায়, এই দুরন্ত পদ্মানদীর হৃদয়েও সময়ে সময়ে এইরূপ দয়ারভাব দৃষ্ট হয়। দস্যু যেমন একের রক্ত হরণ করিয়া তদ্দ্বারা কখন কখন অন্যের উপকার করে, পদ্মাও সেই ভাবে কখন কখন পরের হিতসাধন করেন। আজ এ জনপদ কুক্ষিগত করিয়া উপায়হীন অধিবাসীদিগকে বিপদসাগরে

ভাসাইয়া দিলেন, তাহাদের আর আশ্রয়ের স্থানটুকু রহিল না। কত জমিদার পথের ভিখারী হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন! কখন তন্নিকটবর্ত্তী জনপদকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্যঙ্গ করিয়া সহসা গতি ফিরাইয়া অপর পারস্থ কোন কোন সমৃদ্ধিশালী গ্রাম আত্মসাৎ করিয়া দেশময় ক্রন্দনের রোল তুলিয়া দিলেন। আবার ক্ষণকাল মধ্যে কোন গণ্ডগ্রামের নিকট সুবর্ণচর বসাইয়া কাহারও কাহারও সৌভাগ্যের ধ্বজা উড়াইয়া দিলেন।

গ্রামের উত্তর দিকের বিস্তীর্ণ প্রান্তর ক্রমে ঢালু হইয়া বিলের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই বিলের ধারগুলি নিতান্ত নিম্ন, তথায় প্রায় আট মাসই জল থাকে। উহার মাঝে মাঝে নল ও খাগড়াবন। অপর স্থানগুলি কুমুদ ও পদ্মের সরোবর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শরৎ ঋতুতে যখন এই সমস্ত ফুল প্রস্ফুটিত হয়, তখন কি চমৎকার শোভাই নয়নপথে পতিত হয়। মন হর্ষে পদ্মের ন্যায় ফুটিয়া উঠে। নরনারী এ গ্রাম্য সরোবরের কমল অতৃপ্ত নয়নে দেখে; অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া হৃদয় মন বিশ্বপতির চরণে ঢালিয়া দেয়। তাহাতেও তাহাদের মন তৃপ্তি মানে না। কণ্টক যাতনা সহ্য করিয়া, সর্পভীতি না মানিয়া, উদ্যমসহ উহা চয়ন করতঃ নিজ নিজ আরাধ্য দেবতার চরণে অঞ্জলি প্রদান করে। রমণীহৃদয় সৌন্দর্য্য বড়ই ভালবাসে। তাহারা এই সৌন্দর্য্যের স্মৃতি বারমাস মনে জাগরূক রাখিবার নিমিত্ত সরা, ডালা, পটে, কিম্বা যাহার যেথানে ইচ্ছা সেইখানেই ইহার প্রতিরূপ অঙ্কিত করিয়া রাখে।

এই সরোবর সম্বন্ধে আমাদের আরও কিছু বলা আবশ্যক। ইহাতে বর্ষা অবসানে গ্রাম্য লোকেরা নৌকা বৃক্ষশাখাপূর্ণ করিয়া ডুবাইয়া রাখিত। সময়ে সময়ে সেই নৌকা সিঞ্চন করিয়া, শাখার অন্তরালে লুক্কায়িত মৎস্য সকল ধরিয়া সহর্ষে গৃহিণীকে নিয়া দিত, এবং তাহাতে উদর পূরণ করিত। সরোবরটি একটু জাঁকাল গোছের বড়। তাহাতে আবার

প্রান্তর মধ্যস্থিত বলিয়া একক তথায় যাইলে কেমন যেন একটি ভয়-সংযুক্ত ভক্তির অনির্ব্বচনীয় ভাব হৃদয়ে উপস্থিত হইত। ইহাতেই হউক, কি অন্য কোন কারণেই হউক, একটি জনশ্রুতি ছিল যে, ইহার তলদেশে "সোণার না পবনের বৈঠা"* এবং কোন যোগীর খাণ সহিত চড়ক গাছ ছিল। কোন কোন প্রাচীনা স্ত্রী দৃঢ়তার সহিত বলিতেন যে, তাঁহাদের স্বামীরা স্বচক্ষে ও একাধিক বার ঐ দেবাংশ বস্তুদ্বয় ভাসিয়া উঠিয়া ডুবিতে দেখিয়াছেন। আর কেহ কেহ এরূপও বলিতেন যে, হরি সাহা নামক কোন এক কৃপণ বাণিজ্য ব্যবসা করিয়া, প্রভুত অর্থ সংগ্রহ করে। ঐগুলি কলসিপূর্ণ করিয়া মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখে। ব্যয় না করাতে এই সকল মুদ্রা যক্ষ প্রাপ্ত হয়। এক দিবস রাত্রিকালে ঐ কলসিগুলি গড়াইতে গড়াইতে এই বিলের মধ্যে আসিয়া পড়ে। অনেকে নাকি এই গুলির আবর্ত্তনজনিত মৃত্তিকায় যে চিহ্ন পড়িয়াছিল তাহা স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছিলেন। পাঠক মহাশয়! আমরা কতকগুলি অসম্ভব কথা লিখিয়া কালী কলম নষ্ট করিলাম বলিয়া আমাদিগকে গালি দিবেন না। আপনি শিক্ষিত, সমস্ত কথা বিশ্বাস না করিতে পারেন, শুনিতে বাধা কি? চাঁদের কোলে শশক, এটলাসের ঘাড়ের উপর পৃথিবীমণ্ডল, টুইড নদী টুইডী সাহেব পারবারের আদিপুরুষ, মর্কটকুল মানবজাতির আদিপুরুষ প্রভৃতি কত কথাইত আপনারা আদরে শুনিয়া সত্য মিথ্যা একটা মনে মনে ধারণা করিয়া ফেলিয়াছেন। এ গরীব লেখকের প্রতিও তাহাই করিবেন। আমাদের আর একটু বলিবার আছে। আমরা স্বকপোল কল্পিত কিছুই বলি নাই, লোকের যাহা বিশ্বাস ছিল ও যাহা জনশ্রুতি ছিল তাহাই যথাযথ বর্ণন করিয়াছি।

গ্রামটি বহু জনাকীর্ণ নহে। এখানে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, কয়েক ঘর বৈদ্য কয়েক ঘর শূদ্র, কয়েক ঘর গোয়ালা, কয়েক ঘর জেলে, দুই ঘর

নাপিত ও এক ঘর ধোপা ও কয়েক ঘর অন্যান্য লোকের বসতি ছিল। বড় মানুষ মাত্রই ছিল না। গরীব লোকের সংখ্যাই বেশী, মধ্যবিধ লোকের সংখ্যা কম। তবে তাহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল থাকাতে লোকে তাহাদিগকেই বড় মানুষ বলিত। সকলের সহিতই সকলের সম্প্রীতি ছিল। সকলেই সকলকে ভালবাসিত। বয়সে জ্যেষ্ঠ কোন নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তিকে উচ্চকুলোদ্ভব ব্যক্তি কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে আধুনিক সভ্যতাব্যঞ্জক শুধু নাম ধরিয়া তুচ্ছার্থে সম্বোধন করিত না। "কোথা যাও মামা দাদা,"। "কোথা হ'তে এলে হরি কাকা," "কালী জেঠা কি কর," "নকড়ী মামা এই মোটটি আমার জানতার বাড়ী দিয়ে এস," "বামা পিসীকে আমার নিকট একবার আসিতে বলিও" এই রূপ সম্ভাষণ করিত। পক্ষান্তরে নীচ কুলোদ্ভব ব্যক্তিগণও উচ্চ কুলোদ্ভবদিগকে ঐরূপ সম্ভাষণ করিত। "শুনিস্না বেটা", "কেনে একাজ করিস্ না" প্রভৃতি তুচ্ছার্থে প্রয়োগ ছিল না। কেন ছিল না, জানি না। হয়ত সেই সময়ে কিথ্ সাহেবের বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ছিল না বলিয়াই লোকে তুচ্ছার্থ প্রয়োগের এত ছাড়াছড়ি করিতে জানিত না। তবে এই জানি যে এইরূপ ভালবাসা ও বাৎসল্য ব্যঞ্জক কথার রীতিতে তাঁহাদের মনে বড় নির্ম্মল আনন্দ হইত। তাহাতেই তাঁহারা এইরূপ করিতে বড় ভালবাসিতেন।

আমাদের রামশরণ সেন মহাশয়ের বাড়ীটি গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে ছিল। উহার উত্তরে ও পূর্ব্বে ব্রাহ্মণপাড়া, পশ্চিমদিকে নাপিত ও ধোপাবাড়ী, দক্ষিণে কয়েকঘর শূদ্র। বাড়ীটি প্রায় ৪।৫ বিঘা জমি নিয়া। চতুর্দ্দিকে পগার কাটা। উত্তরদিগের পগারের উপর ৩০।৪০ ঝাড় বাঁশ, পশ্চিমে গুপারি ও পূর্ব্বে নারিকেল, সম্মুখে নানাবিধ ফলের গাছ। তাঁহার পিতা কিছু নামজাদা কবিরাজ ছিলেন বলিয়া তাঁহার অর্থের স্বচ্ছলতা ছিল।

সুতরাং দশকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া খিড়কিতে ও বাহিরে সাধারণ মত দুইটা পুকুর দিয়াছিলেন। বাড়ীটি এমনভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে যে নারিকেল, সুপারি ও বাঁশ প্রভৃতি জন্মিত তাহা দ্বারা সংসারের অভাব কুলান করিয়াও অনেক উদ্বৃত্ত হইত, এবং তাহা বিক্রয় করিলে সংসারের অন্যান্য ব্যয় কুলান হইতে পারিত। দৈবনির্ব্বন্ধে তিনি তিন পুত্র ও একটি দৌহিত্রসহ এক বিধবা কন্যা রাখিয়া অকালে মরিয়া যান। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সহমরণ যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামতারণ বিধবা পত্নী রাখিয়া সংবৎসরের মধ্যেই পিতা মাতার অনুসরণ করেন। ভ্রাতার মৃত্যুর সময় রামশরণের বয়ক্রম একবিংশ বৎসর। তিনি অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও সাহিত্যের পাঠ সমাপন করিয়া, মাত্র তিন বৎসর কাল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নের পর এই বিপদে পতিত হয়েন। তাঁহার ইচ্ছা সত্ত্বেও বাভট, চরক প্রভৃতি প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আর সময় পাইলেন না। তাঁহার বিদ্যা চক্রদত্ত ও মাধব করের নিদান ও কয়েক খানি সংগ্রহ গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ রহিল। তবে তাঁহার পিতার ঔষধ ও তৈল সম্বন্ধে স্বহস্ত লিখিত অনেকগুলি জায় সংগ্রহ ছিল। তাহার উপর অনেকটা নির্ভর করিয়া, বাধ্য হইয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলেন; বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও মার্জ্জিত থাকাতে অচিরে একজন ভাল চিকিৎসকের মধ্যে গণ্য হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামশরণ এখন সংসার ভাবনায় ব্যাকুল। পিতা ও তৎপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেরূপ দশকর্ম্ম চালাইয়া পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিতেন, তিনিও তাহা কিরূপে বজায় রাখিবেন এই চিন্তাতেই ব্যাকুল। পরিবার কথাটি উল্লেখ করাতে, বর্ত্তমান শিক্ষিত ও উন্নতিশীল কোন কোন পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন রামশরণ বিবাহ করেন নাই, তবে আবার তাঁহার পরিবার পোষণের ভাবনা কি? কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, অভিধান ও লোকব্যবহারে স্ত্রী অর্থে নিজের পরিবার, মাতা অর্থে বাপের পরিবার বুঝাইত না। সংসারে জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগিনী অন্নদা, তৎপুত্র জয়চন্দ্র পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক। অন্নদা পিতার বড় আদরের মেয়ে ছিলেন। তিনি তাঁহাকে একটী প্রসিদ্ধ কুলীনের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। লোকে বলে, বিবাহ দিলেই পিতা কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পান; কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে তাহা হয় নাই। কন্যা ও জামাতার গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে নিয়তই টাকা পাঠাইতে হইত। যাহা হউক তাঁহাকে খরচ যোগাইবার কষ্টটা বড় বেশী দিন পাইতে হইয়াছিল না। জামাতা কোন জমিদার কন্যার বিবাহে কৌলিন্য-মর্য্যাদা লইয়া তুমুল বাক্য যুদ্ধ করিয়া, একটি বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত করেন। এই বাগ্‌যুদ্ধে অতিক্লান্তিবশতঃ তাঁহার ফুসফুস্‌ বিকল হয়। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াই মুখে রক্ত উঠিয়া অল্পকাল মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। স্বামীর মৃত্যুর পর অন্নদা পুত্রসহ পিত্রালয়ে আসিয়া অবস্থিতি করেন। পিত্রালয় ভিন্ন এ জগতে আর তাঁহার আশ্রয় স্থান ছিল না। তাহাতে আবার সহোদরা জ্যেষ্ঠা ভগিনী, এক রক্তমাংসে শরীর গঠিত, এমন আত্মীয়াকে—

এমন ভক্তি ও ভালবাসাপূর্ণ স্বজনকে যদি পোষণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে এ মানব জন্মের প্রয়োজন কি? রামশরণ এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। তৎপর বিংশতি বর্ষীয়া বিধবা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ উমাসুন্দরীর ভাবনা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিয়োগে তাঁহার হৃদয় বড়ই সন্তপ্ত। "দাদা আমাকে বড় ভালবাসিতেন, এমন নির্মল ও বিশুদ্ধ ভালবাসা আর জগতে পাইব না, এমন মধুমাখা প্রেমমূর্ত্তি জীবনে আর দেখিতে পাইব না" এই বলিয়া নিয়তই বাহিক গোপন রাখিয়া মনে মনে কাঁদিতেন। মূকের ন্যায় মনোব্যথা প্রকাশ করিতেন না, পাছে কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপাল ও বধূঠাকুরাণীর শোকবহ্নি জ্বলিয়া উঠে। গোপন করিতে চেষ্টা পাইতেন বটে, কিন্তু সকল সময় তাহা হইয়া উঠিত না। অন্তর্বহ্নি বহিয়া বহিয়া জ্বলিয়া উঠিত। ব্যবসার নিমিত্ত চক্রদত্ত খুলিলেই চক্ষু হইতে দর দর করিয়া জল পড়িয়া গণ্ড ও বক্ষ ভাসিয়া যাইত। কারণ ঐ পুস্তক খানির অধিকাংশই দাদার হাতের লেখা। কষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিলে আবার চক্ষে জল আসিত। তখন মনে পড়িত এই চালখানা দাদা রৌদ্রে বসিয়া কত কষ্টে স্বহস্তে বাঁধিয়া ছিলেন। লিখিতে প্রয়োজন হইলে অতি কষ্টে চোঙ্গার ভিতর হইতে কলম বাহির করিতেন; কারণ ঐ চোঙ্গার অনেক কলমই দাদার হাতের কাটা ছিল। এইরূপে গৃহে বাহিরে, গ্রামস্থ বৃক্ষতলে, নদী পুলিনে, পথে ঘাটে যেখানেই যাইতেন, সেইখানেই একটা না একটা বিষয় মনে পড়িয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। দাদার সন্তান ছিল না যে তাহাতে তাঁহার প্রতিরূপ দেখিয়া হৃদয় শীতল করিতে পারেন। রামশরণ দাদাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন,—কেবল ভালবাসিতেন না, তাঁহাকে আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস যে, স্ত্রী ও পুরুষ বিবাহসূত্রে গ্রথিত হইয়া, একদিকে মধুরতা, কোমলতা, স্নেহ, মমতা, অন্যদিকে সাহস

বল বিক্রম গুণগুলি লইয়া, পূর্ণ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। দুই এক হইয়া যায় সমতান বিশিষ্ট বীণাতন্ত্রীর ন্যায় একটি বাজাইলেই অন্যটি আপনিই বাজিয়া উঠে। তাঁহার আরও বিশ্বাস ছিল, মনুষ্যের আত্মা অবিনশ্বর, এ দেহ-পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইলেও চিন্ময় রূপে বিরাজমান থাকে, সুতরাং ভ্রাতার অর্দ্ধকায়ার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন করিলে, দাদার চিন্ময় স্বর্গীয় আত্মা ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হওয়াতেই তাঁহার শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভ্রাতৃবধূর উপর পূর্ব্বাপেক্ষা এখন দ্বিগুণিত হইল। কিরূপে যে ভ্রাতৃবধূকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান পূর্ব্বক প্রতিপালন করিবেন, তাহার ভাবনাতেই তাঁহার হৃদয় ব্যাকুলিত হইতে লাগিল।

উমাসুন্দরীর পিতৃকুল বিলক্ষণ সঙ্গতি সম্পন্ন ছিল। তাঁহার বৈধব্য দশার পরই পিতা তাঁহাকে নিজ-গৃহে লইয়া যাইতে বিশেষ যত্ন করেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কোন ক্রমেই সম্মতি প্রদান করেন না। তিনি পতিপরায়ণা সাধ্বী নারী ছিলেন। তাঁহার পতি, ও দেবরগণ এক রক্তমাংসে জাত। তিনি ভ্রাতাদিগকে হৃদয়ের সহিত স্নেহ করিতেন, সুতরাং তিনি তাহাদের বশবর্ত্তী থাকিয়া তদনুরূপ স্নেহ করিলে, তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর চিন্ময় আত্মা প্রীতিলাভ করিবে, এবং মৃত্যুকালে দেবরগণ মুখাগ্নি ও শ্রাদ্ধাদি করিলে তিনি স্বর্গলোকে তাঁহার পতিদর্শন করিতে পারিবেন, এই বিশ্বাস ও নিজ বাড়ীর উপর স্বাভাবিক অনুরাগ হেতু, তিনি দেবর-দিগের আশ্রয়েই আগ্রহের সহিত রহিলেন। আর বিশেষতঃ সপ্তমবর্ষীয় কনিষ্ঠ দেবর গোপাল, মাতার পরলোক গমনের পর হইতেই, তাঁহার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইত। তিনি না খাওয়াইলে তাহার খাওয়া হইত না। তিনি স্নান না করাইলে তাহার স্নান হইত না। তিনি ঘুম না পাড়াইলে তাহার ঘুম হইত না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কালে সকলই হয়। কালে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হয়। যে স্থান অদ্য ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাসভূমি, যাহার সীমানায় মানব ভয়ে পদচারণ করে না, কল্য সেই স্থান মহাজনপদে পরিণত হইল। বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসাদে কত প্রাসাদ কত উদ্যানবিশিষ্ট হইয়া ইন্দ্রের অমরাবতীর মত শোভা পাইতে লাগিল। কেহ কেহ নিজ নাম চিরস্থায়ী করিবার আকাঙ্ক্ষায় তথায় প্রকাণ্ড দেব মন্দির, অদ্বিতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাল মহাত্মা মনে মনে ভাবিলেন, কীটাণুর খেলা মন্দ নয়, সংরক্ষণী দৃষ্টিবলে কিঞ্চিৎকাল স্থায়ী রাখিলেন। যাই অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি সমস্ত কীর্ত্তি, সমস্ত স্তম্ভ, সমস্ত নগর ধূলিতে পরিণত হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল। এই ত গেল বাহ্য জগতের কথা। আধ্যাত্মিক জগতের উপরও কালের এইরূপ কার্য্য। অদ্য যাহা "ইদমেবতত্ত্বং" বলিয়া ঠিক করিলাম, কল্য তাহা বাতুলের অনুমান বলিয়া পরিগণিত হইল। অদ্য যে চিন্তায় আকুলিত হইয়া অনাহারে অনিদ্রায় দিন যামিনী কাটাইলাম, কালের চক্রে তাহার গতি অন্যদিকে ফিরাইয়া দিয়া হৃদয়, মন, পরিষ্কার করিয়া দিল। অদ্য আত্মীয়ের বিয়োগ জনিত শোক যন্ত্রণায় হৃদয় সন্তপ্ত হইল, কল্য হৃদয় ধীরে ধীরে শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। এই কাল-ধর্ম্ম মাহাত্ম্যে রামশরণের হৃদয়ের শোকভার অনেক কমিয়া আসিয়াছে। এক বৎসর গত হইল, তাঁহার ভ্রাতৃ বিয়োগ হইয়াছে। যাহা দেখেন তাহাতেই আর দাদার কথা মনে পড়ে না। তবে কখনও কখনও কোন বিষয় সহসা মনে উদয় হইয়া বিদ্যুৎবাণবৎ হৃদয়ে কষ্ট প্রবেশ করে। অসহনীয় কষ্ট বিদ্যুৎবেগে চলিয়া যায়

বলিয়াই জীবন বাঁচে, অর্দ্ধঘণ্টাকাল স্থায়ী হইলে বোধ হয় এ আঘাতে মানবহৃদয় ফাটিয়া যাইত।

রামশরণ এখন ব্যবসায় বাহির হয়েন। দুই চারি টাকা উপার্জ্জনও করেন। যখন যাহা পান তাহা দিদির নিকট আনিয়া দেন। দিদিই এখন সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। কর্ত্তা বলাতে পাঠক মহাশয় অসঙ্গত প্রয়োগ বলিয়া গালি দিবেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অন্নদা দিদীর বেশী দিন শ্বশুর আলয়ে থাকা হয় নাই। তিনি পিতৃগৃহে প্রতিপালিতা। অবগুণ্ঠন দেওয়া, মৃদু স্বরে কথা বলা, কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। কঠোর ব্রতাচার অবলম্বন করায়, ও অস্থ মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত, কল্য একাদশী, এ চারিমাস চাতুর্ম্মাসিক কাল ইত্যাদি দিন কাল অনুসারে বৎসরের মধ্যে প্রায় ১২০ দিন উপবাস করিয়া শরীরটী এমন শীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, স্ত্রী সুলভ কোমলতার কোন চিহ্নই তাঁহার আকৃতিতে ছিল না। তাহাতে আবার মস্তকের কেশগুচ্ছ মুণ্ডন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এই কারণে আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়েতেই পুরুষের ভাব পরিলক্ষিত হইত। তিনি অতি প্রত্যূষে উঠিয়া "মাতঃ শৈল-সুতে" বলিতে বলিতে স্নান করিয়া তসরের কাপড় পরিধান করিতেন। ভিজা কাপড় খানি ঘাটে মেলিয়া দিয়া, ফুলের সাজি লইয়া স্তব পড়িতে পড়িতে ফুল চয়ন করিতেন। চয়ন শেষ হইলে ঘরে আসিয়া ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি পঞ্চ উপচারে শক্তিপূজা করিতেন। পূজা সমাপন হইলে তুলসীতলে জল সিঞ্চন করিয়া, গোমুখ হাতে করিয়া মালা জপিতে জপিতে পাড়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। অমুক বাড়ীর মেঝ বউ বড় লজ্জাহীনা, সন্ধ্যা না হইতেই স্বামীর ঘরে প্রবেশ করে, সূর্য্য উদয় না হইলে আর উঠে না। অমুক বাড়ীর বউরা নিতান্ত অপরিষ্কার, অনাচারিণী, উঠান ঝাঁট দেয় না, গোবরের ছড়া দেয় না। অমুকের ঘরে রাত্রে শেয়াল

গিয়াছিল, ওরা এমনি ম্লেচ্ছ, হাঁড়ি কুঁড়ি ফেলে নাই। অমুকের বাড়ীর কলাকাঁদি চুরি গিয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি গ্রামস্থ সমস্ত বিষয়ের দৈনিক সমালোচনা করিতে করিতে চারিদণ্ডের মধ্যেই গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গোমুখ সমেত মালাটী বেত্তনির্ম্মিত বাদামী ঠোঙ্গার মধ্যে রাখিতেন। পাড়া বেড়াইয়া কুৎসা রটনা করা ও বাতাসের আগে দাড়ি বাঁধিয়া ঝগড়া করা, অনেকেই দূষণীয় বিবেচনা করেন, আমরাও করি। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে "দৈনিক" কি "সম্বাদপ্রভাকর" ছিল না। অন্নদিদি গ্রামবাসিদিগের "দৈনিক" ও "সম্বাদপ্রভাকর" ছিলেন। তাঁহার তীব্র সমালোচনায় অনেক গ্রাম্যপাপপঙ্ক প্রকাশিত হইত। অন্নদা পাড়া বেড়িয়া আসিয়াই গৃহকর্ম্মে নিবিষ্টমনা। এ গাছ হইতে কয়েকটা বেগুন ও গাছ হইতে একটি কুমড়া ও তাহার ডগা, ওখান হইতে কতক গুলি শাক তুলিয়া আনিয়া একটি একটি করিয়া দেখিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে রন্ধনার্থ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এখান হইতে একখানা শুষ্ক ডাল, ওখান হইতে এক গোছা শুষ্ক খড়, সেখান হইতে কতক গুলি শুষ্ক পাতা সংগ্রহ করিয়া রন্ধন গৃহে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে পরিবারের দৈনিক আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যাহা যাহা আবশ্যক হইত তাহার সমস্তই তিনি আয়োজন করিতেন। রামশরণের ছিল কেবল অর্থ সংগ্রহ করার ভাবনা মাত্র। অন্নদা দিদি থাকিতে তাঁহার আর কিছুরই ভাবনা ছিল না। ঘর দরজা পর্য্যন্ত দিদির তত্ত্বাবধানে ছিল। ঘরে পূর্ণবয়স্কা বিধবা ভ্রাতৃবধূ, তাহার প্রহরীর পর্য্যন্ত ভাবনা নাই। অন্নদা ঠাকুরাণীর তেজে ও গগনভেদী গলায় বদমায়েস দূরে থাকুক, পাড়ার স্ত্রীপুরুষ থরহরি কম্পবান। ভ্রাতৃবধূর বাক্যস্ফূর্ত্তি করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লোপ। ভ্রাতৃবধূর স্বভাবও সেরূপ ছিল না। তিনি গোপালকে প্রতিপালন ও রন্ধনাদি দ্বারা দেবরগণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন

করাইতে পারিলেই প্রকৃত সুখী হইতেন। হিন্দুর ব্রহ্মচারিণী বিধবা নিজের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখসম্ভোগ ত স্বামীর সঙ্গেই বিসর্জ্জন দিয়াছেন; তবে আর তাঁহার অন্নদিদির সহিত বিবাদ বিসম্বাদ হইবে কেন? অন্নদা যে ভাবে তাঁহাকে চালাইতেন, তিনি কলের মত অবিকল সেইভাবেই চলিতেন। কোন কথার প্রতিবাদ না হওয়াতে দিদিও তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। তিনি হবিষ্যান্ন পাক করিতে দিতেন না। রাত্রিকালে দেবরদিগের নিমিত্ত আমিষ পাক করিয়া অশুচি হইতে দিতেন না। মধ্যাহ্নে যে ব্যঞ্জন পাক হইত, তাহাই ঢাকিয়া রাখা হইত। তিনি নিরামিষ পাক ঘরে অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিতেন; রামশরণ তথা হইতে অন্ন নিয়া ভাগিনেয় ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ বৈকালিক আহারাদি করিতেন। দিন এই ভাবে কাটিয়া গেলেও অন্নদা দিদির কাজ শেষ হইত না। যাই সন্ধ্যা হইয়াছে, অমনি বড় ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে ঘরে দেখাইয়া, তুলসীতলে ও মণ্ডপ ঘরে প্রদীপ দিয়া, নিজ ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে প্রণামপূর্ব্বক গোপালকে নামশ্লোক পড়াইতে বসিতেন। মেয়েতে নাম শ্লোক পড়ায়, এই কথা শুনামাত্রই আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অন্নদিদি অর্দ্ধেক পুরুষ। তাহাতে আবার পণ্ডিত পিতার বিশেষ আদরের মেয়ে ছিলেন। তিনি অন্নদার বালিকা অবস্থায় চাণক্যের সমস্ত শ্লোকই তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি নিতান্ত প্রখরা থাকাতে সেগুলি এখনও তাঁহার মনে ছিল! স্তবগুলিও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ পিতার নিকট অভ্যাস করিয়াছিলেন। এমন কি বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয় কোন ব্রতাদি করাতে আসিলে নিতান্ত সাবধানে মন্ত্র পড়াইতেন। কোনরূপ উচ্চারণ বৈষম্য হইলে তাঁহাকে প্রমাদ গণিতে হইত। সাতপুরুষ বাঁচিয়ে যাওয়া ভার হইত। দণ্ডেক-কাল নামশ্লোক পড়াইয়া গোপালকে ভ্রাতৃবধূর নিকট ছাড়িয়ে দিতেন।

তিনি তাহাকে পাওয়া মাত্র বক্ষে করিয়া, এক মাণিক সাত রাজার ধন, বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর উপকথা বলিয়া কাল কাটাইতেন। এখানেও অন্নদিদির দৈনিক কার্য্যের শেষ হইত না। ইহার পর আবশ্যক হইলে ভ্রাতার ঔষধের বড়ী পাকাইয়া, কিম্বা তৈল জাল দিয়া অবসর হওয়া মাত্র মালা লইয়া জপে বসিতেন। তখন আর সে চপলতা, সে পুরুষোচিত উদ্যম তাঁহার মুখমণ্ডলে পরিলক্ষিত হইত না। তখন তিনি নিমীলিত নয়নে স্থিরভাবে একাসনে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপে নিমগ্না। এইভাবে যে কত সময় বসিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতেন তাহার ঠিকানা ছিল না। কোন কোন দিন বা চক্ষু মেলিয়া দেখিতেন রাত্রি প্রায় অবসান হইয়াছে। তাঁহার নয়নে নিদ্রা বড় ছিল না। যদি কখনও কখনও নিদ্রা যাইতেন তাহাও তন্দ্রার মত। মূষিক কি অন্য কিছুর সাড়া শব্দ হইলে অমনি বলিয়া উঠিতেন 'কে ও'। রামশরণ আহারান্তে সংস্কৃত মহাভারতের ব্যাসকূটের ভাব উদ্ধার চিন্তায়, কিম্বা ভট্টির ব্যাকরণ চাতুর্য্যের, বা মেঘদূতের ভাবমাধুর্য্যের পর্য্যালোচনায় সময় কর্ত্তন করিতেন। কখনও কখনও বা অস্ফুট রাগিণীতে "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে," "দেহি পদপল্লবমুদারম্" ইত্যাদি গান, গীতগোবিন্দ হইতে গাইয়া গাইয়া যামিনীর অর্দ্ধভাগ কর্ত্তন করিয়া শয়ন করিতেন।

সকলের কথাই বলা হইল। জয়চন্দ্র কি করেন তাহা এখন পর্য্যন্ত বলা হয় নাই। জয়চন্দ্র এখন ষোড়শবর্ষীয় বালক। স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে প্রত্যহই বাড়ী হইতে যাইয়া থাকেন। তাঁহার পড়া শুনার প্রতি অনুরাগ থাকুক আর না থাকুক, অধ্যাপক মহাশয়ের বাজার করা, তামাকমাখা প্রভৃতি কাজ তাঁহারই এক চেটিয়া ছিল। অন্য কেহ দেবগর্জ্জন শুনুক আর না শুনুক তিনিই আগে শুনিতে পাইতেন। অমাবস্যা, প্রতিপদ তাহার হিসাবে আগে থাকিত। রাত্রিকালে

সমপাঠিদিগকে লইয়া এ বাড়ীর সশাটা, ও বাড়ীর আকখানা অজ্ঞাতসারে আনিয়া খাওয়া, ফিরিবার সময় এ বাড়ীর ঢেঁকি ও বাড়ীতে রাখিয়া আসা, নষ্টচন্দ্রের দিবস নারিকেল চুরি, ও পাড়ার লোকদিগের ঘরে ঢিল নিক্ষেপ করা, প্রভৃতি কাজের তিনিই নেতা ছিলেন। লোকে তাহার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়াও অন্নদাদির ভয়ে মুখ ফুটিয়া এপর্য্যন্ত কিছু বলে নাই। তথাচ তাহার গুণ কি জানি কেমনে প্রকাশ হইয়া পড়িল। ক্রমে রামশরণের কানে আসিল। সত্য মিথ্যা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত একদিন জয়চন্দ্রকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "বল দেখি নৌ ছিল ইক্ কি সন্ধি হয়," জয়চন্দ্র উত্তর করিল "নৌকা"। রামশরণ পূর্ব্বেই ক্রুদ্ধ হইয়া ছিলেন। এই সন্ধি শুনিবামাত্র আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অমনি সজোরে তাহার কপোলদেশে চপেটাঘাত করিলেন। জয়চন্দ্র চেঁচাইয়া পাড়ার লোক একখানে করিল। অন্নদাদিদি ব্যাপার কি জানিবার নিমিত্ত বহির্ব্বাটিতে আসিলেন। ভ্রাতা পড়ার নিমিত্ত পুত্রকে শাসন করিয়াছে, জানিতে পারিয়া একবার প্রখর দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া একটু স্মিতমুখে গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক গৃহকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। পাড়ার একটি বৃদ্ধব্রাহ্মণ বলিলেন, "রামশরণ, উহাকে তাড়না করিও না, লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ। প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ।' উহার লেখাপড়া আর কিছুই হইবে না। বিদেশে পাঠাইয়া দাও, দারগাগিরি করিয়া খাইবে। ছেলেটার ইতর বুদ্ধি আছে।" তিনিও তাহাই ভাল বুঝিলেন। তাঁহার ভ্রাতার খুল্লশ্বশুর দারগাগিরি কাজ করিতেন। তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে অন্নদাদিদি ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তিনি মনে মনে জানিতেন, ও যে পিতার সন্তান তাহাতে পণ্ডিত হওয়ার আশা বিরল। আর বিশেষতঃ তিনি পুত্র কন্যা কি কাহারও উপর বড় দয়া

রাখিতেন না, কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, জীব নিজ দুষ্কৃতিফলে মনুষ্য-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আহার, নিদ্রা, শোক, দুঃখের ভাগী হয়। যাহাতে মায়া মমতাতে আকৃষ্ট না হইয়া যতদূর অন্যায় কর্ম্মের উপর ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ নিজ কর্ত্তব্য সমাধা করা যায় এবং যত এ ভববন্ধন হইতে মুক্ত থাকা যায় তাহাই একমাত্র করণীয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামশরণ ব্যবসা করেন। এখন দশটাকা উপার্জ্জনও হয়। তাঁহার অর্থের প্রতি বড় বিশেষ অনুরাগ ছিল না। রোগীরা আপন আপন অবস্থা অনুসারে যে যাহা দিত তাহাই আদরে গ্রহণ করিতেন। স্বীয় ব্যবসায়ীর নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেন না। কোন রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইলে নিয়ত তাহার নিকট বসিয়া থাকিতেন। আশঙ্কার শেষ না হইলে অন্য কোন স্থানেই যাইতেন না। নিজ সাধ্যাতীত হইলে তাঁহার অপেক্ষা অভিজ্ঞ চিকিৎসক আনাইয়া ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্ব্বক চিকিৎসা করিতেন। মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিতেন না। আরোগ্যস্নানের কলসী নূতন কাপড় ও দক্ষিণা লইয়া পীড়াপীড়ি, করিতেন না। দরিদ্রদিগের পথ্য নিজবাড়ী হইতে যোগাইতেন। পাঁচনের পদগুলি নিজে দেখিয়া দিতেন। এই সমস্ত কারণে দেশের সকল লোকই হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ভালবাসিত ও সকলেই তাঁহার একটা না একটা উপকার করিতে পারিলে কৃতার্থ হইত।

এইরূপে সচ্ছল অবস্থায় কাল কর্ত্তন করিতেছেন। দশকর্ম্মও সচ্ছন্দে সম্পন্ন হইতেছে। এখন আর পরিবার প্রতিপালনের ভাবনা নাই। তবু যেন কেন তাহার মনে কিছু ভাল লাগিতেছে না। এই সংসার যেন কেমন একটা শূন্য শূন্য স্থান বোধ হইতেছে। মনে কোন আশা উদ্যম নাই, কোন বন্ধন নাই, সর্ব্বদাই যেন কেমন একটা উদাসের ভাব হৃদয়ে আসিতেছে। মহাভারত ভাল লাগে না, ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের সূত্রগুলি নিতান্ত নীরস বোধ হয়। অন্য কোন কাব্য ভাল লাগে না। ভাল লাগে, গ্রন্থের মধ্যে মেঘদূত, শকুন্তলা আর গীতগোবিন্দ।

আর গানের মধ্যে নিধুর টপ্পা। তাহাও আবার চপলতা প্রকাশ পায় বলিয়া মন খুলিয়া গাইতে পারেন না। চিকিৎসা ব্যবসায়ীর গাম্ভীর্য্য নিতান্ত আবশ্যক। সুতরাং শকুন্তলা, মেঘদূত ও গীতগোবিন্দ সদা সর্ব্বদাই নিবিষ্ট মনে বিরলে বসিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। এই অবস্থা প্রযুক্ত সংসারে অনেক কাজকর্ম্মে তাঁহার বীতস্পৃহা লক্ষিত হইতে লাগিল। ব্যবসার্থ ঘুরিয়া আসিয়াই আর কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, পূজা আহ্নিকের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নাই, আহার নিদ্রাতেও বিশেষ আসক্তি নাই, কেবল ঐ পুস্তকত্রয়ই নিবিষ্ট মনে পাঠ করেন। এই ভাব দেখিয়া ভ্রাতৃবধূ উমাসুন্দরী বড় ভাবনাযুক্তা হইলেন তিনি শুনিয়াছিলেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা নিতান্ত পণ্ডিত ছিলেন। সর্ব্বদা যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে সংসারের প্রতি উদাসীন হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। রামশরণের এইভাব দেখিয়া তাঁহার সেই কথা মনে পড়িল। কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। তিনি এখনও দেবরের সহিত সাক্ষাৎ আলাপ করেন না। এক একবার মনে হইতে লাগিল, এখনই তাঁহার নিকটে গিয়া গোপালকে তাঁহার হাতে দিয়া সজল নয়নে তাঁহাকে ও পথ হইতে বিরত হইতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া আইসেন। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত দেবরের সহিত কথা কহিলে লোকে নিন্দা করিবে। অন্নদাদিদী আর আস্ত রাখিবেন না। এই ভয়ে তাহা আর করিতে পারিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, রামশরণ এখন যে তিনখানি গ্রন্থ পড়েন, তাহা যোগশাস্ত্র। তাঁহার এক এক বার ইচ্ছা হইত, সর্ব্বনেশে গ্রন্থ ক'খানি আনিয়া মলাট সহিত উনানে নিক্ষেপ করেন। এইরূপ দুশ্চিন্তায় উমাসুন্দরীর কয়েক দিন কাটিয়া গেল। একদিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে আকাশমণ্ডল সহসা ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পতিত হইতেছে। তিনি গোপালকে কোলে লইয়া তাহার প্রতি অনিমেষ

লোচনে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন ও তাহার অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিয়া এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। এমন সময়ে অন্নদাদিদী তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বউ, পূবের ঘরের বারেণ্ডার শুকনো কাঠগুলি বুঝি ভিজিয়া গেল। তুমি বসিয়া বসিয়া কি করিতেছ? সংসারের কোন কাজের প্রতি দৃষ্টি নাই, আমি সমস্তদিন খাটিয়া খাটিয়া মরিব, আর ওঁরা বসিয়া বসিয়া খাইবেন। এক আধ দিন ভিজে কাঠ উনানের ধারে দিলেই দেখি নাকের জলে চখের জলে একখানে করিয়া তুলেন।" উমা-সুন্দরী পূর্ব্বেই কাঠগুলি গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন। তথাপি জ্যেষ্ঠা ননদের আদেশ পালন করিতেই হইবে। আবার একটু ভয়ও হইল, কে জানে যদি ভিজিয়াই গিয়া থাকে; একবার দেখিয়া আসা উচিত। এই ভাবিয়া তিনি গোপালের হাতে একটি বাঁশী দিয়া (নহিলে গোপাল ছাড়ে না) একখানা চটের থলির এক কোণ অন্য কোণের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া টুপি সংযুক্ত একটি ওয়াটার প্রুফ্ পোষাক প্রস্তুত করিলেন। তাহা শিরোদেশে দিয়া পূবের ঘরের বারেণ্ডায় গেলেন। গিয়া দেখিলেন, কাঠগুলি যেমন ভাবে রাখিয়াছিলেন, তেমন ভাবেই আছে। উক্ত ঘরখানা দোরোখা। রামশরণ পূর্ব্বমুখী বসিয়া ঐ সর্ব্বশেষে গ্রন্থগুলির একখানির উপর তালের মাত্রা রাখিয়া একদৃষ্টে জলধারার দিকে চাহিয়া ললিতকণ্ঠে মন খুলিয়া গাইতেছেন,—

"প্রিয়সখি কার লাগি করগো ভাবনা,
অধিক ভাবিলে পরে বাড়িবে যন্ত্রণা॥"

শুনিয়া উমার ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। তাঁহার হৃদয় পাতলা হইল। মনে করিলেন, এ ব্যাধির শান্তি আছে। অতএব হাসিতে হাসিতে নিজঘরে চলিয়া আসিলেন। রামশরণ একমনে গাহিতেছিলেন। বিশেষতঃ পশ্চিমের দ্বার অবরুদ্ধ ছিল বলিয়া ইহার কিছুই জানিতে

পারিলেন না। উমাসুন্দরীকে হাসিতে দেখিয়া গোপাল বলিল, "বউ-ঠাকুরাণি, তুই এত হাসিস্ কেন?" তিনি বলিলেন, 'তোর বাঁশী ভাল বাজে না, তাইতে হাসি।' গোপাল, 'এই দেখ কেমন বাজে' বলিয়া গাল ফুলাইয়া বিশেষ যত্নের সহিত বাজাইতে লাগিল। দেখিয়া উমা আরও হাসিতে লাগিলেন। ইহাতে গোপাল ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার ছোট ছোট কোমল হাতে তাঁহার নাকে, চখে, পিঠে দুই চারি ঘা বসাইয়া দিল। উমা শশব্যস্তে গোপালকে কোলে লইয়া জলবিম্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ কেমন ফুল ফুটেছে। যা, ভেঙ্গে গেল। দেখ আবার ফুটিল," বলিয়া তাহার মন অন্যদিকে ফিরাইয়া দিলেন; আর বলিলেন, 'গোপাল, তোর দিদীকে বল্ কাঠগুলি ভিজে নাই।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

রাত্রিতে উমাসুন্দরীর সুখে ঘুম হইল। পরদিবস যাই অন্নদাদিদী অবসর হইয়াছেন, অমনি তিনি গোপালকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। গোপালকে উপলক্ষ করিয়া দিদীকে বলিলেন, "ঠাকুরপোর এখন বিবাহের সময় হইয়াছে, চেষ্টা করিলে ভাল হয়।" অন্নদাদিদী বলিলেন 'হাঁ আমিও উহাই ভাবিতেছি। ঘরে পুরুষ কেহ নাই যে চেষ্টা করে। রামশরণ ত ভেবা গঙ্গারাম, বিবাহ যে করিবে তা' লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয় না। কেবল শাস্ত্র নিয়েই আছে। ও কি সন্ন্যাসী হবে না কি ?' অন্নদার এই কথা শুনিয়া উমা মনে মনে একটু হাসিয়া বলিলেন, 'যদি আপনি বলেন, আমি গোপালকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মত জানিতে পারি। আমার মনে লয় তিনি বিবাহ করিবেন। বিবাহ করিলে ছাড়া ছাড়া ভাবটা সারিয়া যাইবে।' অন্নদা উত্তর করিলেন, 'আচ্ছা একটু থাম, দেখি ঘরে কি পরিমাণ টাকা আছে এবং এবং জিনিষপত্রই বা কি পরিমাণ আছে।' এই বলিয়াই একখানা দা হাতে করিয়া, তিনি যেখানে শয়ন করিতেন সেই স্থানের মধ্যভাগ খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং হস্ত পরিমাণ স্থান খুঁড়িয়া একটি ঘটি উঠাইলেন। ঘটিটী কাল হইয়া গিয়াছে, কি ধাতুর তাহা বুঝা সহজ নহে। ঐ ঘটির মুখ একখানা সরাদ্বারা আবদ্ধ। উঠাইয়াই দা দ্বারা মুখের আবরণ খুলিলেন এবং টাকা একটী একটি করিয়া গণিয়া এক এক সারিতে কুড়িটি করিয়া রাখিলেন। পরে গণিতে আরম্ভ করিলেন, 'এককুড়ী, দুইকুড়ী, তিনকুড়ী, চারিকুড়ী এই পাঁচকুড়ীতে এক শ'।' এই

বলিয়া সমস্তগুলি উমার দিকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'একটা টাকা ইহা হইতে পৃথক করিয়া রাখ।' এইরূপে পাঁচকুড়ীতে 'এক শ' বলিয়া কয়েক বার টাকার স্তূপ উমার দিকে সরাইয়া দিয়া প্রতিবারেই একটি করিয়া টাকা উহা হইতে পৃথক রাখিতে বলিলেন। উমা তাহাই করিতে লাগিলেন। এইরূপে ঘটির সমস্ত টাকা গণা শেষ হইল। পরে, সীকার উপর এ হাঁড়ী হইতে কয়েক টাকা, ও হাঁড়ী হইতে কতক টাকা পরিশেষে মালার ঠোঙ্গা হইতে কতক টাকা কুড়াইয়া লইয়া গণিয়া গণিয়া দেখিলেন যে পাঁচকুড়ী হইল না। গণিয়া দেখিলেন এক, দুই, তিনকুড়ী, আর এক, দুই, তিন চারি ও পাঁচটা। পরিশেষে উমা যে কয়েকটী টাকা পৃথক রাখিয়াছিলেন, তাহা গণিলেন। এক, দুই, তিন, চারি, তবে হল চারি শত। এক, দুই, তিনকুড়ী। এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, তবে হল চারিশত তিনকুড়ী আর পাঁচটা। মনে রেখো চারিশত, তিন কুড়ী আর পাঁচ টাকা।' এই বলিয়া পুনরায় টাকাগুলি ঘটীতে পুরিয়া, পূর্ব্ববৎ পুতিয়া রাখিলেন ও তাঁহার পূজার বাসনগুলি তাঁহার উপরে রাখিলেন। ইহার পর ঘরে কি কি জিনিষ আছে তাহার তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং বলিতে লাগিলেন "আমন ধান এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয় বেড়। কলাই এক, দুই, বেড় ইত্যাদি ইত্যাদি। আচ্ছা, ঘরে যে ধান ও কলাই আছে তাহাতেই কুলাইতে পারে, কিন্তু নিজেরা খাটিয়া চাল ডাল, প্রস্তুত করিয়া না নিলে অন্যের দ্বারা করাইলে চলিবে না। বউ, পারিবে কি?" বউ মাথা নোয়াইয়া গোপালকে উপলক্ষ করিয়া উত্তর করিলেন "আমি শক্তি অনুসারে ক্রটি করিব না।" "আচ্ছা দেখা যাবে। তুমি একবার রামকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও সে বিবাহ করিবে, না খোকার মত পুঁথি লইয়াই জীবনটা কাটাইবে।" উমা "আচ্ছা" বলিয়া উঠিয়া

আসিলেন। আসিবার সময় অন্নদাদিদী বলিয়া দিলেন, "সাবধান, দেবরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত কথা কহিও না। অন্তরালে থাকিয়া গোপালকে সম্মুখে রেখে কথা কহিও।"

রাত্রি বেশ চারিদণ্ড হইয়াছে। রামশরণ আহারের নিমিত্ত উমার গৃহে "গোপাল" "গোপাল" বলিয়া ডাকিয়া প্রবেশ করিলেন। উমা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া গোপালকে সঙ্গে করিয়া একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া একটু স্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "গোপাল, বল আমার একটা কথা বলিবার আছে।" রামশরণের মনে কিছু ভয় হইল। তিনি ভ্রাতৃবধূর যথোচিত পরিচর্য্যা করিতে কখনই ত্রুটি করেন নাই, তবে আবার কথা কি। ইতস্ততঃ করিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন না, দিদী বোধ হয় আপনাকে কর্কশ কথা বলিয়াছেন; তা ওঁর কথায় কাণ না দিলেই হয়। দিদী আমাদিগকে প্রকৃতই ভালবাসেন, তাই মধ্যে মধ্যে কটু বলিয়া থাকেন, তা আমাদের হিতের জন্যই অমন করিয়া থাকেন।" উমা অমনি সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, "তিনি আমাকে কর্কশ কথা বলেন নাই। আর বলিবেনই বা কেন? আমি তাঁহাকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করি, তিনিও আমাকে মেয়ের মত ভালবাসেন। আপনাকে একটা অনুরোধ করিতে চাই।" এতক্ষণে রামশরণের বুদ্ধির গোড়ে জল গেল। তিনি বুঝিতে পারিলেন,—গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বলুন না শুনি।" উমা বলিতে লাগিলেন, "ঘরে সধবা নাই, আমরা উভয়েই কপালপোড়া। যে ঘরে সধবা নাই, সে ঘরে লক্ষ্মী থাকে না। আপনার এখন বিবাহ করা উচিত। বয়স ত হইয়াছে।" রামশরণ বলিলেন, "আমার এখন বিবাহ করার ইচ্ছা নাই। সংসার ত একরকম চলিতেছে।" এই কপট উত্তরে উমা মনে মনে হাসিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, "আপনার একটু মনে রাখা উচিত যে,

আমরা দুটী বিধবা দিবানিশি খাটিয়া আপনাদের সংসারের কাজ করিয়া থাকি। আপনার আমাদের প্রতি একটু দয়া হওয়া উচিত। আমিষ পাকের অনুরোধে আমি এখনও মাথা লইতে পারিলাম না।" এই কথা কয়টী উমা একটু বড় করিয়া বলিয়াছিলেন। রামশরণ আর কোন বিশেষ উত্তর না করিয়া বলিলেন, "আপনারা যাহা করেন তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আমি আপনাদের কথার অবাধ্য হইব না। তবে আমি বিবাহ সম্বন্ধে কোন কাজ কর্ম্ম করিতে পারিব না। টাকা-কড়ী কিছু আছে কিনা, তাহা আমি জানি না, দিদী জানেন।" উমা বলিলেন, "আচ্ছা, সে ভাবনা আপনাকে ভাবিতে হইবে না, কিন্তু হাট বাজার করিতে হইবে। আমরা তাহা করিতে পারিব না।" এই বলিয়া ননদের গৃহে প্রবেশ করিলেন। অন্নদাদিদী বিবাহের চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার এই একটা দোষ ছিল যে, কোন একটা কাজ করিতে ইচ্ছা হইলে তাহা যে পর্য্যন্ত শেষ না হইত সে পর্য্যন্ত তাঁহার চিন্তা শেষ হইত না। কি কি জিনিষ প্রস্তুত করিতে হইবে, কি কি জিনিস ক্রয় করিয়া আনিতে হইবে, কোন্ কোন্ কুটুম্ব কেমনে আনিতে হইবে, ওগ্রামে নৌকা যায় না, ডুলি পাঠাইতে হইবে, অমুকের অনেকগুলি ছেলেপিলে, পাল্‌কি না পাঠাইলে হইবে না, ইষ্টদেবের বাড়ী পদ্মাপার, তাঁহার নিমিত্তই বা কে যাইবে, ইত্যাকার নানা চিন্তাতে নিমগ্ন ছিলেন। উমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কি? বিবাহ করিবে কি?" উমা ঘাড় নোয়াইয়া কথার উত্তর প্রদান করিলেন। অন্নদা বুঝিতে পারিলেন রামশরণের মত আছে। অদ্য অন্নদিদীর বিলক্ষণ বিপদ। এতদিন ছোট ভ্রাতৃবধুকে নিজের সহিত কথা কহিতে দিতেন না। এখন অনেক কথা জিজ্ঞাসা না করিলে চলিবে না। সমুদয় ইঙ্গিতে বুঝিবেন না। কি

করেন, আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বউ, কথা কও না? এখন তোমার বয়স হইয়াছে, বিশেষ তোমার চরিত্রে আমি বড়ই সুখী আছি। তোমার পোড়াকপাল না হইলে আমি তোমাকে পূর্ণলক্ষ্মী জ্ঞান করিতাম। আমি এখন বেশ বুঝিয়াছি, তুমি আমার কথার প্রতিবাদ করিয়া আমার সহিত কলহ করিবে না। কথা কও না?" ননদ যে তাঁহার এত প্রশংসা করিবেন, এ কথা উমা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অদ্য এরূপ ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। আবার ননদ যাহা বলেন, তাহা না করিলেই প্রমাদ, ইহাও তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। অতএব তিনি অতি মৃদু স্বরে বলিলেন, "আমি গোপালকে দিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি নানা ফের-ঘোর করিয়া শেষে বলিলেন, "আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাতে তাঁহার অমত নাই। তবে তিনি বিবাহ সম্বন্ধে কোন কাজকর্ম্ম নিজে করিতে পারিবেন না। টাকা কড়ি আছে কিনা তাহা আপনি জানেন, তিনি জানেন না।" অন্নদা বলিলেন, "আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ও ভেবাগঙ্গারাম। এখন পাত্রী অন্বেষণে কাহাকে পাঠাই?" উমা বলিলেন, লোক পাঠাইয়া তাঁহার পিতাকে আনিলে ভাল হয়। ও বাড়ীর সরকার মহাশয়দ্বারা ভাল করিয়া একখানি পত্র লিখিলেই তিনি চলিয়া আসিবেন। এইকথাই ঠিক হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে উমাসুন্দরীর পিতার নিকট চিঠি লেখা হইল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উমাসুন্দরীর পিতৃকুল বিলক্ষণ সঙ্গতিসম্পন্ন। আর বিশেষ করিয়া কিছু বলা হয় নাই। পাঠক মহাশয়ের জানিতে ইচ্ছা হইলেও হইতে পারে। আর বিশেষতঃ এই আখ্যায়িকার অনেক স্থলেই উক্ত পরিবারের অনেকের নামোল্লেখ দেখিতে পাইবেন, সুতরাং আমরা কিছুকালের জন্য অন্নদাদিদী ও উমার কথা না বলিয়া, উমাসুন্দরীর পিতৃ-কুলের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

নবদ্বীপের উত্তরদিকে তিন চারি ক্রোশ অন্তর কৃষ্ণপুর নামক একটি গ্রাম। ইহার চতুর্দ্দিকেই নিম্ন সমতল মাঠ, মধ্যে মধ্যে গণ্ডগ্রাম। এটি যে নিতান্ত নিম্নভূমি তাহা দেখামাত্রই অনুভূত হইত। প্রতি গ্রামই সমতল মাঠ অপেক্ষা ১০।১২ হাত বা ততোধিক উচ্চ। উঠিবার বেলা বোধ হয় যেন পাহাড়ে উঠিতেছি। গ্রামের নিম্নদেশে প্রকাণ্ড গড়। অভ্যন্তরে খানা, ডোবা, খাল ও বড় বড় পুষ্করিণী। এই সমস্ত অবলোকন করিলে ভূতত্ত্ববিদ্যার সাহায্য না লইয়া সহজ বুদ্ধিতেই বুঝা যাইত যে, শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে কোনও কোনও দেশ হইতে লোক আসিয়া মৃত্তিকা উঠাইয়া এই সমস্ত গ্রাম সংস্থাপন করিয়াছিল। কেন যে এত আয়াসে এমন স্থানে আবাস ভূমি সংস্থাপিত করিয়াছিল, তাহার কোন কারণ ইতিহাসে দূরে থাকুক জনশ্রুতিতেও পাওয়া যায় না। তবে স্থানটী বড়ই উর্ব্বর, যাহাই রোপণ বা বপন কর তাহাতেই স্বর্ণফল প্রদান করে। বোধ হয় এই কারণেই এই স্থলে আসিয়া বসতি করিয়াছিল। যখন বর্ষাগম হয় তখন মাঠগুলি জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। গ্রামগুলি যেন সমুদ্রের দ্বীপের

ন্যায় এখানে ওখানে ভাসিতে থাকে। এক গ্রাম হইতে অন্যগ্রাম দূরে থাকুক, এ পাড়া হইতে ওপাড়া নৌকা ব্যতীত যাওয়া যায় না। গ্রামের মধ্যস্থিত গড়গুলি বর্ষাগমে খরস্রোত খাল রূপে পরিগণিত হইয়া যায়। এই কালেই গ্রামবাসিদিগের বড় আমোদের দিন। দিবারাত্রি গ্রামের মধ্য দিয়া খট্ খট্ করিয়া নৌকা চলিয়া যাইতেছে, কোন মাঝি বা

"মন মাঝি ঘাট চিনিয়া লাগাইস্ তরী,
গোল করিলে পড়্বি মারা।
নায়ের মাল্লা ছয়জন, কেও নয় সুজন.
কুজনের চূড়ান্ত তারা, ছয়জনে ছয়
দিকে টানে যে যার মনে, কখন যেন
ডুবায় ভরা।"

এই পর্য্যন্ত গাহিয়া আবার যাই ধুয়া শেষ করিয়া অন্য অন্তরা ধরিবে, অমনি অন্য কোন নৌকা সম্মুখে আসিতেছে দেখিয়া "যার যার বাঁয়" বলিয়া আবার অন্তরা ধরিয়া গাইতে গাইতে চলিয়া যাইতেছে। কোনও কোনও রসিক মাঝি বা ভেটেল রাগিণীতে "হেদেরে ভেটেল নায়ের মাঝি প্রাণের বন্ধুয়া" ইত্যাদি গান করিতে করিতে ভেটিয়া যাইতেছে। কোন মাল্লা মাঝিরসহিত ঝগড়া করিয়া চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করিতে করিতে মৃদুবেগে চলিয়া যাইতেছে। যে স্থানে স্রোত একটু বেশী, সেই স্থানে কেহ কেহ বড়সীতে জীয়ন্ত কৈ, কি লেটা মাছ বিদ্ধ করিয়া, যেন জলে ভাসিতে পারে এই ভাবে রাখিয়া দক্ষিণহস্তে টেঁটা ধারণপূর্ব্বক "বকঃ পরম ধার্ম্মিকের" ন্যায় স্থিরনেত্রে স্পন্দহীন হইয়া বসিয়া আছেন, যাই কোন প্রকাণ্ড বোয়াল কি সিলং বিদ্ধমাছ উদরসাৎ করিতে তড়িতের ন্যায় আসিয়া মুখ ব্যাদন করিয়াছে, অমনি টেঁটা নিক্ষেপে বিদ্ধ করিয়া সহর্ষে গৃহাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে। কেহ কেহ বা খানা ডোবায় বাঁশ নির্ম্মিত চাই স্থাপন করিয়া

বেলে, চিংড়ির সর্ব্বনাশ করিতেছেন। যাই বেলা ভাটি পড়িয়াছে, অমনি যুবকগণ পালে পালে এ ঘাট ও ঘাট হইতে নৌকা লইয়া বাইছ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ ছাত্রবৃন্দের কথা শুনিয়া নৌকা বাইছ করিতেন না; এই আমোদ তাঁহাদের চৌদ্দপুরুষে করিয়া আসিতেছেন, তাই তাঁহারাও করিতেন। বালকদিগের ত আর আনন্দের সীমাই ছিল না; তাঁহারা জলে ডুব দিয়া হড়্ডুবি, খালপাড়ের আঠাল অথচ ঢালুভূমিকে জল সিঞ্চনে পিচ্ছিল করিয়া, হাত, পা শূন্য ভাবে ঊর্দ্ধদিকে রাখিয়া অগ্রভাগে বসিয়া সর সর করিয়া জলে পড়িয়া পিচ্ছলি, কখন পাড়স্থ বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক তথাহইতে লম্ফ প্রদান করতঃ জলে নিপতিত হইয়া, জলঝাঁপ ইত্যাদি ইত্যাদি জলক্রীড়া করিয়া মনের মত দৈনিক অবগাহনটা করিয়া নিত। কখনও কখনও বা এই দুর্দ্দান্ত ব্যবহারের জন্য ভাই, খুড়া কি বাপের চপেটাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, কিম্বা কর্ণাকর্ষণ জনিত কষ্ট উপভোগ করিয়া তাহাদের বাড়ীতে চলিয়া যাইতে হইত; কিন্তু ইহাতেও তাহাদের শিক্ষা হইত না। বালকপ্রকৃতি ফলাফলের ধার ধারে না, যখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিয়া ফেলে।

এই কৃষ্ণপুর গ্রামেই আমাদের উমাসুন্দরীর পিতা লক্ষ্মণচন্দ্র রায়ের বাড়ী। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ নবাব সরকারে কোন বিশেষ কাজ করিয়া এই মৌজাখানা লাখেরাজ পাইয়াছিলেন। এ ভূমি সম্পত্তির আয় মন্দ ছিল না। লক্ষ্মণ রায় মহাশয়ের বাড়ীটি গ্রাম্যমতে খুব জাঁকাল গোছের ছিল। বাড়ীর সম্মুখে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী; তাহার দক্ষিণ পাড়ে কয়েক ঘর সিক্‌দারের বাড়ী, পূর্ব্ব পাড়ে নাপিত প্রভৃতি পরবৃত্তার বাড়ী, পশ্চিম পাড়ে কুলপুরোহিত মহাশয়ের ব্রহ্মোত্তর বাড়ী। উত্তর পাড়টি বাগান, তাহার এক দিকে নহবৎখানা এবং আমলা ও দরওয়ানদের পাকঘর, অন্যদিকে অতিথিশালা। তৎপরই অনতিপ্রশস্ত পুষ্পোদ্যান। কিন্তু এ উদ্যানের

কোন শৃঙ্খলা ছিল না। কয়েক ঝাড় গোলাপ, কয়েক ঝাড় বেল, কয়েক ঝাড় জবা ও স্থলপদ্ম, এখানে কতকগুলি জাতি, ওখানে কতকগুলি যূথি, এদিকে কতকগুলি রজনি-গন্ধা, ওদিকে কতকগুলি কুন্দ ও রঙ্গন ফুলের গাছ, মধ্যখানে একটা বক ও সেফালিকা বৃক্ষ। এইরূপ যাহার যেখানে ইচ্ছা সেই খানেই ফুলগাছ রোপণ করিয়াছিল। এই উদ্যানের পরই পেটকাটা ঘর। এ ঘরের এক খণ্ডে দ্বারবানদের খাটিয়া ও পাইক সর্দারদিগের লাঠী, সড়কী, ঢাল, তরবাল। অপরখণ্ডে খড়কুটা বাঁশের খণ্ড ও মাছধরার নানাবিধ যন্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র। পেটকাটা ঘর পার হইলেই বহির্বাটির প্রকোষ্ঠ। ইহার উত্তরের ভিটিতে, দুই পার্শ্বে দ্বিতল কোঠা বিশিষ্ট প্রাচীন ধরণের চণ্ডীমণ্ডপ। দক্ষিণের ভিটিতে বৃহদাকার কাঁচা বৈঠকখানা বা কাছারি ঘর। পশ্চিমের ভিটিতে দীর্ঘাকার চারিচাল বিশিষ্ট ঘর, এই ঘরে আমলারা থাকতেন। জমিদারি সংক্রান্ত প্রায় সমস্ত কাগজই ঐ ঘরের মঞ্চের উপর স্তরে স্তরে সাজান থাকিত। এই ঘরের উত্তরাংশে ও চণ্ডীমণ্ডপের পশ্চিমে একটু ছোট রকমের দোরোখা বিষ্ণুমণ্ডপ। এই প্রকোষ্ঠের পরই অন্দর মহল। এই মহলের উত্তরের ভিটিতে প্রকাণ্ড দ্বিতল দালান। দালানটি সাবেকী ধরণের। ঘরগুলি ছোট ছোট, দ্বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বিরল। ছাতে কড়ী বর্গা নাই, সমস্তই খিলান করা। এ প্রকোষ্ঠের ঘর দরজার বড় শৃঙ্খলা ছিল না। এখানে ভাঁড়ার ঘর, সেখানে দাসীদের থাকিবার ঘর, এ কোণে পাক ঘর, ইত্যাকারে কেবল ঘরে ঘরেই পরিপূর্ণ। ইহার পরেই খিড়কির পুকুর।

লক্ষ্মণ রায় মহাশয়েরা চারি সহোদর ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হরচন্দ্র বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিতান্ত বলবতী ছিল। প্রতিনিয়ত যোগ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে করিতে সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক গৃহ পরিত্যাগ করেন।

লক্ষ্মণচন্দ্র পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম যুগলচন্দ্র ও কমলচন্দ্র। লক্ষ্মণচন্দ্র কেবল বাঙ্গলা লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার বিলক্ষণ বিষয়বুদ্ধি ছিল। সমাজ ও মোকদ্দমা সম্বন্ধে দেশাচার তাঁহার করতলে ছিল। তাঁহার আর একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, কোন স্থানে বিবাদ বিসম্বাদ হইলে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে একটা মীমাংসা করিয়া দিতেন। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রদর্শিত পথে মীমাংসা করিতে অসম্মত হইত, তাহা হইলে তাহাকে এমন একটি সামাজিক পেঁচে ফেলিতেন যে, তাহাকে বাধ্য হইয়া পরিশেষে অনুগত হইতে হইত। এই সকল কারণে দেশে কোন একটা সাধারণ কাজ হইলেই লক্ষ্মণরায় মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত; বিবাহাদির ত কথাই ছিল না। তাঁহার পুত্র সন্তান কিছুই ছিল না, কেবল একটী মাত্র কন্যা উমাসুন্দরী, তিনিও বিধবা। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে লোকে মুন্সি বলিত। যুগলচন্দ্র জজআদালতের সেরেস্তাদার ও কমলচন্দ্র একটি খ্যাতনামা দারোগা ছিলেন। যুগলচন্দ্রের দুই পুত্র, দীনেশ ও খগেশ। কমলচন্দ্রের তিনটি মাত্র পুত্র, গণেশ, রমেশ ও নগেশ। দীনেশ ও গণেশ প্রথম পারস্য ভাষা পড়িতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ইংরাজের আমল, ইংরেজী ভাষাই সাহেবগণ ভালবাসে এবং লাটসাহেবের হুকুমমতে জেলায় জেলায় স্কুল বসিয়াছে দেখিয়া যুগলচন্দ্র উভয়কেই ইংরেজী পড়িতে দিলেন। দুই ভ্রাতাই প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। সুতরাং এই পরিবারে ধন ও জন-বলের ত্রুটি ছিল না। দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারমাসের বারক্রিয়া, স্ব-সম্পর্কীয় ও স্বজাতীয় উমেদারদিগকে অন্ন বস্ত্র দিয়া লেখা পড়া শিখান এবং সঙ্গতিমতে কর্ম্ম কাজ দিয়া প্রতিপালন করা প্রভৃতি সৎকার্য্যে উভয়েরই বিশেষ আসক্তি ছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উমাসুন্দরীর পিতা অন্নদাদিদীর পত্র পাইয়া ভবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখা মাত্রই অন্নদা তাঁহার চরণে প্রণামপূর্ব্বক শশব্যস্তে পা ধুইবার জল ও খড়ম আনিয়া দিলেন। কারণ এ সমস্ত তাঁহারই একচেটিয়া ছিল। কোন আত্মীয় স্বজন আসিলে অন্য কেহ তাহার পরিচর্য্যা করিলে তিনি তাহা ভালবাসিতেন না। রায় মহাশয় হস্তস্থিত চটিজুতা যোড়া চালের বাতায় রাখিয়া দিয়া হস্ত পদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া অন্নদার সহিত আলাপে বসিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা রামশরণের বিবাহের পাত্রীর নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন, এ ত নিতান্ত যৎসামান্য কাজ। সেনপাড়াগ্রামের সেনদের বাড়ী একটি কন্যা আছে। কন্যাটী দেখিতে মন্দ নয়, বয়সও ১০। ১১ বৎসর হইবে। ঘরও মন্দ নয়, আট ঘরের মধ্যে। এটির সহিত হইলে ভাল হয়।" অন্নদা বলিলেন, "আপনি যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাতে আমাদের অমত নাই। আমাদের পিতা নাই, আপনিই আমাদের পিতা। তবে একটু এই দেখিবেন যে, মেয়েটী সুলক্ষণসম্পন্না হয়। খড়ম পা, পায়ের গোছা মোটা, চুলের অগ্রভাগ কটাবর্ণ ইত্যাদি কুলক্ষণ তাহাতে কিছু না থাকে। আর মাতৃনামীয় না হয়।" সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তিনি বেশী কিছু বলিলেন না। কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল, গৃহস্থের ঝি বউ, সর্ব্বাঙ্গ ত ঢাকাই থাকে, পা দুখানি সুন্দর হইলেই হয়। আরও বলিলেন, "দেখিবেন বিবাহটা এই মাসেই হইতে পারে কি না। স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিয়াছেন ২১শে তারিখে খুব ভাল দিন আছে।" কিছুকাল কথাবার্ত্তার

পরই রায় মহাশয় চলিয়া গেলেন। তিনি এ বাড়ীতে কিছু আহার করিলেন না। কারণ এই ঘরে কন্যাদান করিয়াছিলেন, দৌহিত্র না জন্মিলে অন্ন গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার কর্ম্মদোষে তাহা আর এজনমে হইল না। তিনি যাইবার সময় উমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "মা, আমি এখন আসি গিয়ে। তুমি গোপালকে খুব যত্নে রেখ। ব্যস্ত হইও না, রামশরণের জন্য শীঘ্রই পাত্রী সংঘটন হইবে।" উমা পিতার শোকব্যঞ্জক মুখ দেখিয়া আর অশ্রু সম্বরণ করিতে না পারিয়া, চক্ষে কাপড় দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অন্য ঘরে প্রবেশ করিলেন।

দুই চারি দিনের মধ্যে রায় মহাশয়ের নিকট হইতে পত্র আসিল। সেনপাড়া সেনদের বাড়ীর কন্যার সহিতই রামশরণের বিবাহের ঠিক হইয়াছে। ১৫ই পাত্রী পক্ষীয়েরা পাত্র দেখিতে আসিবে এবং সেই দিন পত্র করিয়া যাইবে। অন্নদা সমস্ত বিষয়ের যোগাড়ে প্রবৃত্ত হইলেন। পাড়াস্থ একজন শূদ্রজাতীয়া বিধবাকে সঙ্গে করিয়া খৈ, মুড়ি, দাল প্রভৃতি নিজেই অমিততেজে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। উমাকে কিছুই স্পর্শ করিতে দিলেন না। তাঁহাকে কেবল নারিকেলের চিঁড়া, জিরা, সন্দেশ প্রভৃতি লঘুহস্তের কার্য্যে নিযুক্তা রাখিলেন। এদিকে অন্য যোগাড় চলিতে লাগিল। লোকের অভাব নাই, সকলেই রামশরণের আন্তরিক ভাবে বাধ্য। যাহাকে যাহা বলেন, সেই অমনি আসিয়া কায়মনোবাক্যে কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়া যায়।

রামশরণ আর এখন বাড়ীর ভিতর আসেন না। তাহার একটী প্রধান কারণ এই যে, বধূঠাকুরাণী তাঁহাকে দেখিলেই হাসেন। তিনি বহির্বাটিতেই থাকেন, আর শুইয়া শুইয়া কি যেন ভাবেন।

আমরা এই আখ্যায়িকায় উল্লিখিত কোন স্ত্রী কি পুরুষের রূপ এপর্য্যন্ত বর্ণনা করি নাই। নায়ক নায়িকার রূপ বর্ণন করা একটী চিরপ্রসিদ্ধ

রীতি। এই রীতির অনুসরণ না করা যে একটী অমার্জ্জনীয় অপরাধ তাহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু আমাদের এ গ্রাম্য আখ্যায়িকার যে কে নায়ক কে নায়িকা তাহা আমরা জানি না। ঘটনাগুলি যে যে রূপ ঘটিয়াছিল, যে, যে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সমাজে যেরূপ পরিবর্ত্তন ও আবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহাই আমরা পর্য্যায়ক্রমে যথাযথ বর্ণন করিতে প্রয়াস পাইব; আমরা রূপের বড় পক্ষপাতী নহি। রূপ যে কাহাকে বলে তাহাও এখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। যাহার যে রূপ তাহাই তাহার নিকট অতুলনীয়। আর বিশেষতঃ আমরা যে রূপ ভালবাসি আপনারা হয়ত সে রূপ ঘৃণা করেন। আপনারা অনেকেই হয়ত কালচুল সরু নাক, ডমরুমধ্যস্থিত সূক্ষ্মভাগের মত সূক্ষ্ম কোমর, কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু ভালবাসেন। অনেকে আবার মোটানাক, মোটাকোমর, বিড়ালচক্ষু, সোণার বরণ চুল ভালবাসেন। কেহ বা পুরুষের পক্ষে আজানুলম্বিত বাহুযুগল, প্রশস্ত বক্ষ ভালবাসেন। কেহ বা স্ত্রীসুলভ কোমলাকৃতি পুরুষই বড় সুন্দর দেখেন। কোন কোন নারী বা লোমপূর্ণ মাংসল বক্ষ বড় ভালবাসেন, কোন কোন সুন্দরী উক্তরূপ বক্ষকে কম্বল বিছানো বলিয়া শীতকাল ভিন্ন গ্রীষ্মকালে উহার নিকটবর্ত্তী হইতে চাহেন না। কোন কোন পুরুষ তন্বীস্থিরযৌবনা ষোড়শী নারী বড়ই ভালবাসেন, কেহ কেহ বা সুঠাম নাতিস্থূলকায়, কিছু দীর্ঘছন্দ প্রৌঢ়াবস্থার নারীকেই সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া মন প্রাণ তাহার চরণে অঞ্জলি প্রদান করেন। আবার এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দশে যে যে কামিনীকে পরমা সুন্দরী জ্ঞান করিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সে সৌন্দর্য্য রাশি তাঁহাদের ভাগ্যধরদের মনে লাগে না। তাঁহারা কেহ কেহ বা এই সমস্ত কামিনীর সৌন্দর্য্য বিষবৎ জ্ঞান করিয়া কোন খেঁদা-নাকী-ধবলী-নয়না, বাখারী-গঠনা নারীর রূপরাশির পক্ষপাতী হইয়া দিন যামিনী তাহাদের আরাধনাতেই

লিপ্ত থাকেন। এই যখন অবস্থা, তখন আমরা কিসে কি লিখিয়া একটা প্রমাদে পড়িব। আর যখন কোন স্ত্রী কি পুরুষ সর্ব্বাঙ্গ সুঠাম ও সুন্দর হইলেও একটা নাক কি চক্ষুর ব্যতিক্রমে পরম কুৎসিতের মধ্যে পরিগণিত হয়েন, তখন আমরা এমন অসমসাহসের কার্য্যে বড়ই ভয় পাই। কে জানে, ভুলক্রমে কোন একটি বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যদি সুন্দরকে কুৎসিত, কুৎসিতকে সুন্দর গড়িয়া তুলি।

এখন দেখা যাইতেছে সুন্দর কুৎসিত মনের কাছে। তাহা না হইলে পাঠক মহাশয়! আপনি আপনার প্রিয়তমা গৃহিণীকে সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা জ্ঞান করেন কেন? আপনি কি এফিডেবিট্ করিয়া বলিতে পারেন যে, আপনার তিনি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী? মহাভারতে উল্লেখ আছে, কোন ঋষি একজন ব্রাহ্মণকে একছড়া মালা দিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি এজগতে যাহাকে পরম সুন্দর দেখিতে পাও, তাহার গলায় এটি পরাইয়া দিয়া এস।" মুনির আদেশ শিরোধার্য্য বলিয়া, ব্রাহ্মণ ত্রিভুবনে ঘুরিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথায়ও কাহাকে পরম সুন্দর দেখিতে পাইলেন না। নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া বিরস বদনে ঘরে আসিলেন। আসিয়া নিজ কন্যাকে দেখিয়া আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন এমন ভুবনমোহিনী রূপ আর জগতে নাই। তিনি সহর্ষে ঐ মালাছড়া কন্যার গলে পরাইয়া দিলেন। কিন্তু মেয়েটী খর্ব্বা, কাল বলিয়া সকলেই তাহাকে নিতান্ত কুৎসিত জ্ঞান করিত। তবে অনেকেই বলিবেন যে, সাহিত্য সমাজের প্রবীণ ও চিন্তাশীল সুলেখক মহাশয়গণ যথাযথরূপে নায়ক নায়িকার রূপ-বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তুমি তাঁহাদের অনুসরণ করিবে না কেন? তুমি একজন অর্ব্বাচীন, অসার লিখক বই ত নও। ইহার উত্তরে আমাদের বিনীত ভাবে এই মাত্র নিবেদন যে, তাঁহারা যে রূপই কেন বর্ণন করিয়া না থাকুন; তাঁহাদের রমণীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া বর্ণিত

নরনারীর প্রকৃতি অবগত হইয়া, আমরা যে ঐ নরনারীর আকৃতি তাঁহাদের বর্ণনানুযায়ী মনে ধারণা করিয়া রাখিয়াছি, তাহা আপনারা ও তাঁহারা কিরূপে জানিলেন ? আপন মনে যে অন্যরূপ অঙ্কিত করি নাই তাহার প্রমাণ কি ? এবিষয়ে সকলে স্বাধীন। এ স্বাধীনতার কাল, অতএব আমরা রূপ বর্ণন করিয়া স্বাধীনতার ব্যাঘাত করিতে প্রয়াস পাইব না। আপনারা প্রকৃতি দেখিয়া আকৃতি ঠিক করিয়া লইবেন। অনেকে আকৃতি দেখিয়া প্রকৃতি ঠিক করে। ফ্রান্সে কেহ কেহ বা নাকের গঠন দেখিয়াই প্রকৃতি ঠিক করেন ; আপনারা কি প্রকৃতি দেখিয়া আকৃতি ঠিক করিতে সমর্থ হইবেন না ?

সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, কিছুই সুন্দর নয়, বা সকলই সুন্দর ; আমাদের রামশরণ সেন মহাশয়েরও সেই মত ছিল। তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে, হৃদয় বড়ই আনন্দময়। এ যে "দিল্লীকা লাড্ডু, যো খায়া সো ফস্তায়া, যো না খায়া সো বি ফস্তায়া" এভাব তাঁহার মনে প্রবেশ করিতেছে না। মন আশা ও উদ্যমে পরিপূর্ণ। মনে মনে কত কি ভাবিতেছেন, কত প্রেমবৃক্ষ সৃজন করিয়া তাহাকে ফলফুলে সাজাইতেছেন। স্ত্রীর আকৃতি সুন্দর কি কুৎসিত হইবে এ ভাবনায় তাঁহার হৃদয় ভারগ্রস্ত নহে। বিবাহ করিবেন, স্ত্রী পাইবেন। অল্পবয়স্কা সরল কোমলমতি স্ত্রী পাইবেন। তাহাকে নিজ ইচ্ছামত গড়িয়া লইবেন। তরুণ বৃক্ষশাখার মত যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবেই নোয়াইবেন। স্বহস্তস্থিত আর্দ্র মৃত্তিকার মত যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবেই গঠন করিয়া লইবেন। তাহাতে কোন বাধা হইবে না, কোন আশঙ্কার কারণ নাই, এ বর্দ্ধিত দৃঢ় বৃক্ষশাখা নহে যে, তাহার যে ভাবে থাকার অভ্যাস সেই ভাবেই সোজা হইয়া থাকিবে, নোয়াইতে চেষ্টা করিলে নুইবে না ; বেশী পীড়াপীড়ি কর ফাটিয়া যাইবে, তবু নুইবে না। এ বয়ঃপ্রাপ্ত উড্ডয়ন-

শীল বিহঙ্গম নহে যে, আদরে স্বর্ণশৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেও যদৃচ্ছা স্বাধীনভাবে বিহার অভ্যাস হেতু হরিগুণ গাইবে না ; তোমার মনে তুমি রাত্রিদিবা চেঁচাইতে থাক, কিম্বা মৃদু মধুর স্বরে হরিগুণ কর্ণে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা পাও, তাহার কাণে তাহা প্রবেশ করিবে না। এ তরুণ বয়স্কা বিহঙ্গ হরি, কালী, দুর্গা যাহা পড়াইবে তাহাই পড়িবে। লৌহশৃঙ্খল স্বর্ণশৃঙ্খল জ্ঞান করিবে। শিকল কাটিয়া দিলেও উড়িয়া যাইবে না। ঘরের পাখী ঘরেই উড়িয়া আসিবে ;—কেবল আসিবে না, কালে পক্ষপ্রসারণপূর্ব্বক তোমাকে আবরণ করিয়া রাখিবে। তুমি সংসার তাপে উত্তপ্ত হইলে এই ছায়াতলে আসিয়া হৃদয় শীতল করিতে পারিবে। আর যদি তুমি স্বেচ্ছাচারী হও তাহা হইলে চঞ্চুর আঘাতে তোমার প্রতিনিয়তই জ্বালাতন হইতে হইবে। রামশরণ এইরূপ কত কি চিন্তা করিতেছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে দিন চলিয়া গেল। অদ্য ১৫ই মাঘ, পাত্রী-পক্ষীয়েরা পত্র করিতে আসিবেন। বেলা আড়াই প্রহরের পর দিন ভাল, সেই সময়ে কার্য্য হইবে। বেলা প্রায় এক প্রহর হইয়া আসিল, তবু সেন-পাড়া হইতে কেহই আসিতেছেন না দেখিয়া রামশরণ বড় ব্যাকুল হইলেন। মনে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার মনে হইতে লাগিল এরা বুঝি একার্য্য করিবে না। আবার ভাবিলেন যা দূর হউক, এমন কথা হইতে পারে না। তাঁরা মহাশয় এত কাঁচা লোক নহেন, তিনি লিখিয়াছিলেন সবই ঠিক হইয়াছে; এই বলিয়া আবার ঐ পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন। দেখিলেন ঠিক ঐ কথাই লেখা রহিয়াছে। তবে কেন কেহই এখনও আসিতেছে না। কোন জ্ঞাতির সন্তান হইয়া জাতক অশৌচ হইয়া থাকিবে। তাই বা কিরূপে সম্ভব—এ ত আর অজানা কথা নয়, সম্ভাবনা থাকিলে পূর্ব্বেই বলা হইত, তবে বোধ হয় কোন বিপদ ঘটিয়া থাকিবে। বোধ হয় প্রিয়তমারই বা সহসা কোন ব্যারাম হইয়া থাকিবে। এই ভাব মনে উঠিয়াই তাঁহার কপাল দিয়া ঘাম পড়িতে লাগিল। হৃদয় মন যেন কেমন একটি অব্যক্ত যন্ত্রণায় ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। রামশরণের এখনও বিবাহ হয় নাই, পাত্রী সাপ না বেঙ, দেখেন নাই; তবু প্রিয়তমা জ্ঞান করিতেছিলেন। এ কথাতে হয় ত অনেকেই অস্বাভা-

বিক জ্ঞানে হাসিয়া উঠিবেন, কিন্তু আমরা বলি এটী অস্বাভাবিক নয়। মন স্বাধীন, নিমুক্ত, স্বচ্ছ, বহিরিন্দ্রিয়ের বড় ধার ধারে না। যে দিন লক্ষণ রায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, সেন-পাড়া সেন মহাশয়দের বাড়ীর কন্যার সহিতই বিবাহ ঠিক হইয়াছে, সেই দিন হইতেই রাম-শরণ মনে মনে ঐ কন্যাকে নিজস্ব জ্ঞান করিয়া প্রিয়তম একটা বস্তু ঠিক করিয়াছিলেন। পাঠক, বোধ হয় এইরূপ ভাব আপনার মনেও হইয়াছিল। না হইয়া থাকিলে, দেখিবার নিমিত্ত আপনার মন এত ব্যগ্র হইয়াছিল কেন? যদি বলেন সুশ্রী না কুশ্রী তাহারই কৌতূহলে, আচ্ছা যদি তাহাই হয়, তবে কুৎসিৎ দেখিয়া সেই কামিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন কেন? আমরা বলি আপনি পূর্ব্বে প্রিয়তম জ্ঞান করিয়াছিলেন বলিয়াই দেখিতে—কেবল দেখিতে নয়, পাইতে এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। অপ্রিয় বস্তু কেহ দেখিতে কি পাইতে চায় না। আপনারা রামশরণের এই ভাব দেখিয়া হাসিতে পারেন। তাহাতে বাধা নাই। তুলসীদাসও আপনার পূর্ব্বপুরুষদের বিবাহ দেখিয়া হাসিয়াছিলেন।

"সব কহে বেহা বেহা যায় কহে বেহায়ী,
ঢোল বাজাকে জিন্দাকর পয়না ক্যা তামাসা ভাই॥"

রামশরণ এইরূপ দুশ্চিন্তায় কত কি ভাবিয়া হৃদয় মন ব্যাকুল করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার সম্মুখে একটি মানুষ আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটীর মাথায় বাবরীচুল। দক্ষিণ হস্তের কনুইর কিঞ্চিৎ উপরে প্রকাণ্ড পিত্তল বলয়, গেরুয়া বসন প্রায় বক্ষের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত পরিহিত, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, শরীর খুব দৃঢ় ও সুদীর্ঘ, জাতিতে চণ্ডাল। সে প্রণাম করিয়া বলিল, "আজ্ঞা আমার নাম কালু সর্দ্দার, রায় মহাশয়েরা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা ও

পাড়ার ঠাকুর মহাশয়দের বাড়ী আহারাদি করিয়া শীঘ্রই আসিতেছেন। আপনাদিগকে সব গুছিয়া রাখিতে বলিয়াছেন।” এই সময়ে গোপাল বহির্ব্বাটিতেই ছিল। শুনামাত্রই “পত্র করিতে আসিতেছে, পত্র করিতে আসিতেছে” বলিতে বলিতে দিদী ও বধূঠাকুরাণী মহাশয়াকে বলিয়া আসিল। রামশরণ সর্দ্দারকে বলিলেন, “আচ্ছা ব’স, তামাক খাও। তুমি এখানেই স্নান করিয়া আহার কর।” সর্দ্দার বলিল, “কর্ত্তা মহাশয়েরা আমাকে এখনই যাইতে বলিয়াছেন, আজ্ঞা, আমি বিলম্ব করিতে পারি না।” “আচ্ছা বাড়ীর ভিতর হইতে কিছু খাবার নিয়া যাও।” সে তাহাই করিল। রামশরণের মন পরিষ্কার হইল; যেন সূর্য্য উদয় হইয়া কোয়াশা দূর করিয়া দিঙ্‌মণ্ডল স্বর্ণাভরণে ভূষিত করিলেন। আবার কোয়াশা আসিয়া ঘেরিতে লাগিল! তবে এবার তত গাঢ় আকারে ঘেরিল না। রামশরণ ভাবিতে লাগিলেন, তাবৈ মহাশয় লিখিয়াছেন “তাঁহারা পাত্র দেখিয়া পত্র করিয়া যাইবেন।” পাত্র দেখিবে আবার কেন? আমার কুলও মন্দ নয়, আট-ঘরের উপর। ব্যবসা করিয়া দশ টাকা উপার্জ্জনও করি। তবে আবার দেখিবে কি? তবে কি বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা করিবে? এ কথাই ঠিক। পরীক্ষা কি করিবে? হাতের লেখা, আচ্ছা আমি মন্দ লিখি না। ব্যাকরণ, তাহাতেই বা ভয় কি? আমি কলাপের ভাষ্য সহিতই স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের নিকট শিক্ষা করিয়াছি। তাঁহার মত পণ্ডিত কে? তাঁহার কোন ছাত্রই এ পর্য্যন্ত বিচারে পরাজিত হয় নাই। এইরূপ চিন্তায় মনে একটু একটু ভয়ও হইতে লাগিল, আবার সাহসও হইতে লাগিল। রামশরণ এইরূপ চিন্তায় সময় কর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

ওদিকে অন্নদাদিদী, ফুল, চন্দন, মালা, দধি, মাছ প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া একজন ব্রাহ্মণ তনয়ের সহিত গোপালকে গ্রামস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ভদ্রলোকদিগকে সভাস্থলে উপস্থিত হইতে নিমন্ত্রণ করিতে

পাঠাইলেন। পাঠানের পূর্ব্বে কি বলিয়া নিমন্ত্রণ করিতে হইবে তাহা পাঁচ সাতবার পড়াইয়া অভ্যাস করাইয়া দিলেন। গোপাল, "আমার নিবেদন অদ্য দিবা আড়াই প্রহরের সময় মমাগ্রজ শ্রীযুক্ত রামশরণ সেন গুপ্ত মহাশয়ের শুভ বিবাহের লগ্নপত্র হইবে, আপনারা সবান্ধবে উপস্থিত হইয়া সভার সৌষ্ঠব করিবেন," যোড়করে প্রতি ঘরে ঘরে বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন।

লক্ষণ রায় মহাশয় পাত্রীপক্ষীয়দের সহিত আসিয়াছেন। কন্যা-বাড়ীতে তিনি আহার করেন না প্রযুক্ত, ঠাকুর বাড়ীতেই মাধ্যাহ্নিক আহার সমাপনপূর্ব্বক তিলার্দ্ধ গৌণ না করিয়া রামশরণের বাড়ীতে আসিলেন। প্রকাণ্ড সামিয়ানা খাটাইয়া সভায় আসনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। একদিকে ব্রাহ্মণদিগের বিছানা পড়িল, দিব্য ফরাস। প্রথম চট, তাহার উপর রঙ্গপুরি সতরঞ্চ, তাহার উপর সুন্দর গালিচা, পিছনের দিকে ঠিক মধ্যস্থলে দুইটী স্থূলকায় তাকিয়া, সম্মুখে দুইটী গাঙ্গীবৈঠকের উপর দুটি কড়ী বাঁধা হুঁকা। অপর দিকে প্রায় তদ্রূপ ফরাস, তবে এই বেশকম যে, এখানে গালিচার পরিবর্ত্তে সাদা পরিষ্কার চাদর ও কড়ী বাঁধা হুঁকার পরিবর্ত্তে কাঁসার বাঁধান হুঁকা। এই ফরাস অন্য অন্য ভদ্রলোকদিগের নিমিত্ত। অপর দুই দিকের একদিকে নারায়ণ চক্রের আসনের স্থান, অন্য দিকে অর্থাৎ সর্ব্ব দক্ষিণে শূদ্র প্রভৃতি পরিচারকগণের বসিবার নিমিত্ত শুধু চট বিছানা। এইরূপে সভার আসনের ব্যবস্থা হইল। গ্রামের পূজারি ঠাকুর মহাশয় আসনসহ নারায়ণচক্র আনিয়া যথাস্থানে সংস্থাপন করিলেন। তাহার সম্মুখে আম্রপল্লব নিশিষ্ট সজল ঘট সংস্থাপিত হইল। তাহার নিকটে একহাঁড়ি দধি, একটা রোহিত মৎস্য, তিন চারি থালা বেলগাছী বাতাসা ক্রমে ক্রমে আনিয়া রাখা হইল। তৎপর তার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে চারিখানা আসন পড়িল। দুখানা পূর্ব্বমুখি, দুখানা পশ্চিমমুখি। দুখানা পাত্রপক্ষের কর্ত্তা ও পুরোহিত, অপর দুখানা।

পাত্রীপক্ষের কর্ত্তা ও পুরোহিতের নিমিত্ত। এই চারিথানার মধ্যস্থলে পুষ্প, মাল্য, গন্ধ, দূর্ব্বা, ধান সিন্দুর পরিপূর্ণ একখানি থালা রাখা হইল। চারি কোণে চারিজন লোক দাঁড় করিয়া রাখিলেন, যেন কোন নীচ জাতীয় লোক সামিয়ানার নীচে আসিতে না পারে। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় আসিয়া দণ্ডেকের মধ্যেই কেলে, হরি ও ভোলার সাহায্যে এ সমস্ত সম্পাদন করিয়া উঠিলেন।

ক্রমে গ্রামস্থ নিমন্ত্রিত লোক আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ছেলেপিলের আ'জ বড় আনন্দের দিন, পত্রের বাতাসা পাইবে। হরি খুড়ার হাতের লিখা বড় সুন্দর, সকল বিবাহেরই পত্র তিনি লিখিয়া থাকেন, এবিবাহের পত্রও তিনিই লিখিবেন। অতএব মাছ, পান, দধি তাঁহারই প্রাপ্য। সুতরাং তাঁহার আজ আহ্লাদের সীমা নাই। তবে তিনকড়ী জেলে আজ পত্রের নিমিত্ত একটা প্রকাণ্ড চাইন মৎস্য আনিয়াছিল, তাহা অন্নদাদিদী, আঁইসছাড়া মাছ বিবাহের শুভপত্রে লাগে না বলিয়া ফেরত দিয়াছিলেন। ইহাতেই তিনি কিছু আপসস্ করিতেছিলেন। পাত্রী পক্ষীয়েরাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ক্রমে সভা পরিপূর্ণ হইল। পাত্রী পক্ষীয় পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "এখনও পত্রের সময় হয় নাই। এখন পাত্রের হাতের লিখা পরীক্ষা করা যাউক।" এই কথা শুনা মাত্রেই রামশরণের গা শিহরিয়া উঠিল; কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন, "পাত্র কবিরাজি করে, ইহার আবার হাতের লেখা দেখিবেন কি? নাড়ী টিপিতে ও বড়ী পাকাইতে পারে কি না, তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। এ ত আর নায়েবী করিয়া খাইবে না।" এই কথাগুলি কিছু ব্যঙ্গভাবে বলা হইয়াছিল। তাহাতে আবার পাত্রীর পিতা নায়েবী করিতেন। সুতরাং শুনা মাত্রেই পাত্রী পক্ষীয় কর্ত্তা ও পুরোহিত মহাশয়, তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং সদর্পে উত্তর করিলেন,

"মহাশয়, আমরা হস্তাক্ষর না দেখিয়া একার্য্য করিব না। আমরা না দেখে শুনে কি একটা মূর্খে পাত্রী সম্প্রদান করিব ?" পাত্রপক্ষের একজন "আপনারা কি না শুনে—" এই পর্য্যন্ত বলাতেই লক্ষ্মণ রায় মহাশয় "থাম না বাবা" বলিয়া, কিছু বিরক্তির সহিত রামশরণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এদিকে এস না বাবা, দুই ছত্তর লিখে দেখাও।" রামশরণ দায়রার আসামির ন্যায় এগিয়ে আসিলেন। রায় মহাশয়ের মুখপানে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "কি লিখিব ? সংস্কৃত না বাঙ্গলা।" "এ সংস্কৃতের কাজ নয় বাবা, সেবক পাঠ লেখ" এই বলিয়া রায় মহাশয় এক খণ্ড কাগজ, দোয়াত, কলম তাঁহার নিকটে দিলেন। রামশরণ বাঁশ নির্ম্মিত ইলগেপেটি কলম সজোরে মুট করিয়া ধরিয়া, এই কলমের অবশিষ্ট অংশ তর্জ্জনীর সমান্তরাল করিয়া, বাম হস্তে ভাঁজ করা কাগজখানা বক্ষের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত তুলিয়া যোড়াসন হইয়া বসিয়া লিখিতে লাগিলেন।

"সেবক শ্রীরামশরণ সেন গুপ্ত প্রণামা বহব নিবেদনঞ্চ
বিশেষ আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে অত্রানন্দদং পরং"

লক্ষ্মণ রায় মহাশয় দেখিলেন যে রামশরণের হাত কাঁপিতেছে, অতএব তিনি বলিলেন, থাম, আর লিখার দরকার নাই।" কাগজখানা টানিয়া আনিয়া পাত্রী পক্ষীয়দিগের নিকট ফেলিয়া দিলেন। তাঁহারা মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন। রায় মহাশয় বলিলেন, "সমানি সমশীর্ষাণি ঘনানি বিরলানিচ" ভাল করিয়া দেখুন ঠিক এই সূত্র অনুসারে হইয়াছে কি না। পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "না, বড় সুন্দর লেখা, এরূপ সুন্দর খুব কম লোকেই লিখিতে পারে।" এই কথা শুনা মাত্র সাতপুরুষে শিক্ষাগুরু সগর্ব্বে ফুলিয়া উঠিলেন, "মহাশয় এ ৺কালী মজুমদার মহাশয়ের সাইন, এ সাইন আমার কাছে ভিন্ন অন্য কাহারও কাছে পাইবেন না।" এখানে একথা বলা আবশ্যক যে

ভবদ্বীপের মজুমদার মহাশয়গণ বংশ পরম্পরায়ই অতি সুন্দর লিখেতেন। তাঁহাদের একটা রীতি ছিল যে, শ্রীপঞ্চমীর দিবস সরস্বতীর পুজা করিয়া প্রতিমাখানি বিসর্জ্জন না দিয়া গৃহঘরে রাখিয়া দিতেন। এক দিন বালক মহালে "মজুমদারদিগের হাতের লেখা এত ভাল হয় কেন?" এই প্রশ্নের, আন্দোলন হইয়া এই ঠিক হয় যে, সরস্বতীর মূর্ত্তি বারমাস রাখাই ইহার কারণ। উহাদের মধ্যে একটী দুষ্ট বালক বলে যে, কোন ক্রমে ঐ মূর্ত্তি চুরি করিয়া আনিতে পারিলেই সকলের লেখা ভাল হইবে। সকলেই এ কথায় সায় দিয়া ঐ মূর্ত্তিখানি চুরি করিয়া আনে। ইহা লইয়া পাড়ার মেয়েদের মধ্যে বিষম কলহ হইয়া যায়।

হাতের লেখা দেখার গোলটা চুকিয়া গেলে স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন, "আপনারা গোল করিয়া সময় কর্ত্তন করিবেন না। সময় প্রায় অতীত হইয়া আসিল। পাত্র দেখিয়াছেন, হস্তাক্ষরও দেখিয়াছেন, যদি আমার ছাত্র রামশরণের সহিত পুরোহিত মহাশয়ের ব্যাকরণে বিচার করিতে ইচ্ছা থাকে, পরে হইবে। আর আমরাই বা বিচার না করাইয়া ছাড়িব কেন? এখন পত্র করিয়া ফেলুন।" পুরোহিত মহাশয়ের বিচারের কথা শুনিয়া মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি অমনি বলিলেন, "বিচারের আর আবশ্যকতা নাই। আপনার ছাত্র যে বিলক্ষণ পণ্ডিত তাহা আমরা পুর্ব্বাপরই জানি, তবে হস্তাক্ষর দেখা একটা চিরপ্রথা তাহাতেই আমরা দেখিলাম। এখন আর বিলম্ব নাই, পত্র লিখিলেই হয়।" স্মৃতিরত্ন মহাশয় হরি খুড়ার দিকে চাহিলেন। হরি খুড়া প্রস্তুত ছিলেন। তিনি কালীকলম নিয়া অমনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন,

"নমো প্রজাপতয়ে।
স্বস্তি সকল মঙ্গলালয়। শ্রী—
ইত্যাদি ইত্যাদি"—

এই পত্রের ছত্র সমষ্টি বেযোড় হওয়া চাই অতএব তিনি গুণিলেন, দেখিলেন ঠিক নয় ছত্রর হইয়াছে। এবারও কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া পাত্রপক্ষের খানাও লেখা হইল। দুইখানি পত্রই পড়া হইল। রামশরণ জানিলেন তাঁহার শ্বশুরের নাম নীলকণ্ঠ সেন এবং স্ত্রীর নাম হরসুন্দরী। দুই পক্ষের দুইজন তাহাতে দস্তখত করিলেন। লক্ষ্মণচন্দ্র রায় গুপ্ত মধ্যস্থ হইয়া উভয় খানিতেই দস্তখত করিলেন। পাত্রী পক্ষীয়েরা কিছু নীচ কুল, যে সমস্ত কুলীন তাহাদের বাড়ী যাইবেন, তাঁহাদের কুল মর্য্যাদা যথোপযুক্ত-রূপে দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। এই সকল কথা পরিষ্কার হইয়া গেলে পর একটি টাকাতে সিন্দুর লেপিয়া দুইখানা পত্রেই মোহর করা হইল। পাত্র ও পাত্রীপক্ষীয় কার্য্যকারক দণ্ডায়মান হইয়া একে অন্যের হাতে পত্র প্রদান পূর্ব্বক কোলাকোলি করিয়া অভিবাদন করিলেন। অন্তঃপুর হইতে উলুধ্বনি হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় সকলকে বাতাসা বিতরণ করিলেন, সভা ভঙ্গ হইল। অন্নদাদিদী আসিয়া লেখকের বাড়ী মাছ, পান, দধি পাঠাইয়া দিলেন, একজন আয়াগুধারা ঘটটী বড় ঘরে লইয়া গেলেন। উমাসুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঠাকুরকথা, ঠাকুরপোর আজ লিখার সময় হাত কাঁপিয়াছিল।" তিনি উত্তর করিলেন, "কাঁপিবারই ত কথা, ভাগিনা মারিলে বিবাহের সময় লিখিতে হাত কাঁপে। রাম যে দিন জয়চন্দ্রকে মারিয়া ছিল সেই দিনই আমি ইহা বুঝিয়াছিলাম।" পাঠক মহাশয়ের বোধ হয় মনে থাকিতে পারে যে, ঐদিন অন্নদাদিদী স্মিত মুখে বাটীর অভ্যন্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন। বিবাহের দিন ঠিক হইল, অন্নদাদিদী কুটুম্ব আনিতে স্থানে স্থানে লোক পাঠাইতে লাগিলেন। আত্মীয়দিগের নিকট নিমন্ত্রণপত্র গেল। জয়চন্দ্রকেও বাড়ী আসিবার নিমিত্ত চিঠি লিখা হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

কথিত আছে শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বে মুসলমান শাসনের সময় শ্রীমন্ত চৌধুরি নামক কোন ব্যক্তি মুরসিদাবাদে সৈনিক কার্য্য করিতেন। তিনি কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে এ অঞ্চলে প্রেরিত হন। কার্য্য শেষ করিয়া আর দেশে ফিরিয়া যান না। যাইবেনই বা কিপ্রকারে, ছেলেবেলায় লেখা পড়া না শিখাতে সকলে তাঁহাকে মূর্খ বলিয়া উপহাস করিত। এই ধিক্কারে গুপ্তবেশে সৈনিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ কার্য্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি লাভ হওয়াতে, তিনি আরও উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন, কারণ তিনি যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করা নিতান্ত নিন্দনীয় ছিল। এই কারণে তিনি আর দেশে ফিরিয়া গেলেন না। নবাব সরকারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, অতি সহজেই একটী পরগণা কম খাজানাতে বন্দোবস্ত লইয়া খালিয়া নামক গ্রামে বসতি করিতে লাগিলেন। তখন এই পরগণার অধিকাংশই জলে ডুবা ছিল। শ্রীমন্ত চৌধুরি মহাশয় বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া এদেশে বিবাহ করিলেন। তিনি যে বৈদ্যবংশ সম্ভূত ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই, কারণ তিনি দত্তবংশজাত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্য কোন জাতি হইলে কষ্টকুল সংজ্ঞা না দিয়া অন্ততঃ আট ঘরের এক ঘর বলিয়া প্রচার করিতেন। ইহাতে তাঁহার বাধা হইত না। তিনি একজন নিতান্ত বলশালী লোক ছিলেন, পেঁচ গোছের ধড় ধার ধারিতেন না। তিনি এক দিবস অশ্বারোহণে সেনপাড়ার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে দেখিলেন যে, কতকগুলি লোক একখানে দাঁড়াইয়া আছে; তিনি

কৌতূহলে অশ্ব হইতে নামিয়া দেখিলেন যে, একটি বৃহদাকার ভেক একটি ক্ষুদ্র সর্প খাইতেছে, ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এ দেবাশ্রিত স্থান, না হইলে কখনই এরূপ অসম্ভব কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না, অতএব এই স্থানেই আবাসভূমি সংস্থাপন করা উচিত। এই ভাবের বশতাপন্ন হইয়া অচিরে এই মাঠে মৃত্তিকা উঠাইয়া বাসভবন প্রস্তুত করিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহচর অনুচরেরাও এই স্থানে আসিয়া বাড়ী প্রস্তুত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। ক্রমে এই বসতি সেনপাড়ার সহিত মিলিত হইয়া একটি বিস্তীর্ণ জনপদে পরিণত হইল। সেনপাড়ার ক্ষুদ্র তালুকদারগণ তাঁহার ভয়ে কোন বাধা জন্মাইতে সাহস পাইলেন না।

শ্রীমন্ত নিতান্ত বলশালী ছিলেন। তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে এখনও লোকমুখে অনেক কথা শুনা যায়। তিনি এক দিবস নদীর ধার দিয়া আসিতেছিলেন, সহসা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, সঙ্গে ছাতা ছিল না, কি করেন, সম্মুখে একখানা ডিঙ্গি নৌকা বাঁধা ছিল, দেখিতে পাইয়া সেইখানা দুই হস্ত দ্বারা উঠাইয়া মাথার উপরে ধারণ পূর্ব্বক বাড়ীতে আসিলেন। নৌকাখানা পরে ৬।৭ জন অতি কষ্টে নদীতে রাখিয়া আসিল। আর একদিন তিনি কার্য্য উপলক্ষে কোন স্থানে যাইতেছিলেন। রাস্তাটা কিছু জঙ্গলা, পথিমধ্যে একটা মহিষ তাঁহাকে দেখিয়া তাড়া করিয়া আসিল। তিনি উহাতে কিছুমাত্র ভয় না করিয়া বীরের ন্যায় স্থিরনেত্রে উহার দিকে চাহিয়া গাত্র সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। মহিষ যাই প্রকাণ্ড শিঙ্গ দুটী নীচমুখি করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবে, অমনি তিনি সজোরে দুই শিঙ্গ দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া বামদিকমুখি আবর্ত্তন করতঃ মুখখানি ঘাড়ের উপর উঠাইয়া কিঞ্চিৎকাল রাখিয়া মহিষাসুরকে সূর্য্যদেব দর্শন করণানন্তর, ক্রমে একটি প্রায় বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া ডান দিকে আনিয়া বসুন্ধরা দর্শন করাইয়া,

স্বর্গলোকে প্রেরণ করিলেন। অন্য আর একদিবস নদীতে সায়ংসন্ধ্যা পড়িয়া বাড়ী আসিতে কিছু রাত্রি হইল। বাড়ী একটু দূরে, সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র মাঠের মধ্যে একটা প'ড়ো ভিটা, তাহার উপর একটি প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছ। যে সমস্ত শিশুর মৃত্যু হইলে শাস্ত্রমতে দাহকরা যায় না, লোকে তাহাদের মৃত শরীর হাঁড়িতে পুরিয়া, এই ভিটায় পুঁতিয়া রাখিত। এই ভয়ঙ্কর ভূমির তেঁতুল গাছে একটি যোগিনী থাকিত বলিয়া লোকে ঠিক দুইপ্রহরের সময়, বা সন্ধ্যার পর উহার নিকট দিয়া যাতায়াত করিত না। কিন্তু চৌধুরি মহাশয় ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ী যাইবেন বলিয়া সোজাসোজি ঐ পথে চলিলেন। যাই উহার নিকট গিয়াছেন অমনি ঐ গাছ হইতে বিশ্রী, বিবর্ণা বিকট দশনা, উলঙ্গাকৃতি একটা প্রেতমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া "কেঁ তুঁই আঁমাঁর গাঁছেঁর নিঁকঁট দিঁয়া যাঁইতেঁছিঁস তোঁকেঁ খাঁইয়াঁ ফেঁলিঁবঁ" বলিয়া হা করিল, চৌধুরি মহাশয় তাহার কপোলদেশে সুদৃঢ় চপেটাঘাত করিলেন। প্রেতিনী "মঁলেঁমঁ মঁলেঁমঁ" বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে প্রাণত্যাগ করিল। তৎপর দিবস লোকে দেখিল একটি দাঁড়কাক মরিয়া রহিয়াছে।

শ্রীমন্ত চৌধুরি মহাশয়ের বিবাহ সম্বন্ধে একটা রোগ ছিল। তিনি ক্রমে তিন বিবাহ করিয়া তিন স্ত্রীর তিন বাড়ী করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। এই তিন স্ত্রীর বয়স অনুসারে এই তিনটি বাড়ী ক্রমে বড়ভাগ, মধ্যভাগ ও ছোটভাগ নামে পরিচিত হয়। সকল স্ত্রীরই তুল্য দাসদাসী ছিল। তবে ছোট স্ত্রী তাঁহার মনেরমত স্ত্রী ও অসাধারণ বলশালিনী ছিলেন বলিয়া বিশেষ আদরণীয়া ছিলেন। তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি একদিবস গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। চৌধুরি মহাশয় আসিয়া গৃহের দ্বার খুলিতে বলেন। চক্ষেতে নিদ্রার আবেশ থাকাতে অর্গলটী খুলিতে কিছু বিলম্ব

হইতে লাগিল। তাহাতে চৌধুরি মহাশয় তাঁহাকে নিতান্ত দুর্ব্বলা বলিয়া উপহাস করেন। ইহাতে তিনি দ্বারের অর্গলটী খুলিয়া দুই হস্তদ্বারা অবরুদ্ধ করিয়া বলিলেন, "দ্বার খোলা হইয়াছে শক্তি থাকিলে, ঠেলিয়া প্রবেশ করুন"। তিনি শক্তিরূপিণীর ন্যায় বলপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। ভোলানাথ যত শক্তি আছে তাহা সমস্ত প্রয়োগ করিয়াও কোনক্রমে গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। পরে অনুনয় বিনয়ে শক্তিকে আরাধনা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পদতলে পড়িয়া রহিলেন। তিনি মাঝে মাঝে তাঁহাকে দুর্ব্বলা বলিয়া পরিহাস করিতেন, এই হইতে আর তাহা করিতে সাহস পাইতেন না। এই গেল তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে। সাহস সম্বন্ধেও এইরূপ কথিত আছে, এক দিবস শনিবার অমাবস্যার রাত্রিতে তিনি মাছ ভাজিতেছিলেন; এমন সময় আঁস্তাকুড়ের শেওড়া গাছ হইতে একটী পিশাচী আসিয়া বলিতে লাগিল "আঁমাকেঁ এঁকখাঁনঁ মাঁছ ভাঁজাঁ দিঁবিঁ"। তিনি বলিলেন, "থাম, দিতেছি।" এই বলিয়া হাতাখানা উনানে দিয়া উত্তপ্ত করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন যে বেশ লাল হইয়াছে; তখন বলিলেন "এই ফুকার দিয়া হা কর।" যাই পিশাচী হা করিয়াছে অমনি হাতাখানা তাহার মুখে প্রবেশ করিয়া দিলেন। পিশাচী চেঁচাইতে চেঁচাইতে পগারে গিয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরদিন দেখা গেল একটা দাঁড়কাক মরিয়া রহিয়াছে।

শ্রীমন্তচৌধুরি মহাশয়ের অনেক সন্তান সন্ততি হয়। তাঁহারা প্রায় সকলেই বলশালী ও অসীম সাহসপরিপূর্ণ ছিলেন। ক্রমে এই চৌধুরিকুল গ্রামখানি উজ্জ্বল করিয়া তুলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই লাঠিখেলা, তরওয়ালভাঁজা, সড়কি চালান প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষ পরিপক্ক ছিলেন। তাঁহাদের উদাহরণে লাঠিখেলা কার্য্যে অধিকারস্থ সমস্ত প্রজাই বিশেষ পটু হইয়াছিল। এমন কি ইচ্ছা করিলে চৌধুরি মহাশয়েরা এক রাত্রির

মধ্যে সহস্রাধিক লাঠিয়াল একডাকে উপস্থিত করিতে পারিতেন। এই সমস্ত কারণে দেশে তাঁহাদের দুর্দ্দমনীয় প্রতাপ ছিল। তাহাতেই দেশস্থ সকল লোকেই ভয়ে বাক্যস্ফুট করিত না। যদি কখনও কখনও কেহ কেহ নিজ সত্ত্ব রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহাদের ক্রোধভাগী হইতেন তাহা হইলে চৌধুরি মহাশয়েরা এই বিপক্ষেদের গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী কোন অবিরোধীয় গ্রামে সদলে উপস্থিত হইয়া এক রাত্রির মধ্যেই গ্রামখানি সম্পূর্ণরূপে উচ্ছন্ন দিয়া, তথায় কলা, মান গাছ প্রভৃতি রোপণ ও তাহার মূলদেশে ছাই ও আবর্জ্জনা ফেলিয়া এমনভাবে রূপান্তর করিয়া দিতেন, যে দেখিয়া বোধ হইত, ঐ স্থানে কোনদিনই বর্ণিত গ্রাম ছিল না। কখন কখন বা অবস্থা অনুসারে স্বপক্ষীয় কোনও কোনও লাঠিয়ালের উরুদেশে সড়কি বিদ্ধ করিয়া, কখন কখন বা কাহারও কাহারও হস্ত রাম দা দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া একটা মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া বিপক্ষদিগকে বিশেষ জব্দ করিতেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "ভেতো বাঙ্গালী কোনকালেই ভীরু বই কষ্টসহ ও সাহসী ছিল না।" একথার উত্তরে আমাদের কিছু বলিবার নাই। তবে এইমাত্র আমরা বলি, তাঁহারা আত্মজাতি সম্বন্ধে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি? আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা জগতের কোন ইতিহাসে, কোথায়ও এমন শুনিয়াছেন কি, যে ভূস্বামির সামান্য উপকারের নিমিত্ত নিঃস্বার্থে হাসিতে হাসিতে উপরিউক্ত প্রণালীতে সড়কী বিদ্ধ করিয়া, রাম দা দ্বারা হস্ত কি অন্য প্রত্যঙ্গ কর্ত্তন করিয়া সরক্ত কলেবরে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে? অপরপক্ষের লোকদ্বারা বল্লম কি সড়কী বিদ্ধ হইলেও লড়াই হইতে ফিরে নাই। জমিদারকে নিরাপদ রাখিবার নিমিত্ত প্রাণান্তেও লাগ বিপক্ষের হস্তে ফেলিয়া পলায়ন করে নাই। যদি বলেন যে পেটের জ্বালায় ও অর্থলোভে

কে কি না করিয়া থাকে? আমরা সাহসের সহিত বলি তাহা কখনই নয়। এ স্বর্ণ বাঙ্গালা ভূমিতে খাবার অভাব নাই, তখন আরও ছিলনা। এ অন্নক্লিষ্ট গৃহত্যাগী-পাথরচাটা-হাড়টিবান-কৃষকের দেশ নয়। আর যে জাতি শক্তির উপাসক, নরমুণ্ডমালা, নরকপাল, নরশোণিতই যে জাতির পূজার আদর্শ, সে জাতি যে শক্তি সাহস কাহাকে বলে, বীর ভাব কি জানিত না তাহা আমরা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারি? তবে চিরকাল কাহারও সমান যায় না, কালে সভ্য বর্ব্বর, বর্ব্বরও সভ্য হইয়া থাকে। এ সেই কাল।

চৌধুরি মহাশয়েরা কয়েক পুরুষ এইরূপ অত্যাচার করিয়া, কালে নিতান্ত নির্ধন হইয়া পড়েন। ব্রিটিশ শাসনে তাঁহাদের ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে খর্ব্ব হইয়া আসিতে লাগিল। এখন আর বাড়ী থাকিয়া কাহারই গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় স্বচ্ছল মত হয় না; সুতরাং সকলেই বিদেশে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করেন।

আমাদের নীলকণ্ঠ সেন মহাশয় এই পরিবারে বিবাহ করেন। তিনি বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ ও ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন বলিয়া চৌধুরি মহাশয়েরা সকল সরিকে তাঁহাকে বিশেষরূপ অনুরোধ করিয়া, তাঁহাদের জমিদারির সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তিনি যদিও জানিতেন যে আত্মীয়দের অধীনে কাজ করা সঙ্গত নয়, তথাপি চৌধুরি মহাশয়দের, বিশেষতঃ প্রিয়তমা পত্নী কমলা সুন্দরীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি কার্য্যে প্রবেশ করিয়াই মহালটা জরিপ করিয়া কাগজ পত্র ঠিকঠাক করিয়া লইলেন। যাহার যে দেয় খাজানা তাহার পরিষ্কার মত জমাবন্দি করিলেন। প্রজাগণ হইতে কৌশলে অবস্থাভেদে দয়া মায়া করিয়া জমিদারের খাজানা আদায় করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজ তহবিল নিমিত্ত বড় পীড়াপীড়ি করিতেন না বলিয়া, পরগণার সকল লোকেই

তাঁহার নিতান্ত বাধ্য হইয়া উঠিল। ইহাতে তাঁহার বিলক্ষণ আয়ও হইতে লাগিল। তাঁহার যখন যে ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত হইত, বা যখন তিনি যে বিপদে পড়িতেন, গ্রামের মাতব্বরগণ শুনামাত্রই আসিয়া আপনারাই একটা চাঁদা করিয়া কেহ কেহ বা কায়িক পরিশ্রমদ্বারা তাহার উদ্ধার করিয়া দিত। সরদারকুল তখনও নির্ম্মূল হয় নাই। প্রধান প্রধান লাঠিয়ালেরা আরিন্দাগিরি ও পাইকের কাজ করিত। বিবাহ কি পূজা উপলক্ষে জমিদার ও নায়েববাড়ী আসিয়া নিজ নিজ লাঠি খেলার দক্ষতার পরিচয় দিত। মামলা মোকদ্দমার সময় ইহাদিগদ্বারা বিশেষ উপকার হইত। লক্ষ্মণ রায় মহাশয়দিগের সঙ্গে কোন একটা চর নিয়া চৌধুরি মহাশয়দের বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদীয় ভূমি তদন্ত করিয়া দেখিবার নিমিত্ত রামনাথ রায় মহাশয় আদালত হইতে আমিন নিযুক্ত হইয়া চরে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় এ বিষয়ে পূর্ব্বেই অনুসন্ধান রাখিয়াছিলেন বলিয়া অগ্রেই তথায় যাইয়া উপস্থিত হয়েন। নীলকণ্ঠ সেন মহাশয় এই কথা শুনা মাত্র কালু সর্দ্দারকে সঙ্গে করিয়া নদীর ধারে গেলেন; কিন্তু তথায় কোন নৌকা না পাওয়াতে নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যাকাল, প্রশস্ত নদী, কেমনেই বা পার হইবেন। যদি না যাইতে পারেন তাহা হইলে মনিবের কাজ নষ্ট হয়, এইরূপ দুশ্চিন্তা করিতেছেন। নায়েব মহাশয়ের মুখ মলিন দেখিয়া কালু বলিল, "কর্ত্তা মহাশয় ব্যস্ত হবেন না।" এইরূপ বলিয়া পরিধান-বস্ত্রখানি মস্তকে বাঁধিয়া গামছা পরিয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া সন্তরণ করিতে করিতে চরে গিয়া উঠিল, আমিন মহাশয়ের বাসা ঠিক করিয়া গুপ্তভাবে তাঁহার শয়নের চৌকির নীচে গিয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিল। দুই চারি দণ্ড রাত্রির পর সন্ধ্যা পড়িয়া আমিন ও লক্ষ্মণ রায় মহাশয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। অনেক আলাপের পর আমিন ৫০০৲ টাকা নিয়া তাঁহার

স্বপক্ষে রোবকারি করিবেন বলিয়া ঠিক হইল। রায় মহাশয় যেই টাকাগুলি গুনিয়া স্তুপাকারে আমিন মহাশয়ের নিকট রাখিয়াছেন, অমনি কালু সর্দ্দার চৌকির নীচ হইতে বাহির হইয়া সদর্পে উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, "দোহাই কোম্পানী বাহাদুরের, লোক সকল সাক্ষি থেক, আমিন মহাশয়, রায় মহাশয়ের নিকট হইতে ৫০০৲ টাকা খাইয়া, আমার মনিবের সর্ব্বনাশ করিতেছেন।" আমিন মহাশয় অবাক, কিন্তু আদালতের আমলা, অমনি বলিয়া উঠিলেন, "রায় মহাশয় আপনার বড় অন্যায়, আমি কি ঘুস খাইয়া এমন অধর্ম্মের কাজ করিব ? অগত্যা রায় মহাশয় কিছু দুঃখিত হইয়া টাকাগুলি ফেরত নিলেন। পরদিন আমিন মহাশয় ম্লানমনে ফিরিয়া গিয়া প্রকৃত ঘটনার রোবকারি করিলেন। মামলায় চৌধুরি মহাশয়েরা জয়লাভ করিলেন।

নীলকণ্ঠ সেন মহাশয়ের চারি পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। ১ম ও ২য় পুত্র ১৮ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মারা যায়। ১ম কন্যাটীও ঐ বয়সে সন্তান প্রসব করিবার সময় পরলোক গমন করে। এখন হরি ও কাশীনাথ নামক দুই পুত্র এবং হরসুন্দরী একমাত্র কন্যা। তিনি উপর্য্যুপরি পুত্র কন্যা শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রতি আঘাতেই এক একটী দাগ তাঁহার হৃদয়ে পড়িয়াছিল। শরীর দগ্ধ হইলে অচিরে জ্বালা যন্ত্রণা নিবৃত্তি হইয়া, ঘা শুকাইয়া যায়; কেবল একটি মাত্র দাগ পড়িয়া থাকে। কিন্তু হৃদয়ের ঘা যায় না। কালে কিছু বিরাম অবস্থায় থাকে বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে তুষের আগুনের মত রহিয়া রহিয়া জ্বলিয়া দগ্ধ করিতে থাকে। পরিণামে এ দেহ চিতায় ভস্মীভূত না হইলে এ ব্যথা ভস্ম হয় না। পরিনামেই যে হয়, তাহাই বা কে জানে ? অবিনশ্বর আত্মার সঙ্গে সঙ্গে যে অবিনশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয় না, তাহাই বা জানি কিরূপে ? নীলকণ্ঠ এখন আর বিশেষ কোন কার্য্য কর্ম্ম করেন না। মোহরেরা

সমস্ত করে, তবে যখন যে কাজ না করিলে মনিবদের অনিষ্ট হয়, তাহাই করিয়া থাকেন। প্রায় অধিকাংশ সময়ই গ্রামের কালী বাড়ীতে পড়িয়া থাকেন, ও তথায় স্বরচিত মালসী গান গাইয়া হৃদয়ের ব্যথা প্রশমিত করেন।

হরসুন্দরীর বিবাহের কথা শুনিয়া রাইয়তজন ও আত্মীয় কুটুম্বেরা আসিয়া সমস্ত আয়োজন করিয়া লইল। হরসুন্দরী আর এখন ছোট হাঁড়ীতে কৃত্রিম অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া সকলকে খাওয়ান না। নিজের সখীরা খেলে, তাহাদের নিকট এক এক বার যান আবার অমনি ছুটিয়া মায়ের নিকট আসিয়া আঁচলে আঁচলে ঘুরিতে থাকেন। বাড়ী ছাড়িয়া, মা ছাড়িয়া, সখীদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে এই কথা মনে উঠিয়া এক একবার কচি মুখখানি কাল হয়, আবার বালিকা প্রকৃতি অমনি হাসি হাসি হইয়া উঠে। মাতা এক এক বার তাহারদিকে চাহেন, আর প্রথমা কন্যার কথা মনে পড়িয়া, বুক ফাটিয়া ক্রন্দন আইসে। অতি কষ্টে এ বিষ পান করিয়া চক্ষের জল নিবারণ করেন, জানেন শুভকার্য্যে চক্ষের জল ফেলাইতে নাই।

দেখিতে দেখিতে দিন চলিয়া গেল। অদ্য বাড়ী ঘর আত্মীয় কুটুম্বে পরিপূর্ণ। ২০শে মাঘ শুভকার্য্যারম্ভে ৺শ্যামা পূজা। আয়স্তিরা কন্যার গাত্রে তেল হলুদ দিলেন। নিশাতে কালীপূজা যথাবিধি সম্পন্ন হইল। নীলকণ্ঠ মণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক যোড়াসন হইয়া বসিয়া স্থিরনেত্রে মায়েরদিকে চাহিয়া গাহিতে লাগিলেন,

* দুঃখে ঝরে যে নয়ন।
কেমনে তোমায় করি আরাধন॥

* রাগিনী মুলতান—তাল একতালা।

কোথা হ'তে এসেছি কিছুই না জানি,
এ ভব পাথারে তুমি মোরে আনি,
ঘুরাচ্ছ সদায়, অনাথের প্রায়
এ ভব ভুবন ॥

দিকভ্রান্ত হ'য়ে নাবিক যেমন,
অকূল সাগরে করয়ে ভ্রমণ,
তেমনি আমরা হয়ে লক্ষ্য হারা,
হচ্ছি সদা ভ্রাম্যমান।

তাহে যবে উঠে তরঙ্গ তুফান,
শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায় গো পরাণ,
মনে মনে তাই, ভাবছি সদাই,
কেন করিলি সৃজন ॥

আহ্লাদে কি খেলা, খেল তুমি তারা,
এ খেলাতে জীবের পরাণ সারা,
দিয়ে পুত্র কন্যাগণ কিসের কারণ,
আবার করগো হরণ,

এ শোকের ব্যথা মরমে প্রবেশি,
রাখেনা রাখেনা মন আপনার বশি,
রহিয়া রহিয়া দহে সদা হিয়া,
শোক তাপ হুতাশন ॥

আত্মকৃত পাপ এই যদি ফল,
পাপ পুণ্য কিবা মোরে আগে বল,
পথ না দেখায়ে মারিতে পীড়িয়ে,
মায়ের উচিত নয়।

সবিনয়ে তাই করি নিবেদন,
সৎপথ মোরে করাও দর্শন,
চরণেতে ঠেলি যাও লয়ে চলি,
ঘুচুক এ ভব-বন্ধন॥

তৎপর কিছুকাল নিমীলিত লোচনে মৌনাবস্থায় থাকিয়া আবার গাহিতে লাগিলেন।

* তুই মা শ্যামা জীব-জননী॥
মানবের প্রতিকার্য্যে, প্রতি নিয়ত,
তুই গো তারা শুভদায়িনী॥

তাই গো আজি বড় সাধে,
পূজি তোরে ত্রিলোচনি,
মায়ের চখে চাওগো একবার,
ধরি তোমার পা দু'খানি॥

মানব কুলে জন্মেছিলি,
জানিস্ মেয়ে কি আদরের জিনিস্,

* রামপ্রসাদি সুর।

সেই কথাটা মনে রেখো,
এই যাচনা কাত্যায়নী ॥

সাধের ধনকে আমার,
পরের ঘরে দিচ্ছি ফেলি,
আবরি রে'খগো তারে,
দিয়ে তোমার পা দু'খানি ॥

দশম পরিচ্ছেদ।

যে দিবস বিদ্যা অভ্যাসের নিমিত্ত মাতুল মহাশয় কপোলে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন, ওপাড়ার ব্রাহ্মণঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ওর কিছুই হইবে না" সেই দিবস জয়চন্দ্রের হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। জয়চন্দ্র মনে করিয়াছিলেন পলায়ন করিয়া বিদেশে গমন করিবেন, যদি কোন দিন পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, উজ্জ্বল মুখে বাড়ী আসিবেন, নহিলে আর আসিবেন না। সৌভাগ্যক্রমে মাতুল মহাশয় তাহাকে বিদেশে পাঠাইয়া দিলেন বলিয়া সে পথ অনুসরণ করিতে হইল না। আমরা রীতি অনুসারে পাঠক মহাশয়দের অনুমতি লইয়া জয়চন্দ্রের বিদেশে গমন, প্রথম সহর দর্শন, ও বিদ্যা অভ্যাসের কথা এই অধ্যায়ে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

অদ্য নক্ষত্রামৃত শুভযোগ। জয়চন্দ্র বিদেশে যাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া মাতুল মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। রামশরণ বলিতে লাগিলেন, "বিদেশ বিপাকে চলিলে, খুব সাবধানে থাকিও। সহরের রাস্তার ঠিক মধ্যদিয়া হাটিও না, একধার দিয়া হাটিও। দোকানে খুব, সুন্দর সুন্দর জিনিষ সাজান দেখিতে পাইবে, তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া হাটিও না। পেটের পীড়া হইলে প্রাণান্তেও আহার করিও না। কোন জনতার মধ্যে প্রবেশ করিও না; যদিও প্রবেশ কর ফাঁক ফাঁক থাকিও। জয়চন্দ্র মাতুলকে প্রণাম করিয়া, মাতাকে প্রণাম করিতে গেলেন। তিনি একটা ত্রিপত্র হাতে দিয়া বলিলেন, "ভাল হইয়া থাকিও। এখানে যেমন অশিষ্টামি করিয়া কাল কাটাইয়াছ বিদেশে তাহা করিও না।" জয়চন্দ্র শুনিতে শুনিতে মামীকে প্রণাম করিয়া চলিতে

লাগিলেন। উমাসুন্দরী, "লক্ষেশ্বর হইয়া বাঁচিয়া থাক, তোমার সোণার দোয়াত কলম হউক। তুমি খুব সাবধানে থাকিও সদাসর্ব্বদা পত্র লিখিও" এই বলিয়া পিছনে পিছনে চলিলেন ও পাঁচটী টাকা গোপনে জয়ের হাতে দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ইহা হইতে দুই চারি আনা আমাদের বাসার নকড়ীদাদাকে দিও, সে বড় ভাল খানাসামা, তোমাকে নিতান্ত যত্ন করিয়া রাখিবে, তোমার কিছুই কষ্ট হইবে না। আর যখন যাহা খাইতে ইচ্ছা হয় তাহা কিনিয়া খাইও।" জয় টাকা পাঁচটী কাছায় বাঁধিলেন। জয়চন্দ্র লক্ষ্মণ রায় মহাশয়দের একজন সিকদারের সহিত চলিতে লাগিলেন। উমাসুন্দরী যে পর্য্যন্ত জয়কে দেখিতে পাওয়া গেল, সে পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সজল নয়নে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। উমার এই রোদের নিমিত্ত কেহ কেহ বলিতেন, "মাগির পুত্র নাই কন্যা নাই, এর এত ব্যথা কেন ?" ইহার উত্তরে হয়ত অনেক সহৃদয়া স্ত্রী বলিবেন, "জয়চন্দ্রকে উমা ছেলে-বেলা হইতে প্রতিপালন করিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার মায়া মমতা উহার উপর হইয়াছে। লোকে পশুটা পালিলে তাহার প্রতি ভালবাসা জন্মে, মায়া মমতা হয়, এত মানুষের সন্তান। জয় কোন দিন বিদেশে যায় নাই, এত দিনে বাড়ীছাড়া হইল, ক্ষুধার সময় কে খাইতে দিবে, ব্যারাম হইলে কে জলটুকু দিবে,এই চিন্তাতেই উমার চক্ষু দিয়া জল পড়িয়াছিল।" এই কারণ হইলে হইতে পারে ; কিন্তু আমরা বলি এ কর্ম্মভোগ। তাহা না হইলে নিজের সন্তান সন্ততি নাই পরের সন্তানের নিমিত্ত কেবল কষ্ট-ভাগিনী হইবেন কেন ? তাঁহার পরিণাম আশা ত কিছুই ছিল না। যাহার যতটুকু কর্ম্মভোগ আছে তাহা ভোগিতেই হইবে। এই অপরিজ্ঞেয় নিয়তিতেই তাঁহার মায়া মমতা জয়চন্দ্রের উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল। জয়চন্দ্রের "গহনার" নৌকা বৈকাল বেলায় সহরের এক সীমায় আসিয়া লাগিল। রায় মহাশয়দের বাসাটি সহরের অপর প্রান্তে, জয়চন্দ্র নিজের

মোটটি সিকদারের হাতে দিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। ফুল পুকুরে চটিজুতা যোড়া নষ্ট হবে বলিয়া হাতে করিয়াই চলিয়াছিলেন। সিকদার মানা করাতে ও পথের "কাঁকড়" পায় বিঁধে বলিয়া পায় দিয়াই ফটাফট্, ফটাফট্ শব্দ করিতে করিতে ধুলি উড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। মনে ভাবিয়াছিলেন যে এখানে বড় টোল ও বড় বড় পণ্ডিত আছে, তাঁহার একজনকে অধ্যাপক স্বীকার করিয়া নিবিষ্টমনে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন। কিন্তু সহরে আসিয়া একবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। সে গাছ নাই, সে জঙ্গল নাই, সে পগার কাটা বাড়ী নাই, যে দিকে চাহেন সেই দিকেই বহুল পরিমাণ ইষ্টক নির্ম্মিত বাড়ী, আর যেন কেমন এক রকম, না ঘর না কুঁড়ে ঘর দেখা যায়। দুই দিকেই কাতারবন্দি বসতি, বাড়ীর উঠান নাই, মধ্যে এক একটা ইষ্টক নির্ম্মিত "গোপাট," তাহার উপর দিয়া মনুষ্যগণ কিলিবিলি করিয়া যাইতেছে। বাড়ীতে একটা মহা বিপদ পড়িলে লোকে যেমন তাড়াতাড়ি যায় সেইরূপ যাইতেছে। দাড়িকাটা, গোঁপফেলান মানুষ মাত্রই দেখা যায় না। যদিও দুই এক জন দেখা যায়, তাহার আবার গা'টা একটা তাকিয়া, কি বালিস, কি প্লাশ বালিসের খোলে ঢাকা। সে উড়ানী কি গামছা কাঁধে কাহারও নাই। সে চটি জুতা নাই। কেমন যেন লাল কি শাকের রঙ্গের সম্মুখ ও পিছনের দিকে উঠান জুতা পায়। যাহাদের খালি পা, ও গামছা কাঁধে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আবার জলের কলসী কাঁধে, কি মোট মাথায়। ইহাদের আবার গোঁপ আছে। পুরুষে জল আনে দেখিয়া জয়চন্দ্র বড়ই আশ্চার্য্যান্বিত হইলেন। অনেক লোকের দাড়ি গোঁপ দেখিতে পাইয়া মুসলমান জ্ঞান করিলেন, কিন্তু মিঠন খাঁ কি রহিম সেকের মত গামছা পরিধান না দেখিয়া মনে মনে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে আপন মনে আপন ভাবের তরঙ্গ উঠাইয়া

সহরের লোক জন জিনিষ পত্র, দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলেন। সহসা "হ্যাই সামনেওয়ালা" বলিতে বলিতে জজ সাহেবের বগ্‌গীগাড়ী ঘড় ঘড় শব্দে তাঁহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। জয়চন্দ্র কিছু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"সিকদার মামা, একি ?"

সিকদার। জাননা এ জজসাহেবের গাড়ী, জজসাহেব ও তাঁহার মেম।

জয়। মেম কি মামা ? মা নাকি ?

সিকদার। দূর পাগল ! সাহেবের স্ত্রীকে মেম বলে, ইহাই জান না ?

জয়। স্ত্রী ! তা স্ত্রী পুরুষে এক সঙ্গে এ রকম ক'রে বাহির হয় !

সিকদার। এরা মানুষ নয়। দেবতা। দেবতাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষে লজ্জা নাই।

জয়। হবে ! আচ্ছা, ওরা এই গরমের দিনে ঐ বনাতের কাপড়গুলি গায় দিয়া রহিয়াছে কেন ? মেঘ নাই, রৌদ্র নাই, দুজনেই এক একটা "মাতলা" * মাথায় দিয়া যাইতেছে কেন ?

সিকদার। কে জানে বাবা, আমি তোমার এ বিটকিলে কথার উত্তর দিতে পারি না। ওরা ঐরূপ কাপড়ই পরে।

জয়। না আমি বলছিলেম কি, এ স্থানটা এত গরম যে আমি এই খালি গায়ে চলিতেছি তবু আমার শরীরটা আচ্ছন্ন করিতেছে, ওরা এ গরম কাপড়গুলি কেমনে গায় রেখেছে।

সিকদার হাঁ, বড় গরমই বটে। ওরা কেন যে এমন কাপড় পরে তাহা জানি না। তা তুমি এখন সহরে থাকিয়া সেয়ানা হইয়া উঠিবে। তোমার মুখেই কত কথা শুনিতে পাইব।

* কৃষক ও ঘরামিরা রৌদ্রের সময়ে পাতার দ্বারা নির্ম্মিত একপ্রকার মস্তকাবরণ ব্যবহার করে। ইহাকে "টোকা" নামও দেওয়া হয়।

এইরূপ আলাপ করিতে করিতে উভয়ে সহরের ঘন বসতি ছাড়িয়া একটা প্রকাণ্ড পুকুরের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থানটি বেশ নিরীবিল। পুকুরের পূর্ব্বদিকেই একখানি ছোট রকমের মাঠ। উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পাড়ে কয়েকখানা বাড়ী। কোন কোন বাড়ীতে দুই একখানি দালান আর সকলগুলিই খড়ের ঘরে পরিপূর্ণ। প্রায় সকল বাড়ীতেই দু চারিটী ফলের গাছ। কোন কোন বাড়ীর সম্মুখে সুন্দর সুন্দর ফুল বাগান; বিলাতি ও দেশি ফুলে সুশোভিত। তাহার পার্শ্বে বাদাম, ঝাউ প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ। এই স্থানে আসা মাত্রই জয়চন্দ্রের মন শীতল হইল। এমন সুরম্যস্থান আর তিনি জীবনে দেখেন নাই। সিকদার মামা বলিলেন "ঐ যে একতালা দালান দেখা যায়, ঐটীই রায় মহাশয়দের বাসাবাড়ী " শুনামাত্রই মনের মধ্যে যেন কেমন একটা ভাব উঠিয়া জয়চন্দ্রের বুকটা ধড় ফড় করিয়া উঠিল। আমরা ফিজিয়লজি জানি না বলিয়া জয়চন্দ্রের অভ্যন্তরের যে কোন্ যন্ত্রের কিরূপ কার্য্য হইয়াছিল তাহা ভাল করিয়া পাঠকগণের নিকট প্রকাশ করিতে পারিলাম না। এই কারণে আর একবার অজ্ঞ লোকের ন্যায় বলিতেছি, মৌখিক পরীক্ষা দেওয়ার সময় পরীক্ষকের নিকট যাইতে বুকটা যেমন করে; কোন কাঁচা খোকা ম্যাজিষ্ট্রেট, কি কমিসনার সাহেবের নিকট যেতে বুকটা যেমন করে; বিদেশ বিপাকে কোন রাজড়ার বাড়ী প্রবেশ করিতে বুকটা যেমন করে; জয়চন্দ্রের বুকটা সেইরূপ করিতে লাগিল। জয়চন্দ্র বলিলেন, "এই ঘাটে হাত পা ধুয়ে যেতে চাই।" সিকদার বলিল, "তামাকটা খাই নাই, আচ্ছা আমি দাঁড়ালেম, তুমি বেশ ক'রে হাত পা ধুয়ে এস।" এই বলিয়া গামছাখানা তাহার হাতে দিয়া বলিল, "আগে কাছাটা ঝেড়ে ফেল। চটি জুতার ধুল কাছায় লাগিয়াছে।" জয়চন্দ্র কাছা ঝাড়িয়া বেশ ক'রে হাত পা ধুয়ে সিকদার মামার পিছনে পিছনে আস্তে আস্তে চলিতে

লাগিলেন। ফুলবাগান পার হইয়াই আটচালা ঘরে প্রবেশ করিলেন। যুগল রায় মহাশয় তখন কাছারি হইতে আসিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালণ করতঃ কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে, তাকিয়াতে ঠেশ দিয়া বসিয়া, প্রকাণ্ড আলবোলাতে মসলাদার তামাকের ধুমপান করিতে করিতে সমস্ত ঘরে সুগন্ধ ছড়াইতেছিলেন। মেজাজ খুব খোস। সিকদারকে দেখা মাত্রেই বলিলেন, "কিহে দয়াল, কখন এলে?" দয়াল যোড়হাত করিয়া ঘাড় নোয়াইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আজ্ঞা এই এলেম।" এই বলিয়া দু'খানা পত্র রায় মহাশয়ের নিকট ফেলিয়া দিল। রায় মহাশয় পত্র দু'খানা হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীর মঙ্গল ত? দাদা কেমন আছেন? তোমার ছেলে পিলে ভাল আছে ত?" দয়াল বলিল, "আজ্ঞা বাড়ীর সকলই মঙ্গল, তবে বড় কর্ত্তার শোকের পর হইতেই শরীরটা কাহিল হইয়া যাইতেছে। আপনার নফরেরা ভাল আছে।" যুগল রায় মহাশয় দাদার শরীরের অবস্থা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্রখানা খুলিতে খুলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ছেলেটী কে?" দয়াল বলিল, "আজ্ঞে, ইনি উমা ঠাকুরাণীর ভাগিনা।" "হাঁ বটে, সেনাটীর কুলীনের সন্তান। আচ্ছা বাবা ব'স।" জয়চন্দ্রের কাছার ধুলা এখনও যায় নাই, একবার কাছার দিকে চাহিয়া বসিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহাতে রায় মহাশয় একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "চটিজুতা পায় দিলে ধুলা কাছায় লেগে থাকে, ও জুতা আর পায় না দিলেই হবে।" জয়চন্দ্র আশ্বস্ত হইয়া বিছানার এক কোণে বসিয়া পড়িলেন। কর্ত্তার পত্র দু'খানা পড়া শেষ হইয়াছে। এমন সময় কমল রায় মহাশয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দয়ালকে দেখিয়া বলিলেন, "কি হে ভাল আছ ত?" যুগলচন্দ্র বলিলেন, "দাদার পত্র আসিয়াছে। বাড়ীর সকলেই ভাল আছেন, ইহাতে আর বিশেষ কোন

কথা নাই, কেবল এই ছেলেটির কথাই লিখিয়াছেন। এ উমার ভাগিনা, কুলীনসন্তান। দেখ উমা কত মাথার দিবিব দিয়ে, এ বালকটির নিমিত্ত কত কি লিখিয়াছে। মায়ের আমার মনটা দয়াতে পূর্ণ। দেখ, পরের ছেলের নিমিত্ত কত মমতা। এ মন্দ নয়, এ আবশ্যে তাহার জীবনটা কাটিয়া গেলে ভালই। শোকের ভারটা ইহাতে অনেক হাল্‌কা হবে।” এই বলিয়া মান মনে পত্র দু’খানা কমল রায় মহাশয়ের হাতে দিলেন। তিনি পড়িতে লাগিলেন। যুগল বলিতে লাগিলেন, “দাদা ইহাকে মানুষ করিয়া দিতে লিখিয়াছেন। এখন বাঙ্গলা লেখা পড়ার বিশেষ আদর নাই। কালে একেবারেই থাকিবে না। ইহাকে ইংরেজী পড়াইতে পারিলে ভাল হয়।” কমল বলিলেন, “একটু বয়স হয়েছে, কলেজের বড় সাহেব ইহাকে ভর্ত্তি করিবে না। বাঙ্গলা লেখাপড়া শিক্ষা করুক, প্রথম নকল নবিশী দিয়া পরে মোহরেরগিরি দিতে পারিবেন।” যুগল রায় মহাশয় “আচ্ছা দেখা যাউক” বলিয়া দীনেশ, গণেশ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। দুই ভ্রাতাই “আজ্ঞা যাই” বলিয়া দৌড়িয়া আসিল। আসিয়া মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বিনা আদেশে বসিবার ক্ষমতা নাই। যুগল রায় বলিলেন, “এই ছেলেটার থাকার স্থান তোমাদের ঘরে করিয়া দাও। আর দেখ ইহাকে কলেজে ভর্ত্তি করিতে পার কি না। বয়স কিছু বেশী দেখা যায়। যদি অসম্ভব বোধ কর আমাকে বলিও, আমি জজসাহেব দ্বারা সুপারিস করাইয়া ভর্ত্তি করিয়া দিব। এ মধ্যাহ্নে বোধ হয় ভাল করিয়া খায় নাই, কিছু জলখাবার যোগাড় করিয়া দাও। নকড়ী গেল কোথায়? এ এইমাত্র পাড়াগাঁ হইতে আসিয়াছে, ইহাকে দেখাইয়া শুনাইয়া শিক্ষা দিয়া নিও। দুই ভাইয়েই “যে আজ্ঞা” বলিয় জয়চন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় জয়চন্দ্রের মাথায় টিকিটি দেখিয়া একে অন্যের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। জয়চন্দ্র

নিতান্ত চতুর ছেলে, এটি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "এতে আপনারা হাসেন কেন? আমার ঘুম বড় বেশী, যদি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়ি, তাহা হইলে আপনারা সহজেই এই টিকি ধরিয়া টানিয়া জাগাইতে পারিবেন, তাহাতে আপনাদেরও সুবিধা হইবে, আমারও উপকার হইবে।" এই কথা শুনা মাত্র দুইজনেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ও ভাবিলেন এ ছেলেটি দেখি বিলক্ষণ চতুর ও কৌতুকী। জয়চন্দ্র এই একটা কথা বলিয়াই দীনেশ ও গণেশের হৃদয়ে ভালবাসার মূল সংস্থাপন করিলেন। কালে এই মূল হইতে বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়া তাহাদের হৃদয় ছাইয়া পড়িল। কথা একটি অপূর্ব্ব শক্তি। কথাতে ধন যায়, মান যায়, ভালবাসা যায়, প্রাণ যায়; কথাতে ধন বাড়ে, মান বাড়ে, ভালবাসা বাড়ে, প্রাণ বাঁচে কেবল বলিবার প্রণালীতে মাত্র। তিন জনে হাসিতে হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। জয়চন্দ্র গণেশ বাবুকে বলিলেন, "আমি সংস্কৃত পড়িতে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছি। এখানে কোন চৌপাড়ি নাই?" গণেশ হাসিয়া বলিলেন, "শুধু সংস্কৃত পড়িয়া কি হবে? কবিরাজি করা অসভ্যতা। ইংরেজী পড়িলে ডাক্তার হওয়া যায়, অতএব ইংরেজী পড়াই উচিত। এখানে কোন চৌপাড়ি নাই। ওসব অসভ্যতা পাড়াগাঁয়ে, সহরে নয়।" পাঠক মহাশয় বোধ হয় জানেন যে দীনেশ ও গণেশ এখন জুনিয়ার পাঠ্য পড়িতেছেন। তাঁহারা সিটিজন্ অব্ দি ওয়ারল্ড, ডেজার্টেড্ ভিলেজ, ট্রাবেলার, মারেজগ্রামার, হিষ্টরি অব গ্রিস এণ্ড রোম প্রভৃতি ইংরেজী স্কুলপাঠ্য পুস্তক পড়িয়া বাবু হইয়াছেন। উভয়েই মাঝে মাঝে সাহেবদের কুঠিতে যাইয়া তাঁহাদের রীতি নীতি শিক্ষা করিয়া আইসেন। পাদরি সাহেব বড় ভদ্রলোক। ভালবাসাই তাঁহার জীবনের আদর্শ। মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট গিয়া বাইবেলের গুঢ়তত্ত্ব, কাষ্ট্ সিষ্টেম ও আইডল ওয়ারসিপের অপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা স্থির নেত্রে হা

করিয়া শুনিয়া আসিয়া থাকেন। আসিবার সময় সাহেব বলেন, * "my dear Denes and Ganes Babu, good day, I will be very happy to see you every now and then, both of you are very sensible lads." বাবুদ্বয় "থ্যাঙ্ক ইউ সার" বলিয়া চলিয়া আইসেন। জয়চন্দ্র যখন শুনিলেন সহরে টোল নাই তখন আর কি করেন, অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আপনাদের যে ইচ্ছা সেই মতেই চলিব। ইংরেজীই পড়িব। শুনেছি স্কুলে পড়িতে নাকি অনেক টাকার প্রয়োজন, আমি কোথায় এত টাকা পাইব। আমার এক মামা মাত্র ভরসা, তিনি কবিরাজি করিয়া খান, এত টাকা যোগাইতে পারিবেন না।" দীনেশ বলিলেন, "আচ্ছা সেকথা তোমার ভাবিতে হবে না, আমাদের ভাত কত কত শেয়াল কুকুরে খায়, আমাদের টাকাতে কত জনের শ্রাদ্ধ হয়, তুমি ত সম্পর্কিত লোক, তাতে আবার স্কুলে পড়িবে, এত সৎকার্য্যই। তোমার দশ পাঁচ টাকা লাগিবে ইহাতে আর ভাবনা কি? আর আমি শুনেছি জেঠা মহাশয় নাকি দিদীকে গোপনে কতকগুলি টাকা দিয়াছেন, ইচ্ছা করিলে তিনিও তোমার সাহায্য করিতে পারিবেন। তা যা হউক, তোমার খরচ বাবাই চালাইবেন; তিনিই ত ইংরেজী পড়ার কথা এইমাত্র বলিয়াছেন।" গণেশ বাবু বলিলেন, "তোমার ভাই টিকিটি কাটিতে হইবে। গায়ে পিরাণ দিতে হইবে। চটি ছাড়িয়া ইংরেজী জুতা পায় দিতে হইবে। সভ্য হওয়া চাই। অসভ্যের মত চলিলে হবে না।" জয়চন্দ্র বলিলেন, "তা আপনাদের যা ইচ্ছা, আমি আপনাদের অবাধ্য নই।" এই কথা শুনামাত্র গণেশ বাক্স হইতে কাঁচি বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ টিকিটি কাটিয়া হাতের উপর ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, "what

* প্রিয় দীনেশ ও গণেশ বাবু, তোমরা আমার সহিত মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে খুব সুখী হইব। তোমরা দুজনেই বেশ বুদ্ধিমান ছেলে।

a barbarous fashion! man is not a black horse that he should have a mane." * দীনেশ বাবু তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিয়া একটা পিরাণ বাহির করিলেন, এবং জয়চন্দ্রের হাতে দিয়া বলিলেন, "গায় দেও।" কেমনে যে গায় দিতে হয় জয়চন্দ্র তাহা না জানাতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। গণেশ বাবু বুঝিতে পারিয়া, পিরাণটি পরাইয়া দিলেন। দেওয়ার সময় গায় হাত লাগাতে বলিলেন, "this savage fellow uses oil!" † তুমি ভাই আর গায় তেল দিও না, উহাতে কাপড় ময়লা হয়। দাদা, দেখেছ, how nicely this has fitted him; ‡ এখন এক জোড়া জুতা হইলেই হয়, এই বলিয়া তাহার আটপ'রে জুতা জোড়া জয়চন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া পায় দিতে বলিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এটীও সুন্দর মত লাগিয়া গেল দেখিয়া, গণেশ বাবু বলিতে লাগিলেন, "দাদা, he looks like a perfect gentleman now"। § এইরূপে জয়চন্দ্রের অভিষেক হইয়া গেল।

জয়চন্দ্র ইংরেজী মাসের শেষভাগে সহরে আসিয়াছিলেন, সুতরাং পাঁচ ছয় দিন বাসায় বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। দিনের বেলা দীনেশ ও গণেশ বাবু কালেজে যান, জয়চন্দ্র একাকী বাসায় বসিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের পাক, একহাতা দাল, একথণ্ড মাছ, তাহাও আবার কোন দিন পান, কোন দিন চাকর ও ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রে পান না। পেটের ক্ষুধা পেটেই মজিয়া যায়। কেবল বাড়ী হইতে আসিয়াছেন, মনটা উদাস উদাস করে, সকলের কথা, গোপাল ও মামীর কথা মনে পড়িয়া চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া জল পড়ে। বিকাল বেলা দীনেশ ও গণেশ বাবু কালেজ

* "কি অসভ্য প্রথা! মানুষ ত আর কালঘোড়া নয় যে তার ঝুঁটি থাকবে।"
† "এ অসভ্যটা আবার গায় তেল দেয়।"
‡ "কেমন সুন্দর মানায়েছে।"
§ "এখন ঠিক একটী ভদ্রলোকের মত দেখাচ্ছে।"

হইতে আসিলে, তাঁহাদের সঙ্গে সহরে বেড়াইতে যান, মনটা ভাল বোধ হয়। ইংরেজী জুতা পায় দেওয়াতে ফোস্‌কা পড়িয়াছে, হাটিতে নিতান্ত কষ্ট বোধ হয়। পিরাণ গায় দেওয়ার অভ্যাস নাই, শরীরটা ছট্ ফট্ করে। এইরূপে পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গেল।

আজ ইংরেজী মাসের প্রথম তারিখ, জয়চন্দ্র স্কুলে ভর্ত্তি হ'বেন। দীনেশ বাবু একজন নাপিত ডাকাইয়া, জয়চন্দ্রের গোঁপের রেখাটা উঠাইয়া ফেলিলেন। নাপিত বলিল, "বাবু, আমরা প্রথম গোঁপ ও দাড়ী কাটবার দিন একখানি নূতন কাপড় পাইয়া থাকি।" শুনা মাত্র গণেশ চক্ষু লাল করিয়া "কাপড় কিরে বেটা? এই তোর পয়সা নে" বলিয়া একটা পয়সা ফেলিয়া দিলেন। নাপিত কুড়াইয়া লইয়া, "বাবা এ যে সাহেবি মেজাজ! রঙটা ত দেখি ঠিক আমার বিলাতী ক্ষুরের বাঁটের মত, তা হলে কি হবে, তেজ আছে" স্বগতঃ বলিতে বলিতে যুগল রায় মহাশয়ের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। রায় মহাশয় তাহাকে দেখা মাত্রই বলিলেন, "কিহে রঘুনাথ।" রঘুনাথ বলিল, "আজ্ঞে আপনাকে ক্ষৌরি করিতে এসেছি।" "আচ্ছা এস।" রঘুনাথ দিল্লী লাহোরের গল্প করিতে করিতে ক্ষৌরি করিতে লাগিল।

গণেশ বাবু জয়চন্দ্রকে বলিলেন, "আজ সাহেব ভর্ত্তি হওয়ার সময়, তোমার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিও ১৩ বৎসর। তোমার কোন ভয় নাই আমি কাছে থাকিব। যদি সন্দেহ করে, আমি তোমার কুষ্ঠির কথা বলিব।" গণেশ বাবু বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়াই জয়চন্দ্রকে ভর্ত্তি করিবার নিমিত্ত সাহেবের নিকট লইয়া গেলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়ঃক্রম কট আছে?" জয় নির্ভীকচিত্তে উত্তর করিল, "আজ্ঞা তের বৎসর।" সাহেব মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কি বলিলে আজ্ঞা।" গণেশ বাবু অমনি বলিয়া উঠিলেন, thirteen

years sir. সাহেব আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া নাম লিখিয়া ফেলিলেন। গণেশ বাবু জয়কে বলিলেন, "তুমি ভাই আর অসভ্যের মত 'আজ্ঞা' বলিও না। সাহেবদের কাছে আজ্ঞা পরাজ্ঞা খাটে না।"

জয়চন্দ্র কয়েক দিন বোকার মত ক্লাশে বসিয়া বাগয়া গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ১০।১২ দিনের মধ্যে দশ জনের মধ্যে একজন হইয়া দাঁড়াইলেন। ক্রমে সকলের নেতা হইয়া উঠিলেন। এইরূপে প্রায় বৎসর অতীত হইয়াছে, কঠিন পরিশ্রম সহকারে লেখাপড়া করাতে শ্রেণীতে প্রথম হইয়া ডবল প্রমোশন পাইয়া নিতান্ত উৎসাহের সহিত লেখাপড়া করিতেছেন। এমন সময় সিকদার মামার সহিত উমাসুন্দরীর পত্র আসিল। সিকদার মামা জয়চন্দ্রের রূপান্তর দেখিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন। জয়চন্দ্র পত্র পড়িয়া দেখিলেন যে, পত্রখানা মামীর জবানী। ২১শে মাঘ মেঝো মামার বিবাহ হবে, তাঁহাকে নিতান্ত অনুরোধ করিয়া বাড়ী যাওয়ার নিমিত্ত লেখা হইয়াছে। এবং পূজার সময় বাড়ী যান নাই বলিয়া তিনি বড় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, যাওয়ার আশাতে খাবার নিমিত্ত কত কি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাও সবিস্তারে লিখিয়াছেন। পত্রখানা পড়িয়া দীনেশ বাবুর হাতে দিলেন তিনি পড়িয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। গণেশ পড়িয়া বলিলেন, "you should not go. পাড়াগেঁয়ে অসভ্য লোক হইতে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল।" দীনেশ বলিলেন, "নাহে নিষেধ করিও না, এ কুলীনের ছেলে, বাবা যদি শুনেন যে আমাদের পরামর্শে জয় বিবাহে গেল না, তাহা হইলে শক্ত বিপদ হইবে। গণেশ বাবু আর বাক্য ব্যয় করিলেন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জয়চন্দ্র "urgent business" বলিয়া, আরজি লিখিয়া দীনেশ বাবুর নিকট রাখিয়া, অতি প্রত্যূষে গহনার নৌকায় বাড়ী রওনা হইলেন। বাড়ী যাইতে প্রায় এক দিন লাগে, দিন আর যেতে চায় না পথ আর এগোয় না, এই ভাবে নিতান্ত ব্যগ্রতার সহিত কাল কাটাইতে লাগিলেন। বিকালবেলা ৩।৪ মাইল দূর হইতে ভবদ্বীপের নদীর ধারের বটগাছ দেখা যাইতে লাগিল। এমন মিঠা গাছ আর তিনি জীবনে দেখেন নাই। ইহার প্রতি পাতাই যেন মধুমাখা, জয়চন্দ্রের মনে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে নৌকা ঘাটে লাগিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে জয়চন্দ্র পায় জুতা, গায়ে পিরাণ, কাঁধে চাদর হাতে ছড়ি, মাথায় তেড়িকাটা জয়চন্দ্র বাবু হইয়া বাড়ী অভিমুখে দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন। জয়চন্দ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীমুখি যাইতেছেন। রাস্তা যেন আর ফুরাইতে চায় না। এইরূপ করিতে করিতে সূর্য্য অস্ত যায় যায়, এমন সময়ে গ্রামের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পশ্চিম দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একখানি ছোট রকমের মেঘের ভিতর দিয়া যাটা প্রায় ছোঁ ছোঁ করিয়া সূর্য্যদেব এক খানা আগুণে-পুড়িয়া-লাল-করাণ-পেটা-ঘড়ীর আকার ধরিয়া সুদূরে পাতালমুখি ডুবিয়া গেলেন। রক্তমাখা কাপড়-খানা জলে ডুবাইলে যেমন রক্তগুলি জলে ভাসিয়া ভাসিয়া কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত রঞ্জিত করিয়া ফেলে, মেঘখানি সেইরূপ রঞ্জিত হইল। ক্রমে ছড়াইতে ছড়াইতে পাতলা হইয়া, সমস্ত পশ্চিম দিকটা সিন্দুরে লেপিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে খণ্ড খণ্ড হইয়া কোন খানা হরিৎ, কোন-খানা পীত, কোনখানা ধূসরবর্ণ হইয়া এখানে সেখানে ভাসিতে লাগিল। ক্রমে দীপ্তিহীন হইয়া অন্ধকারের অতল সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। নক্ষত্র

সকল ক্রমে সগ্য প্রসূত শিশু সন্তানের ন্যায় মিট মিট করিয়া চাহিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয় কি মনে করেন যে, জয়চন্দ্রের মনে এই দৃশ্য দেখিয়া, এইরূপ ভাব হইয়াছিল যে, ঐরূপ এজগতে কেহ কেহ সেই মহান, অনন্ত, অব্যক্ত, একমাত্র সত্ত্বা হইতে তেজোরাশি আকর্ষণ করিয়া লইয়া মানব হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া, আলোকে পূর্ণ করেন। ক্রমে প্রখরতা লাভ করিয়া কূপ ও গুহা পর্য্যন্ত আলোকিত করেন। অন্ধকার আর দেখা যায় না। কেবল পূতিগন্ধপূর্ণ গলি, নরদামা, ও ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির আবাসভূমিতে নিতান্ত নিস্তেজ ভাবে লুকায়িত থাকে। কিন্তু চিরদিন কাহারও সমান যায় না, ক্রমে জ্যোতিঃ নিস্তেজ হইতে থাকে, অন্ধকারের অধিকার বাড়িতে থাকে, মহাত্মা কালের অতল সমুদ্রে ডুবিয়া যান। যাওয়ার সময়ও নিজ জ্যোতিঃ দেখাইতে দেখাইতে যান। ডুবিয়া গেলেও কিছু রাখিয়া যান। অনুচরেরা এই প্রক্ষেপিত আলো লইয়া নানা রঙ্গে মানব মনকে রঞ্জিত করিতে চাহেন,—চাহেন বটে, কিন্তু আঁধার আসিয়া সব এক করিয়া ফেলে। কিছুই উচা নীচা রাখে না। সব একাকার করিয়া তুলে। এড়ণ্ড গাছ বড় না অশ্বত্থ গাছ বড় তাহা ঠিক করা যায় না। সব বেশ স্বাধীন হইয়া যায়। কত কত প্রবীণ ও চিন্তাশীল আত্মা পালে পালে নক্ষত্রের ন্যায় মিন্ মিন্ করিতে থাকেন। কেহ কেহ বা চাঁদের সুধাময় আলো ঢালিবার নিমিত্ত ক্রমে ঘাড় তোলা দিয়া উঠেন; কিন্তু তাঁহাদের ঘাড়তোলা দিয়া থাকিবার ক্ষমতা থাকে না। ক্রমে ক্ষয় পাইতে পাইতে আঁধারে ডুবিয়া যান। তখন আবার তারা-গুলির বড় বৃদ্ধি দেখা যায়, গগন ব্যাপিয়া মিন্ মিন্ করিতে থাকে। আমরা বলিতেছি জয়চন্দ্রের বালক মনে এরূপ ভাব উদয় হয় নাই; কারণ তিনি সপ্তদশ বর্ষীয় বালক মাত্র। তাহাতে আবার মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে নিরাকার, নির্ব্বিকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর চিন্তার অভ্যাস করার

সময় তখনও তাহার হয় নাই। হয়ত লক্ষ্মণ রায় মহাশয়ের উদাসীন ভ্রাতা রামেশ্বর সেতুবন্ধ কি আদিনাথ তীর্থের সমুদ উপকূলে স্থিরনেত্রে একাসনে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন। জয়চন্দ্র ভাবিতেছিলেন, "বাবা বেঁচেছি, রাত্রি হইলে মাঠ দিয়া আসিতে বড় মুস্কিল হইত। শুনেছি এই মাঠের মধ্যদিয়া নাকি সন্ধ্যার পরই ভূত প্রেতগণ আগুন জালিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়।" তাহার এখনও বুকটা ধড় ফড় করিতেছিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর পুকুরের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনটা পাতলা হইল। বাড়ী আসিয়াছেন, মনটা পুলকে নাচিয়া উঠিল। যাহা দেখেন তাহাতেই আনন্দ বাড়িতে লাগিল। চলিতে চলিতে বাহির বাড়ীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন বাড়ীঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াছে, উঠানের উপর প্রকাণ্ড সামিয়ানা ঝুলিতেছে। বাড়ীঘর লোকজনে পরিপূর্ণ। এ ঘরে সানাইদারদের মধ্যে কেহ সানাইতে ফুদিয়া কাঁ্যা কাঁ্যা কাঁ্যা করিয়া সুর দুরস্ত করিতেছে; ও ঘরে কোন ঢুলি ঢোলের বামাতে সজোরে চপেটাঘাত করিয়া কাটীখানা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া, মুষ্টির নীচভাগ দ্বারা বামার চর্ম্মে শতাধিক বৃত্ত অঙ্কিত করিতেছে। আর এক এক বার 'তের কেটী তা' 'তের কেটী ধা' বোল মুখে ও ঢোলে এক সময়েই উঠাইতেছে। গোপালচন্দ্র নিতান্ত একাগ্রতার সহিত এই সমস্ত অমানুষিক বাদ্য চাতুর্য্যের কাজ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। সহসা জয়চন্দ্রকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, "মামা আসিয়াছে" (গোপাল উমার আদেশমত জয়কে মামা বলিয়াই ডাকিত) বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া, জয়চন্দ্রকে জড়িয়া ধরিল। জয়চন্দ্র, "মামা না, বাবা" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিলেন। উঠানের সামিয়ানার নীচ দিয়া সোজাসোজি উমাসুন্দরীর গৃহের বারেণ্ডায় জুতা যোড়া রাখিয়া মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উমাসুন্দরী তখন ৺শ্যামা পূজার পুষ্পপাত্র গন্ধ পুষ্পদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া,

নিবিষ্টমনে দুর্ব্বার দলগুলি বাছিতেছিলেন, জয়চন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি চাকতের ন্যায় দেখিলেন জয় প্রণাম করিতেছে, অমনি "ষাইট আমার গোপাল এসেছ, লক্ষেশ্বর হ'য়ে বেঁচে থাক" এই বলিয়া দুর্ব্বার দলক'টী জয়চন্দ্রের মাথায় স্থাপন করিলেন। "আমি তোমার নিমিত্ত পথপানে চাহিয়া রহিয়াছি। এ দু'রাত আমার ঘুম হয় নাই। তুমি পূজায় বাড়ী এস নাই কেন? উহাতে আমরা বড়ই ব্যথা পাইয়াছি।" এই রূপে কত কথা, কত কি খাবার প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার কথা নিমিষ মধ্যে বলিয়া মন খোলাসা করিয়া ফেলিলেন। জয়চন্দ্রের মাথার দিকে তাঁহার এখন দৃষ্টি পড়িল। তেড়িকাটা দেখিয়া মনে একটু ভয় হইল। নিতান্ত মিঠামুখে বলিতে লাগিলেন, "বাবা, মাথায় তেড়ি কাটিয়াছ। আচ্ছা, ভালই ত দেখায়। তা তুমি বাবার নিকট যাওয়ার সময় তেড়িটা ভাঙ্গিয়া যেও, তিনি উহা দেখিতে পারেন না। দেখিলেই হাড়ে চটিয়া উঠেন।" জয়চন্দ্র শুনামাত্রই নিতান্ত লজ্জা পাইয়া তেড়িটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "মা, পিরাণটি খুলিয়া ফেলিব কি?" উমাসুন্দরী বলিলেন, "না তিনি, পিরাণ দেখে চটিবেন না, কাটা কাপড় তিনিও ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার গায়ও এখন একটা বানিয়ান দেখিতে পাইবে।" জয়চন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা মা, আমি তেড়িটি ভাঙ্গিয়াছি, এখন ঠিক্ করে বল দেখি আমাকে তোমার বাবার মত দেখায় না?" উমাসুন্দরীর মাতা তখন পার্শ্বে থাকিয়া হৃষ্টচিত্তে ইহাঁদের দুজনের প্রেম মাখা কথাগুলি শুনিতেছিলেন। তিনি এই কথা শুনামাত্র বলিলেন, "পোড়ার মুখ তা নয়, টিকি নাই, তাঁর গোলামের মত দেখায় যে।" উমার তখন চৈতন্য হইল, তিনি বলিলেন জয়, "ইনি আমার মা শীগ্‌গির প্রণাম কর।" জয়চন্দ্র বলিলেন, "তা যখন গণেশ মামা আমার টিকিটা জোর্ ক'রে কেটে দেন তখনই ভেবেছিলাম;

আচ্ছা এখন টিকি রাখিলে হবে না”—বলিয়া চরণে প্রণাম করিলেন। উমাসুন্দরীর মাতা ‘গোলামের কথা শুন’ এই বলিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া হাসিতে হাসিতে মিঠা হাতে একটা মিঠা কাণডলা দিলেন। জয়চন্দ্র হাসিতে হাসিতে মাতার ঘরে প্রবেশ করিলেন। অন্নদা তখন জিনিশ পত্রের সিজিল মিছিলে বড় ব্যস্ত ছিলেন, পুত্রকে দেখিয়া সম্মুখে আসিলেন। জয়চন্দ্র প্রণাম করিলেন। যাহা আশীর্ব্বাদ করা তাহা মনে মনেই করিয়া বলিলেন, “বাড়ীর আর আর সকলকে প্রণাম কর গিয়ে। আর দেখ, তুমি স্কুলে পড়, শুনেছি স্কুলে পড়িলে নাকি ছেলে-পিলে বড় ব্যাদব হয়। কোনরূপ ব্যাদবী করিও না, তাঁলৈ মহাশয়দের সহিত আদব কায়েদায় কথা কহিও।” জয়চন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া উমা-সুন্দরীর ঘরে পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “দিদি মা, দাদা মহাশয় কোথায়?” তিনি বলিলেন, “কোষা-কুষির শব্দ শুনছ না? তিনি ঐ পূবের ঘরে সন্ধ্যা পড়িতেছেন, এখনই বাহির হবেন।” জয়চন্দ্র বলিলেন, “আচ্ছা, আমি এখন ঐ ঘরের দুয়ারে গিয়া দাঁড়াই, যখন বাহির হবেন তখন খাঁ করে মাথাটা পায় ছোঁওয়াইয়া ছুটে আপনারি কাছে এসে পড়িব। তা হলে তার তিনি আমায় কিছু করিতে পারিবেন না। তাঁহার কাণের ভয় আছে।” উমাসুন্দরীর মাতা বলিলেন, “আগে তোমার কাণ বাঁচিলে ত?” এইরূপ রঙ্গ তামাসা চলিতেছে, এমন সময় পূবের ঘর হইতে গম্ভীর স্বরে “কাৰ্ণী কুলাও” শব্দ হইল। উমাসুন্দরীর মাতা বলিলেন, “জয়, যাও উনি এখনই বাহির হবেন।” শুনা মাত্র জয়চন্দ্র দ্বারের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় ঘর হইতে বাহির হইলে, তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। তিনি বলিলেন, “কি হে শালা বাবু, এসেছ?” এই বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাহির বাড়ীর মুখি চলিলেন, এবং বাসার মঙ্গলামঙ্গল খুদেকুদে

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনেক কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা জয়, ঠিক করিয়া বল ত, আমি শুনেছি দীনেশ ও গণেশ গির্জায় গিয়া সাহেবদের সঙ্গে নমাজ পড়ে, এ কথা সত্য, কি মিথ্যা।" জয়চন্দ্র বলিলেন, "আজ্ঞা আমি কখনও তাঁহাদিগকে গির্জায় যেতে দেখি নাই।" "তবে কি দেখেছ।" আমি দেখেছি তাঁহারা দুই ভাইয়েই মাঝে মাঝে পাদরি সাহেবের ঘরে গিয়া থাকেন। তা তাঁহারা সহরস্থ সকল সাহেবের ঘরে গিয়াই দেখা শুনা করিয়া আইসেন।" জয়চন্দ্র যে ভাবে কথাগুলি বলিল তাহাতে তিনি জানিলেন যে এ একটি কথাও মিথ্যা বলে নাই। পাদরি সাহেবের ঘরে যাওয়ার কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে একটি বিষম আঘাত লাগিল। মুখখানা কাল হইয়া উঠিল। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তুমি গরীবের ছেলে, পাদরি সাহেবের ঘরে যেও না, উহাতে পরিণামে অশুভ বই শুভ হইবে না। চৌদ্দপুরুষ নরকগামী হইবে। উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এই কথাটি যেন চিরকাল মনে থাকে। আমার কোন ভাবনা নাই, আমি ত চলিলাম। বেশী দিন নাই।" এই বলিয়া আবার মুখখানা হাসি খুসী করিয়া বলিলেন, "তুমি গহনার নৌকায় আসিয়াছ তোমার ভাল করিয়া খাওয়া হয় নাই, এখন উমার নিকট গিয়া কিছু খেয়ে এস। সাবধান ওঘরে আমার একটা মাণিক আছে। ওটা আমি অনেকদিন বড় যত্ন করিয়া রাখিয়াছি, তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়া চুরি ক'রো না।" জয়চন্দ্র হাসিতে হাসিতে অতি মৃদু মধুর স্বরে ঘাড় নোয়াইয়া বলিলেন, "আপনি কি জানেন না যে, আমি গরীব? কাঙ্গালে মাণিক পেলে কি আর ছাড়ে?" রায় মহাশয় "শালার ছোট মুখে বড় কথা"—বলিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণীর মত একটি মিঠা রকমের নাকমলা দিয়া হাসিতে হাসিতে বাহিরবাটীতে প্রবেশ করিয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। ক্রমে স্মৃতিরত্ন মহাশয়, চক্রবর্ত্তী

মহাশয় প্রভৃতি ভদ্রলোকগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রায় মহাশয় সকলকেই যথাযোগ্য অভিবাদন করিতে লাগিলেন।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন, "সেনপাড়ায় চৌধুরীরা বিবাহ আদি কার্য্যে বড় গণ্ডগোল করিয়া থাকে। আপনি যখন আছেন, তখন সামাজিক কোন বিষয়ে ভাবনা নাই। তবে বরের গ্রামে প্রবেশ করার সময় কতকগুলি লাঠিয়াল দ্বারা নানারূপ উৎপাৎ করে ও কখন কখন বা ভদ্রলোকদিগকে অপমান করিয়া থাকে। এমত অবস্থায় লাঠিয়াল কয়েক জন নিয়ে যেতে পারিলে ভাল হইত। লোকজন, সামিয়ানা প্রভৃতি আসবাব সকলই ত আপনি নিজ বাড়ী হইতে আনিয়াছেন, দুই এক জন পাইক সর্দ্দার বইত আর লাঠিয়াল দেখিতেছি না।" ইহাতে লক্ষ্মণ রায় মহাশয় বলিলেন, "বেশী প্রয়োজন দেখিতেছি না। নীলকণ্ঠ সেন মহাশয় নিতান্ত বুদ্ধিমান ও ধীর প্রকৃতির লোক, তাঁহাদ্বারা কোন উদ্বেগের আশঙ্কা নাই। তবে শুনেছি চৌধুরীদের কেহ কেহ নাকি বাড়ীতে আছেন, তাঁহারা কিছু গণ্ডগোল করিতে পারেন। তাহাতে ভাবনা কি, আমি ৪০।৫০ জন লাঠিয়াল আমার অধিকার হইতে কল্য মধ্যাহ্নে এখানে উপস্থিত হওয়ার নিমিত্ত নায়েবকে বলিয়া আসিয়াছি। তাহারা ত আসিবে, এখন বেশী না আসিলে হয়।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "না হবে কেন? রায় মহাশয়ের মত এমন বিচক্ষণ ক'জন লোক আছে, কয়জন এমন দশদিক দেখিয়া কাজ করিতে পারে?" এইরূপে বর যাত্রীর সহিত কতটী লোক যাবে, কতটা মশাল যাবে, কত রকমের বাজী যাবে, কি কি বিছানা ও কি কি আসবাব নেওয়া কর্ত্তব্য ইত্যাদি সমস্ত বিষয় তর্ক বিতর্ক হইয়া মীমাংসা হইল। ৺শ্যামা পূজা যথারীতি সম্পন্ন হইল। রাত্রি প্রভাত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অদ্য রামশরণের বিবাহ। এ সাধারণ অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের বিবাহ, ইহাতে কোন বিশেষত্ব নাই। এইরূপ বিবাহে প্রধান কার্য্যের মধ্যে এই যে, নানাস্থান হইতে আত্মীয় কুটুম্বগণকে আহ্বান করিয়া আনা, তাহাদিগকে আদর ও আপ্যায়িত করা। আর গ্রামস্থ সামাজিক লোক-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথাসাধ্য ভোজন করান। এ ভোজে ধনীর লুচী, পুরি, সন্দেশ, রসগোল্লা, ছানা বড়া প্রভৃতির মধুরত্ব নাই। আছে শাক, ভাত, ডাল, দু-চারিটি মাছের ব্যঞ্জন, অম্বল, ক্ষীর ও বাতাসা। মধুরত্বের মধ্যে অমায়িক সম্ভাষণ, বিনয় ও দৈন্যতার ভাব, এবং হৃদয়ের ঐকান্তিক আগ্রহ।

সামাজিক লোকদিগের স্ত্রীপুরুষগণের ভোজনের নিমন্ত্রণ যথারীতি পূর্ব্ব দিনই হইয়াছিল। অদ্য প্রত্যূষে অন্নদা গাত্রোত্থান করিয়া কোনমতে ইষ্ট মন্ত্র যপ করিয়া পাড়ার এবাড়ী ওবাড়ী গিয়া ক্ষেমা পিসী, হরি মাসী, তারা কাকী প্রভৃতি শুভ্র কন্যাদিগকে সাদরে ডাকিয়া আনিলেন; তাহাদের কাহারও নিকট রাশি রাশি তরকারি রাখিয়া প্রস্তুত করিতে, কাহারও কাহারও হাতে জলের কলসী দিয়া পাকের ঘরের জল যোগাইতে, কাহারও কাহারও হাতে ঝাঁকা দিয়া চাল ডাল ধুইতে নিযুক্ত করিলেন। "জেঠীমা, খুড়ীমা, পিসীমা, মামী, মেজোবৌ, সেজোবৌ, সোণাবৌ, সুখদা, মোক্ষদা, থাকমণি শিগগির স্নান ক'রে যার যার জপটা সেরে ফেল ও কিছু খেয়ে নেও; সারাদিনটা খালিপেটে উনানের ধারে থাকিলে বড়ই কষ্ট হবে"। অন্নদা এই বলিয়া সকলকেই অভ্যর্থনা ও অনুরোধ করিতে

লাগিলেন। জেঠীমা (উমাসুন্দরীর মাতাকে অন্নদা জেঠীমা বলিয়াই ডাকিতেন) বলিলেন, "এত সকালে আমরা বুড় মাগিরা আর খাব কি? বৌগুলিকে খাওয়াইয়া নেও। তুমি ত বাছা আজ তিন দিন ধরে কিছু খাইতেছ না।" অন্নদা বলিলেন, জেঠীমা তোমাদের খেতেই হবে, আমার মাথার দিব্বি খেতেই হবে। আমার নিমিত্ত ভাবনা কি, আমার উপবাস করা অভ্যাস আছে। উপবাসই আমার ভাল লাগে। যদি আমার খাওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি কর, তা হ'লে আমি কেঁদে ফেলবে, আমার চক্ষের জল দেখলে তোমারও চক্ষের জল পড়বে। এশুভদিনে চক্ষের জল ফেলা ভাল হবে না।" এই বলিয়া অন্নদা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। "পোড়াকপালির রকম দেখ।" জেঠীমা এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সকলকে সঙ্গে করিয়া স্নান করিতে গেলেন। এ দিকে ক্ষেমা প্রভৃতি গিন্নী, মাসীরা বেগুণ, কুমড়া, কচু, পটল, মুলো, থোড়, মোচার রাশি হইতে একটা একটা করিয়া লইয়া নির্দ্দয়ের মত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া, রাশীকৃত করিয়া থরে থরে রাখিতে লাগিল। তারাকাকী কলাইর শাকের ঝাঁকাটা টেনে বঁঠির ধারে এনে কয়েক মুঠ কেটেছে, এমন সময় "অন্নদা দেখ এসে, অন্নদা দেখ এসে, রাম রাম একি একি" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। অন্নদা ব্যাপারখানা কি জানিবার নিমিত্ত দৌড়িয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন ঐ ঝাঁকার এক পার্শ্বে একটা পেঁয়াজের খোসা লাগিয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনিও 'রাম, রাম' বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার রাগে মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। রহিম সেকের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করেন করেন, এমন সময়ে মনে পড়িল এ শুভদিন, কাহাকেও কটু কথা বলা উচিত নয়; রাগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "আমি রামকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, খাওয়া দাওয়ার কোন জিনিশ পত্র কোন মুসলমান দিয়া আনার প্রয়োজন নাই, তা সে শুনিল না। ভাগ্যি শাকগুলি যখন কাল

সন্ধ্যা বেলায় আনিয়া দেয়, তখনই শিশিরে থাকিলে ভাল থাকিবে বলিয়া, আমি ঝাঁকাটা ঘরে নেই নাই, নিলে কি বিপত্তিই হইত। এ অনাচারের কাল পড়িয়াছে, জাতি নিয়ে চক্ষু বুজিতে পারিলে হয়।" গণ্ডগোল শুনিয়া জেঠীমা ভিঁজা কাপড়ে ঘাট হইতে আসিয়া, তারাকে বলিলেন "মা তুমি এ গুলি ফেলে দিয়ে স্নান করে এস। বঁটিখানাও ভাল ক'রে ধুয়ে নিয়ে এস। আর মিছে গোল করিলে কি হবে, ও মিন্‌ষে আর ইচ্ছা ক'রে এমন করে নাই।" তারা তাহাই করিল। অন্নদা গোপালকে দিয়া দয়াল দাদাকে ডাকিয়া আনিলেন, এবং তাহার হাতে একটা ঝাকা দিয়া বলিলেন, "তুমি নকড়ি দাদার ক্ষেত হইতে কতকগুলি শাক নিয়ে এস। "দয়াল দণ্ডেকের মধ্যে ঝাঁকা ভরা শাক এনে তারা কাকীর সম্মুখে রাখিয়া দিল।" তারা কাকী ঘচাঘচ কচাকচ্ ক'রে কাটিয়া কাটিয়া গাদা দিয়া রাখিল। তরকারি কাটা শেষ হইল। মামী, জেঠী, খুড়ীমারা স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া চুলগুলি পিঠের কাপড়ের উপর দিয়া রৌদ্রে পিঠ রাখিয়া ঘাটেই সন্ধ্যা পড়িতে লাগিলেন। মেজোবৌ, সেজোবৌ, সোণাবৌ, সুখদা, মোক্ষদা, থাকমণি, ছোট বড় বৌ ও কন্যা প্রভৃতি কুটুম্বিনী ও আত্মীয়ারা পুকুরের ধারে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া, কেহ বা বুক সটান করিয়া আকাশের দিকে চক্ষু রাখিয়া দু'হাতে জড়া পাকান গামছা দ্বারা পৃষ্ঠলম্বিত-মাটী-ছোঁয়ান-চুলগুলি সজোরে সপাসপ্ সপাসপ্ শব্দে আঘাত করিতে করিতে ধরায় মুক্তা ছড়াইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা বিরল কেশ গুচ্ছ একহাত দ্বারা ধরিয়া অন্য হাতের অঙ্গুলি দিয়া জড়া ভাঙ্গিতে, কেহ কেহ বা কোমল হাতে সিক্ত কাপড়খানা মোচড়াইতে মোচড়াইতে মোচড়াইতে কে কি পাক করিবেন, কে কি যোগাড় দিবেন তাহার প্রস্তাব এই 'খোলা ।।তাস সভায়' উত্থাপন করিয়া মীমাংসা করিয়া লইলেন,

আর এক একবার এক এক কথার উপর মৃদু মধুর হাসি হাসিয়া কুন্দফুল বিকাশ করিয়া আবার পরিপক্ক বিম্বাধরে ঢাকিয়া রাখিতে লাগিলেন।

তরকারি কাটা শেষ হওয়া মাত্রই অন্নদা ক্ষেমা, হরি, পিসামাসীদিগকে স্নান করিয়া কিছু খেয়ে নিতে বলিলেন। ক্ষেমা পিসী বলিল, "অন্নদা তুমি বল কি, এই রাত পোহাইল, কাকে আধার খায় নাই, গোসাঞির নাম নেই নাই, খাব আবার কি।" অন্নদা বলিলেন, "তা হবে না। না খেয়ে শুধু পেটে কাজ করতে দিব না। আমার মাথার দিবিব, স্নান করে এখনই খেয়ে নেও। আর যদি মেয়েরা এখন না খাও, আমার কথা না শুন, তা'হলে জান ত অন্নদা পাগলিনী, তোমাদের বাপ মার অদৃষ্টে আজ বেশী কিছু আছে।" অন্নদা এই বলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে ক্ষেমা ও হরি প্রভৃতিকে ঠেলিতে ঠেলিতে পুকুরের দিকে পাঠাইয়া দিলেন। বেচারীরা কি করে, স্নান করিতে গেল। যাওয়ার সময় ক্ষেমা হরিকে বলিল, "দেখেছ মায়ের আমার কি বুদ্ধি বিবেচনা, কেমন মায়া. না খেয়ে কাজ করিলে আমাদের কষ্ট হবে ইহা ওর পরাণে সহিল না। ও পোড়াকপালী কিন্তু আজ তিন দিন যাবৎ এক ঢোক জল ও এক চিমটি চিনি বই আর কিছুই খায় না। কাল সন্ধ্যার পর আমি উহাকে খাওয়ার কথা বলাতে মুখ খিঁচিয়া ভেঙ্গাইয়া ভেঙ্গাইয়া আমাকে মাটি করিয়া ফেলিল, আমি আর কিছুই বলিতে পারিলাম না। ভদ্রলোকের বিধবার এতও সয়।" উমাসুন্দরীর অন্নদার ইঙ্গিত মতে ভোরে উঠিয়াই কাপড় ছাড়িয়া হবিষ্য ঘরে ভাতে ভাত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সকলের যাই স্নান হইয়াছে অমনি অন্নদা সকলকে ঐ ঘরে নিয়ে গেলেন। উমাসুন্দরীর মাতা বলিলেন, "অন্নদা, মা আমার, এখন শেষ কাল, এত সকালে খাইলে অসুখ হয়, আমাকে মা মাপ কর।"

অন্নদা বুঝিতে পারিলেন যে বিধবা কন্যাই ইহার একমাত্র কারণ। উমার দিকে চাহিলেন। উমার বুক ফেটে ক্রন্দন আসিতে লাগিল। তিনি অতি কষ্টে মনের গতি ফিরাইয়া নিতান্ত বালিকার মত বলিলেন, "মা, তুমি না বল আমি তোমার মা।" তিনি বলিলেন "তা বলি না? তুমি যে আমার মা, তার কি আর কথা আছে, তুমি একবার মা নও, শত-বার মা মা, মা, মা।" উমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন "মায় রেঁধেছে, এখন খাও। না খাইয়া মায়ের মনে ব্যথার উপর ব্যথা দিও না।" জেঠীমা অমনি একখানি পাতা টেনে বিষ পানে বসিলেন। অন্যান্য সকলেই বসিল, উমা সকলকেই পরিবেশন করিতে লাগিলেন। দধি, চিঁড়া, ক্ষীর, মুড়কী, সন্দেশ প্রভৃতি উপাদেয় জিনিসগুলি আনিয়া অন্নদা সকলকেই উদর পূরণ করিয়া খাওয়াইলেন। খাওয়া শেষ হইলে পর বলিলেন, "পিসীমা ও মাসীমা থাকিয়া কাজ নাই, আমি নানা কাজে বড় ব্যস্ত থাকিব, আপনারা দেখিয়া শুনিয়া সবই সুন্দর মত পাক করাইয়া লইবেন। জেঠীমা তুমি এই হবিষ্য ঘরের পাক করিয়া, যাঁহারা যাঁহারা আমাদের মতন ধপধপে কপালের আছেন, তাঁহাদিগকে খাওয়াইবে। বড় বৌকেও খাওয়াইবে। কাল উনি শ্যামা পূজার উপবাসের ভাণ করিয়া কিছু খান নাই। পুরোহিত ঠাকুর যে উপবাসী ছিলেন, তাহাতে হয় নাই। আজ যদি না খান, তাহা হইলে আমাকে বলিবেন, না খাওয়াটা কেমন আমি এসে দেখাইয়া দিব।" উমাসুন্দরীর মাতা এখন আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না; অমনি বলিলেন "পোড়ারমুখি, তুই যে আজ তিন দিন ধ'রে এক ঢোক জল মাত্র খেয়ে থাকিস তা বুঝি আমি জানি না। কাল রাত্রে তোকে ক্ষেমা খাওয়ার কথা বলাতে তাহাকে ভেঙ্গাইয়া নাকাল ক'রেছিলি। আমাকে আজ কৌশল করে বিষ খাওয়াইলি। চালাকি? আচ্ছা দেখি আমি আজ সমুদয় এখনই পাক

করিয়া রাখিব, তুই কেমনে না খেয়ে থাক্‌তে পারিস্‌! পোড়ারমুখির আস্পর্দ্ধা দেখ।" এই বাৎসল্য ব্যঞ্জক কটুবাক্যে অন্নদা হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "মা, তুমি ব্যস্ত হইও না আমি আ'জ খাব। তবে আমার একটা কথা এই যে, আমি বাড়ীর নিমন্ত্রিত লোক সকলের খাওয়া সারা না হইলে এক বিন্দু জলও গ্রহণ করিব না। এটী আমার একটা ব্রত। তুমি জেদ ক'রে আমার এ ব্রত ভঙ্গ করিও না। আমি সন্ধ্যার পর আজ নিশ্চয়ই খাইব। তোমার হাতেই খাইব। কিন্তু বড় বৌ আমার নিমিত্ত সারাদিন উপবাসী থাকিলে আমি নিশ্চয়ই খাইব না। উঁহাকে তুমি শিগ্‌গির খাওয়াও। উপবাস মুখে রয়েছে। নিরামিষ পাকে ডা'ল ভাত কিছু বেশী করে রাঁধিও, নকড়ী কাকা বৈষ্ণব, নিরামিষ খায়। আর দুই একজনও তাহার মত থাকিতে পারে; ভদ্রলোকদের মধ্যেও কেহ কেহ আতপান্ন খাইতে পারেন। নিমন্ত্রণের পরমান্ন এই ঘরে পাক হইবে। বড় বৌই করিবে। আমার নিমিত্ত যেন কেহই অনাহারী থাকে না, সন্ধ্যার পর তুমি ভাতে ভাত পাক করিয়া দিবে আমি তাহাই খাইব।" এই বলিয়া অন্নদা ভাঁড়ার ঘরে গিয়া কার্য্যে লিপ্ত হইলেন। উমাসুন্দরীর মাতা মনে মনে বলিলেন, "আজ তোর ভাতে ভাত খাওয়াটা দেখাইব। তোর চৌদ্দ পুরুষের রক্ষা, ব্রতের দোহাই দিয়ে দিনে খাওয়া এড়াইয়া গেলি।"

অন্নদা ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করিয়াই জয়, গোপাল, নেপাল, ভুঁতি, সুখি প্রভৃতি বালক বালিকাদিগকে চিঁড়া, মুড়ি, মুড়কি, দধি, চিনি, ক্ষীর, সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্ট ও উপাদেয় জিনিশ দ্বারা তাহাদের ছোট ছোট পেটগুলি পূরণ করিয়া বাড়ীটা তোলপাড় করিবার নিমিত্ত ছাড়িয়া দিলেন। উমাসুন্দরীকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "দুধ এখনই আসিবে, আসামাত্রই গরম করিয়া দেখে শুনে ছেলেগুলিকে খাওয়াইও।

মায়েরা আজ কাজে বড় ব্যস্ত রহিয়াছেন।” এইরূপে ঘরের গোল মিটাইয়া কাহার কাহার শিখা দিতে হবে, কাহার কাহার পূজার নিমিত্ত ফুল বেলপাতা দিতে হবে, ঠিক করিয়াই সমুদয় পাঠাইতে লাগিলেন। বেলা প্রায় এক প্রহর হইয়া আসিল। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্নদা-দিদীর উৎসাহ ও তেজ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুকড়ী, তিনকড়ী, ছকড়ী, নকড়ী প্রভৃতি জেলেরা লাল লাল রোহিত, বড় বড় কাতলা, বড় বড় কৈ, বড় বড় মাগুর, প্রভৃতি নানারূপ সুখাদ্য মাছের বোঝা আনিয়া পাকের ঘরের সম্মুখের উঠানে কাঁড়ী দিয়া ফেলিল। অন্নদাদিদী, খুড়ীমা, পিসীমারা এই সকল মাছ সহর্ষে দেখিয়া, কোন্ মাছ দিয়া কি রান্না করিতে হইবে, ইহার কথাবার্ত্তা কহিতেছেন এমন সময়ে ছিদাম ও সুবল নামে দুই ভাই একখণ্ড বাঁশের ঠিক মধ্য ভাগে একটি প্রকাণ্ড চাইন মাছ বান্ধিয়া বাঁশখানার দুইদিকে কাঁধে করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঠাকুরাণিদিগের নিকট আসিয়া ধাঁ করিয়া বাঁশ নামাইয়া বলিল, “বাবা বেঁচেছি, কাঁধটা ভেঙ্গে গেছে।” চাইন বড় উপাদেয় মাছ, পদ্মানদী ভিন্ন কোন নদীতে পাওয়া যায় না। তাহাও আবার সচরাচর মিলে না। এই মাছ দেখা মাত্র পিসীমা, খুড়ীমারা বলিলেন, “মেজোবৌ, মেজোবৌ, তোরা দেখ্ এসে, কেমন বড় চাইন মাছ।” বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কেহ বলিলেন, “মিগাং বড় হইলেই চাইন হয়।” কেহ বলিলেন, “তা কেন হবে, এই এক রকম মাছ।” কেহ বলিলেন, “উঃ বাবা, কত বড় মাছ। দেখেছ লেজটা কত বড়।” গোলটা কিছু মিটে গেলে, অন্নদা সকলকেই মাছের দাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সুবল অগ্রগণ্য হইয়া বলিল, “মা ঠাকরূণ, দামের কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? আমরা কি দাম পাওয়ার আশায় এত ভাল ভাল মাছ নিতান্ত কষ্টে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি? আমরা গরীব লোক, ছেলেপিলে নিয়ে বসতি করি।

নল কাটিয়া হিসাব লিখিয়া রাখিল। অন্নদাদিদী পরিবেশনের নিমিত্ত দধি, ক্ষীর, চিনি, সন্দেশ দেওয়ার সময় খুড়ীমা, পিসীমা, মামী, কাকীকে বলিয়া দিলেন, "কোন হাঁড়ীর দধি কি ক্ষীর খারাপ বাহির হইলে উহা পাতে না দিয়া আমার নিকট আনিয়া দিও, যে গোয়ালার জিনিস খারাপ বাহির হয় তাহাকে আমি সাত ঘাটের জল খাওয়াইয়া দিব।" উমাসুন্দরী থালায় থালায় পরমান্ন লইয়া পরিবেশনার্থ পাঠাইতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ রায় ও জ্ঞাতি খুড়া "এ গরীবের বাড়ী, বিশেষ আয়োজন নাই" বলিয়া সকলকেই অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। নিমন্ত্রিত লোকদিগের মধ্যে অনেকে বলিলেন, "ইহা অপেক্ষা আর বেশী কি আয়োজন হইতে পারে, অন্নব্যঞ্জন সবই উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এমন সুমধুর চাইন মাছ কম লোকেই পাইয়া থাকে। এমন উৎকৃষ্ট দধি ক্ষীর সচাযাচর ঘটে না, আপনাদের যত্ন ধন্য।" এইরূপে প্রায় পাঁচ শত লোকের ভোজ হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ ভোজনের গোলাটা পূর্ব্বদিন সারিয়াছিলেন বলিয়া এই ব্যাপার প্রায় এক প্রহর বেলা থাকিতেই শেষ হইল। রায় মহাশয় বরযাত্রীর আয়োজন করিতে লাগিলেন। পাত্রকে নিয়া যে সমস্ত স্ত্রী আচার করিতে হয় তাহা অন্নদাকে করিতে বলিলেন। ঢোল সানাই জগঝম্প বাজিয়া উঠিল, উলুধ্বনি ঝাঁকে ঝাঁকে পড়িতে লাগিল। সর্দ্দারগণ স-হাতিয়ারে কোমর বন্ধি হইয়া পালকির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, লোকজনে উঠান পরিপূর্ণ হইল।

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ভদ্রলোক পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইলেন। সকলে প্রায় তিন শত লোক মহাসমারোহে বিবাহে যাত্রা করিলেন। উলু-ধ্বনিতে বাড়ীখানি কাঁপিতে লাগিল। সকলে চলিয়া গেল, গ্রামস্থ মেয়েছেলেরা সকলেই আসিয়া বরের গমন উৎসাহে ও আহ্লাদের সহিত দেখিতেছিলেন। "গোল থামিয়া গেলে অন্নদা, উমা ও জেঠীমা সকলকে

আদর অভ্যর্থনা করিয়া উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়াইলেন। এইরূপে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, যখন দেখিলেন যে নিমন্ত্রিত কি রবাহুত কোন লোকেরই আর খাইতে বাকি নাই, তখন অন্নদা উমাকে ভাঁড়ার ঘরে রাখিয়া রান্না ঘরে প্রবেশ করিলেন। খুড়ীমা, পিসীমা, মেজোবৌ, সেজোবৌ, সুখদা, মোক্ষদাদিগকে প্রাতঃকালের মত জোর করিয়া স্নান করাইয়া নিজ মনের মত পরিবেশন করিয়া, ও উমাসুন্দরীর দ্বারা দধি ক্ষীর ইত্যাদি আনাইয়া প্রত্যেককেই উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়াইলেন। এবার জেঠীমাতাকে অনুরোধ করিতে সাহস পাইলেন না। রান্না ঘর হইতে বাহির হইয়া জেঠীমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, আমি এখন স্নান করিতে চলিলাম। সন্ধ্যা পড়িয়া আসিতে কিছু বিলম্ব হইবে।" শুনামাত্রই জেঠীমা ভাতে ভাত উনানে উঠাইয়া দিলেন। অন্নদা আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলে, অমনি "মা আমার এস" বলিয়া একখানা পাথর অন্ন, ডাল, ডালনা, প্রভৃতিতে পুরিয়া তাহার সম্মুখে দিলেন। অন্নদা দেখিয়া বলিলেন, "মা আমি না ভাতে ভাত রাঁধিতে বলিয়াছিলাম।" "হাঁ, ভাতে ভাতই রেঁধেছি। দেখ ভাতের নীচে কলা সিদ্ধ আছে। বেশী কথার প্রয়োজন নাই, খেতে থাক। যদি না খাবে, বল আমি এখনই তোমাদের বাড়ী হইতে চলিয়া যাই।" অন্নদা কিছু না বলিয়া সজল নয়নে, যাহা যাহা দিয়াছিলেন সবই দু একবার মুখে দিতে লাগিলেন। উপবাসের মুখে বুকে অন্ন ঠেকিতে লাগিল, কিছুই ভাল করিয়া তল হইল না। পরমান্নের বাটিটি টানিয়া লইয়া দুই চারি বার কয়েক গ্রাস মুখে মাত্র দিয়া ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "গোপাল মায়ের পেটে থাকার সময় তাঁহার সাথে পরমান্ন খাইয়াছিলাম, তাহার পর এই খাইলাম। মনে করিয়াছিলাম আর এজীবনে খাইব না, তা তুমি ত মা-ই, তাই খাইলাম। এমন সুমিষ্ট পরমান্ন আর খাই নাই।" উমাসুন্দরীর মাতা নিতান্ত উদাস ও

এবমনে স্থির নেত্রে অন্নদার মুখের দিকে চাহিয়া এই কথাগুলি শুনিতে ছিলেন। অন্নদা আবার বলিলেন "মা, আমাকে তুমি যাহা খাওয়াইবার তাহা ত খাওয়াইলে, এখন আমার একটা কথা শুনিবে কি?" তিনি বুঝিতে পারিয়া একটু বিরক্তির ভাবে বলিলেন, "মা, তোমরা কেন আমাকে মাছ খাইতে পীড়াপীড়ি কর, আজ তিন চারি দিন হইল তোমাদের এখানে আসিয়াছি প্রত্যহই তোমরা ঐ কথা বলিয়া আমার মনে ব্যথা দিতেছ। আমি আমার গৃহদেবতা নারায়ণ ঠাকুরের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যতদিন আর বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন নিরামিষ আহারে থাকিয়া ভগবানের সেবায় কাল কাটাইব। তোমাদের কি ইচ্ছা যে, এই ব্রত ভঙ্গ করিয়া, এজন্মের মত পুত্রবিহীন হইয়া, তোমা-দের মতন দুটী কন্যা প্রসব করিয়া, এত ধন দৌলত থাকিতেও চিরদুঃখ-ভাগিনী হইব? মা, তোমাদিগকে আমি বড়ই ভালবাসি, জেদ করিয়া আমাকে নরকগামিনী করিও না। আমি এক বেলাই নিরামিষ আহার করিব বলিয়া মনন করিয়াছিলাম; কিন্তু উহাতে তোমার জ্যেঠার মনে বড় কষ্ট হইবে বলিয়াই তাহা করি নাই।" অন্নদার চক্ষু দিয়া জল আসিতে উদ্যত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন উমাসুন্দরীর বৈধব্য দশাই এই কঠোর ব্রতের একমাত্র কারণ। তিনি উমাসুন্দরীর বিষন্ন মুখপানে চাহিলেন, তিনি হৃদয়ের বিষ চাপা দিয়া রাখিয়া মাতাকে হবিষ্যান্ন পরিবেশন করিয়া দিলেন, তিনি তাহাই খাইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে সেনপাড়ার সমস্ত নিমন্ত্রিত লোক নীলকণ্ঠ সেন মহাশয়ের বাড়ীতে সমারোহে আহার করিলেন। ভবদ্বীপে লোকজনের যেরূপ আহারাদি হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ হইয়াছিল। এইমাত্র বিভিন্ন, চৌধুরী মহাশয়েরা নিতান্ত যোগাড় করিয়াও চাইন মাছ পান নাই, কিন্তু কালীপূজাতে অনেকগুলি পাঁঠা দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে সকলেই কিছু কিছু মাংস পাইয়াছিলেন। পরিবেশনের সময় একজন কৃষ্ণমন্ত্রীর পাতে ভ্রমক্রমে মাংস পড়াতে তিনি রাম রাম কহিয়া আহার বন্ধ করিয়া যে পর্য্যন্ত সকলের আহার সমাপন না হইল সে পর্য্যন্ত হাত তুলিয়া বসিয়াছিলেন। আর ঘৃণাতে তাঁহার পেটের অন্নগুলি আবর্ত্তিত হইতেছিল। পরিচারিকা ও ভদ্রকামিনীগণ যাঁহারা যাঁহারা রন্ধনাদি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের কাহারই সেদিন ভাল করিয়া আহার হয় নাই। অনেকের ছেলেপিলে ভাল করিয়া দুধ খাইতে না পাইয়া তাবৎ দিনটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া লোকজনকে ত্যক্ত করিয়াছিল।

নীলকণ্ঠ সেন মহাশয়ের পুত্রশ্বশুর দেবনাথ চৌধুরী মহাশয় নিতান্ত সদ্বিবেচক চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। অনেককাল কলিকাতা নগরে, সদর দেওয়ানিতে কাজ করিয়া, প্রভুত অর্থ উপার্জ্জন করেন। অনেক অনেক কুলীন সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদন ও বিদ্যাশিক্ষা, দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগের উপনয়ন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে অর্থদান, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে অর্থদ্বারা সাহায্য ইত্যাদি সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়া, শেষকালে একরূপ রিক্তহস্তে বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার একটি মাত্র পুত্রসন্তান বিধুপদ, বয়ঃক্রম ঊনবিংশ বৎসর।

বিষ্ণুপদ এখন সহরে থাকিয়া ইংরেজী পড়িতেছেন। দেবনাথ চৌধুরী মহাশয়ের ইচ্ছা যে, পুত্রটী সংসারকার্য্যে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হইলেই তিনি কাশী যাত্রা করিয়া অনাদি, অনন্ত, চিরদয়ালু পূর্ণব্রহ্মের আরাধনা দ্বারা জীবনের পাপপঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়া, পবিত্র আত্মা লাভ করিবেন এবং জল-বিম্ব অনন্ত জলে মিশাইয়া, জড়াবরণ নাশ প্রাপ্ত হইলে, অভ্যন্তরের জ্যোতিঃ অনন্ত জ্যোতিতে মিশাইয়া এক হইয়া যাইবেন। ইহাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়া তিনি ত্যাগ স্বীকার, অর্থাভিলাষ বিসর্জ্জন, নিভৃত চিন্তা, পরোপকার, জড় পদার্থ অবলম্বনে সাকারভাবে ঈশ্বরের পিতৃমাতৃভাব উপলব্ধির অভ্যাস করিতেছিলেন। হরসুন্দরীর বিবাহ কার্য্যে তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। ব্যয়ের ভারও অযাচিত ভাবে নিজ স্কন্ধে নিয়াছিলেন।

খাওয়া দাওয়ার গোলটা মিটিয়া যাওয়া মাত্রই দেবনাথ চৌধুরি মহাশয় পাত্রপক্ষীয়দের বাসা ও সিধা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কত লোক তাহাদের সঙ্গে আসিবে তাহার কোন তালিকা পান নাই বলিয়া সিধার বন্দোবস্ত করিতে কেহ কেহ নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি বলিলেন যে, বিবাহের পর এ সমস্ত যোগাড় করিতে হইলে অনেক অসুবিধা হইবে, হয়ত অনেকেরই আহারাদি হইবে না সুতরাং এই সময়েই দশ জনের, দশ জনের করিয়া অনেকগুলি সিধার যোগাড় করিয়া রাখিলেন। এই সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অদূরে বরপক্ষীয়দিগের বাদ্য শুনা যাইতে লাগিল। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। চৌধুরী মহাশয় গ্রামস্থ প্রধান প্রধান কয়েকজন ভদ্রলোক ও দুই চারিজন পরিচারক সঙ্গে করিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে অগ্রসর হইলেন। লাঠিয়ালেরা বিবাহাদি কার্য্যে অনর্থক একটা না একটা সামান্য বিষয় লইয়া ঝগড়া করে বিধায়

তাহাদিগকে সঙ্গে নিলেন না। কেবল কালু সর্দার মাত্র সঙ্গে চলিল। ক্রমে বরযাত্রীর সম্মুখীন হইয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন। বরপক্ষীয় ভদ্রলোকগণ চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্যে পরম আপ্যায়িত হইলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাঁহার সঙ্গে কোন লাঠিয়াল নাই দেখিয়া বড়ই সুখী হইলেন। কেহ কেহ বা কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে বলিয়া আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। দেবনাথ চৌধুরী মহাশয় লক্ষ্মণ রায় মহাশয়কে বলিলেন, "কি হে ভায়া (এই উভয়ের মধ্যে বিষয় সম্বন্ধে নিতান্ত লাঠালাঠি থাকিলেও আন্তরিক বিলক্ষণ বান্ধবতা ছিল। উভয়েই উভয়কে নিতান্ত সাহসী ও কৃতী বলিয়া মনে মনে সম্মান করিতেন) লাঠিয়ালের ভয়ে বোধ হয় কাঁপিতে কাঁপিতে আসিতেছিলে। কোন ভয় নাই, তাহারা তোমাদের ভয়ে পূর্ব্বেই পালাইয়াছে।" লক্ষ্মণ রায় মহাশয় একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এ হৃদয়ে যে ভয় আছে তাহা ত তুমি ছেলেবেলা হইতেই দেখিয়া আসিতেছ।" চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "তা ভাই যা হউক তোমার লোকজনদিগকে সাবধান করিয়া দাও, তাহারা যেন বরের পাল্কিখানা সাঁ সাঁ করে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যেতে যত্ন না করে। তা হ'লে ভাই একটা বিষম গোল বেঁধে যাবে। আমি আমার লোকজনকে বাধা দিয়া রাখ্‌তে পারব না। তুমি ত জান, লাঠিয়ালকুল নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল। আমার ইচ্ছা কার্য্যটা নিতান্ত শান্তির সহিত ও পরম আমোদে সুসম্পন্ন হইয়া যায়।" "আমারও সেই মত," বলিয়া লক্ষ্মণ রায় মহাশয় দাশু সরদারকে ডাকিয়া আনিয়া বলিয়া দিলেন, "সাবধান, কোন পাইক সরদার যেন বাড়ীর ভিতর না যায় ও বরের পালকী যেন বাড়ীর ভিতরের দরওজার সম্মুখে থাকে।" দাশু সর্দার, 'যে হুকুম মহারাজ' বলিয়া তাহার অনুচরদিগকে সাবধান করিয়া দিল।

বরযাত্রীরা আসিতে আসিতে গ্রামের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তুবড়ি, হাওই, ফানুস প্রভৃতি বাজি, ও ঘন ঘন বন্দুক ছাড়িতে লাগিল। নানাবিধ বাজনায়, বন্দুকের আওয়াজে, লোক জনের কলরবে গ্রামখানি তোলপাড় করিতে করিতে বরপক্ষ বিবাহ বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কেহই কোনরূপ গণ্ডগোল করিয়া বরের পথ অবরোধ করিল না। গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণ সাদরে সকলকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। বরের পাল্‌কী, অন্তঃপুরের দরজায় নামিল দেখিয়া পাহারাওয়ালা দু'চারিজন সর্দ্দার বাক্য ব্যয় করিল না। কেবল এক জন লাঠিয়ালকে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া পাত্রীপক্ষীয় একজন সর্দ্দার তাহার ঘাড় ধরিয়া ঠেলিয়া ১০।১২ হাত দূরে ফেলিয়া দিল। এই ঘটনাতে একটু গোলযোগ হওয়া মাত্রই দাশু সর্দ্দার গোলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। কারণ অবগত হইয়া, হুকুম নাই বলিয়া, নিজ পক্ষের লোককেই গালি দিতে লাগিল। দয়াল খান্‌সামা পাত্রকে পাথালি কোলে করিয়া লইয়া চিত্রকরা পিঁড়ী খানির উপর দাঁড় করাইল। পুরোহিত মহাশয়ও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। আর সমস্ত ভদ্রলোক ও তাঁহাদের অনুচরগণ প্রবেশ করিয়া সভাতে উপস্থিত হইলেন। এ সভার রচনা প্রণালী পত্র করার সময় যেরূপ পাঠকগণের নিকট বলা হইয়াছে তদ্রূপ। তবে এইমাত্র বিভিন্ন যে, সভার মধ্যের খালি স্থানটী স্ত্রীদের আলিপনায় সুশোভিত ছিল। এ চিত্রে সাদা পদ্মের বড়ই ছড়াছড়ি হইয়াছিল; কিন্তু সেগুলিতে মৃণাল ও গোলাকার পাতা ছিল না। নানারূপ সরু অথচ ঘন পাতাবিশিষ্ট লতার উপরে ফুটান হইয়াছিল। এ সমস্ত লতা মনগড়া স্বভাবের কোন লতা দেখিয়া নকল করা নহে।

জয়চন্দ্র সর্ব্বপ্রধান কুলীনের ছেলে। অতএব সকলে তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রথমে বসিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি না বসিলে কাহারই বসা হইতে পারে না। জয়চন্দ্র বিলক্ষণ বিপদে

পড়িলেন। এত বড় বড় লোকের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়া কিরূপেই বা বসেন। এই ভাবিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় বলিলেন, "ব'স না, তোমার বসা না হইলে অন্য কাহারও বসা হইতে পারে না।" জয়চন্দ্র বসিলেন, সকলেই বসিল। দুই পক্ষ হইতে কর্ত্তা দাঁড়াইয়া যোড় করে সভাস্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিবাহকার্য্য আরম্ভের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। উভয় পক্ষের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণ বলিলেন, "সময় হইয়াছে, কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে।" পাত্রী পক্ষীয় চারিজন যুবক পাত্রী আনিয়া সাত পাক ঘুরাইয়া শুভদৃষ্টির নিমিত্ত পাত্রীর অবগুণ্ঠন উঠাইয়া বরের সম্মুখে ধরিল। ঝাঁকে ঝাঁকে উলুধ্বনি হইতে লাগিল। রামশরণ চাহিলেন। দেখিলেন বিদ্যুৎলতা সহসা প্রকাশ পাইয়া আবার সন্ধ্যার রক্তিম মেঘাবরণে আবরিত হইল। 'গৃহ্যতাম্, 'গৃহ্যামি' চলিতে লাগিল। পাত্রীপক্ষের কেহ পাত্রপক্ষের অনেককে 'আপপিজিয়ে, আপপিজিয়ে' বলিয়া হুঁকাটী ধরিলেন, তিনি পেছাব পিজিয়ে বলিয়া হাসির তরঙ্গ উঠাইয়া নানাবিধ কৌতুক করিতে লাগিলেন। পুরোহিত মহাশয় "ইতি শিরস্তঃ পাদ পর্য্যন্তং স্পৃশেৎ" বলিয়া আচমন শেষ করিয়া, "ততো নাপিতঃ গৌরীতি ত্রির্ব্বদেৎ" বলিলেন, অমনি লক্ষ্মণ রায় মহাশয় নীলকণ্ঠ সেন মহাশয়কে বলিলেন, "এখন উঠে আপনার বচনটা সেরে ফেলুন।" সেন মহাশয় বলিলেন, "আজ আপনার বচনই অগ্রগণ্য। আপনি উপস্থিত থাকিতে আমার অধিকার নাই। আপনার কুল আমাঅপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" এমন সময়ে গোপীনাথ নাপিত দাঁড়াইয়া রায় মহাশয়ের দিকে চাহিয়া যোড়করে বলিল, "আজ্ঞা, আপনারা কেন শুধু এ গরীবের পেসাটা নিয়া টানাটানি করিতেছেন, এ গরীবের ভাতে মারা যাওয়ার গতিক।" এই কথা শুনামাত্র সভাস্থ সকলে হাসিতে হাসিতে একে অন্যের গায়ে পড়িতে লাগিলেন। হাসির

তরঙ্গটা কিছু থামিলে, গোপীনাথ তালপাতের ছাতাটী মাথায় দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতে লাগিল ঃ—

"ধর্ম্ম সভা কুলের নন্দন,
সবে পরে পুষ্প চন্দন।
ডা'নে শঙ্কর বামে গৌরী,
সর্ব্ব লোকে বল হরি।
সর্ব্ব লোকে বল জয়,
হর গৌরীর বিয়ে হয়।
গড়গড়ী বচন কৈল,
হর গৌরী মিল হল।
গোপীনাথ শীল কয়,
যোড়া টাকা দক্ষিণা হয়।"

এইরূপে নির্ম্মল আমোদ প্রমোদে বিবাহ সম্পন্ন হইল। রামশরণ পায় শিকল পরিলেন।

পাত্র পাত্রীকে ঘরে নেওয়া হইল। যে যে স্ত্রী-আচার প্রথা ছিল তাহা সমস্তই সম্পন্ন হইল। হরসুন্দরীর মামাত ভগিনী বিমলা গুপ্তা একটি জলপূর্ণ পাত্রের জলগুলি হাতদ্বারা বিলক্ষণরূপ আবর্ত্তন করিয়া পাত্র ও পাত্রীর মুকুট হইতে দুই খণ্ড সোলা লইয়া, তাহা পৃথকভাবে আবর্ত্তিত জলে ফেলিয়া দিলেন, দুটি যোড় লাগে কিনা, উদ্বিগ্নচিত্তে নিবিষ্টমনে দেখি লাগিলেনতে। যখন দেখিলেন যে একখণ্ড অন্যখণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া পাকের মধ্যে ঘুরিতেছে তখন তাঁহার মন পাতলা হইল। এই পরীক্ষা দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন যে, সংসার আবর্ত্তনে ঘুরিলেও ইহাদের প্রেমের আর বিচ্ছেদ হইবে না। বিপদসাগরে পড়িলে একে অন্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া ভাসিবে—বিচ্ছেদ হইবে না। মরিতে হয়

দু'জনেই এইরূপ করিবে। স্ত্রী-আচার শেষ হইলে পর, শাশুড়ীঠাকুরাণী দৃষ্টিভোজনের নিমিত্ত এক থাল পরমান্ন রামশরণের নিকট রাখিলেন। তিনি গণ্ডূষ লইয়া তিনবার হাতে লইয়া শুঁকিয়া পাত্রত্যাগ করিলেন। ইহার পর শ্যালী ও শ্যালকপত্নীরা রামশরণকে লইয়া বাসর ঘরে কি কি আমোদ করিলেন, তাহা পাঠক মহাশয় তাঁহার নিজের বাসর ঘরের কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

রামশরণ অদ্য শ্বশুর বাড়ীর কিছু খাইবেন না। দয়াল আসিয়া তিন চারি থালা পরিপূর্ণ সন্দেশ, ক্ষীরের ছাঁচ প্রভৃতি নানারূপ খাবার সামগ্রী ঘরে রাখিয়া গেল। রামশরণ দুই চারি বার মুখে দিলেন, উপবাসের মুখে কিছুই খাইতে পারিলেন না। শ্যালী পর্য্যায়ের আয়ন্তীগণ এই সমস্ত তৃপ্তির সহিত খাইয়াও কোনটা বেশী মিষ্টি কোনটা কম মিষ্টি হইয়াছে বলিয়া সমস্ত জলপানীর তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

দেবনাথ রায় মহাশয় বিবাহ শেষ হওয়ামাত্রই বরযাত্রীদিগের সিধা পাঠাইয়া দিলেন। পণ্ডিত ও কুলীনদিগের মর্য্যাদা অনুসারে কাহাকে বা এক মণের কাহাকে আধমণের সিধা পাঠাইয়া দিলেন। বাসা ও লোক জনের এমন সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া পূর্ব্বেই রাখিয়াছিলেন যে, কাহার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না।

লাগিল। একজন আনন্দে বাজাইতে বাজাইতে জগঝম্পের সহিত পা পিছলিয়া চিত হইয়া পড়িয়া গেল। দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিল; কিন্তু সে কিছুমাত্র লজ্জা না করিয়া চিত হইয়াই বাজাইতে লাগিল। ইহাতে তাহার সহকারী "এখন পর্য্যন্ত একখানি ইনাম পাইলাম না, ওঠ, আর চিত্‌ বাদ্য বাজাইয়া কাজ নাই" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইল। শুনিয়া সকলে হাসিতে হাসিতে প্রায় অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠাইয়া ফেলিলেন। দেবনাথ চৌধুরী মহাশয় "বাদ্যকর জাত বড় বেহায়া" বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিজের গায়ের চাদরখানা উহাদের নিকট ফেলিয়া দিলেন, তাহারা নিরস্ত হইল। ঢুলিরা উঠিয়া 'তাক্ ধিম্ ধিনা ধিনা ধিনা ধিনা' 'তাক্ ধিম্ ধিনা ধিনা ধিনা' তাল বাজাইতে লাগিল। জয়চন্দ্র অন্ত ঘরে তাঁহার সমবয়স্কদিগের নিকট বলিতে বলিলেন, 'শুন ইহারা কি বোল বাজায়। বাজায়, সিকিটা, সিকিটা, দোয়ানিটা, দোয়ানিটা; দিলি দিলি; না দিলি না দিলি। চিঁড়া খা, চিঁড়া খা, দৈ ই খা, দৈ ই খা, খা, বো—গুনপোড়া, বো—গুনপোড়া।" সকলে হাসিতে লাগিল। ঢুলিরা নাচিতে নাচিতে বাজাইতে লাগিল। আর বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করিতে লাগিল। চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "এখন সানাইর সহিত ঢোল বাজান হউক। অনেক কাজ আছে, সবই তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা চাই।" শুনা মাত্রই দুইজন সানাইদার এগিয়ে এসে ঘরের বারেণ্ডায় বসিল। একজন সুর দিতে লাগিল আর একজন সরফর্দা রাগিণীতে সানাইতে গাহিতে লাগিল—

"চরণ তরণীদিয়ে তার মা তারিণী
কুলহীনে কূলং দেহি কুলকুণ্ডলিনী"

ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওস্তাদ ঢুলিওয়ালা কাঁশীখানা হাতে লইয়া লম্বা লম্বা হাতে অথচ মৃদু আঘাতে তাল ঠুকিতে লাগিল। আর একজন ঢুলি খুব মিঠাহাতে বিলম্বিত লয়ে আড়াঠেকাতাল বাজাইয়া সুন্দর মত লয় করিয়া দিল। জয়চন্দ্র পূর্ব্ববৎ এই তালের বোল বলিলেন "রামধন দাদা চিঁড়া খা, রামধন দাদা চিঁড়া খা"। গানটি বিশুদ্ধ রাগিণী, সময় ও লয় মত হইয়াছিল বলিয়া বড়ই সুললিত বোধ হইয়াছিল। দেবনাথ চৌধুরী মহাশয় সংগীত শাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন বলিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন, এবং উহাদিগকে যথেষ্ট বক্‌শীস দিয়া বিদায় করিলেন। লাঠিয়ালগণ এখন মালকাছাটা করিয়া লাঠি হাতে লইয়া দাঁড়াইল। পাত্রীপক্ষের কোন পাইক সর্দ্দার না দেখিয়া নিতান্ত হাল্কা মনে লাঠির নানারূপ ভঁজি দেখাইতে লাগিল। কেহ কেহ বার্নিতান্ত পরিষ্কার মত খেলাইল। দাওসর্দ্দার বাবরীচুল টেকি বাঁধিয়া ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরাইয়া শক্তির পরিচয় দিল, এবং তৎপর হল্লা করিয়া সভাঘরের বারেণ্ডায় কনুই চাপা দিয়া পড়িয়া, অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং বক্‌সীসের নিমিত্ত চৌধুরী মহাশয়ের দিকে যোড় হাত করিয়া রহিল। তিনি বলিলেন, "বেশ খেলেছ, থাম, পুরস্কার এখনই দিতেছি," এই বলিয়া নিজ খানসামার দিকে চাহিলেন। সে কোমর হইতে পাঁচটী টাকা দিল। তিনি কালু সর্দ্দারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যদি তোমার দলের কেহ এখানে উপস্থিত থাকে, তাহাকে ইহাদের সহিত একহাত খেলিতে বল না।" কালু, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া একটি কৃশাঙ্গ যুবকের দিকে চাহিল। যুবক উঠিয়া কোমরে গামছা বাঁধিয়া সভাস্থ সকলকে ও দাওসর্দ্দারকে সেলাম করিল; পরে ওস্তাদজী কালু সর্দ্দারের চরণ স্পর্শ করিল। হাতখানি নিজ কপালে ও বক্ষে ছোঁয়াইয়া, বিপক্ষের এক জনের হাতের লাঠিগাছা চাহিয়া লইল, এবং মাটিতে রাখিয়া তিনবার সেলাম্ করিল এবং উঠানে

বৃত্তাকারে ঘুরিতে লাগিল। বিপক্ষেরও একজন বলশালী সর্দ্দার তাহার সহিত খেলা করিতে আসিয়া ঘুরিতে লাগিল। যুবকটী এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া হৈ হৈ করিয়া এমন উচ্চ ও প্রখর নাদ করিল যে তাহার গলায় বাড়ী খানি কাঁপিয়া উঠিল। সভাস্থ সকল লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া নিস্তব্ধে খেলা দেখিতে লাগিলেন। যুবক ডান হাতে লাঠি গাছ আড় করিয়া ধরিয়া, আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বিপক্ষীয় সর্দ্দার লাঠির ভাঁজ দেখাইতে দেখাইতে তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কোন ক্রমেই তাহার অঙ্গস্পর্শ করিতে না পারিয়া স্বস্থানে আসিয়া আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যুবক, "আচ্ছা মেরা ভাই, বেশ্ খেলেছ," বলিতে বলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে নাচিতে কখনও লাঠি গাছ ডাইন হাতের দুই অঙ্গুলিতে ধরিয়া, কখনও বা বাম হস্তের দুই অঙ্গুলিতে তেড়া করিয়া ধরিয়া, সম্মুখে আসিয়া লাঠির উপর মৃদু ভাবে দুই এক ঘা দিয়া, ধাঁ করিয়া লাঠিগাছ কাড়িয়া লইয়া মাথার উপর ঘা মারিবার দাও দেখাইয়া লাঠিগাছ ফেরত দিল। ইহা দেখিয়া আরও একজন নামিক লাঠিয়াল ক্রোধে কম্পিত হইয়া, সদর্পে লাঠিগাছ পরাজিত পাইকের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া, খেলিতে প্রবৃত্ত হইল। এব্যক্তিও পূর্ব্ববৎ প্রথম যাইয়া যুবকের গায় লাঠিখানা ছোঁয়াইতে পারিল না। যুবক পূর্ব্ববৎ উহার নিকট আসিয়া সজোরে লাঠিতে পাঁচ ছয় বার আঘাত করিয়া বেশ মুগুর মত কয়েক ঘা বসাইয়া দিল, ও লাঠিগাছ পূর্ব্ববৎ কাড়িয়া লইয়া দুগাছ লাঠিই কালু সর্দ্দারের দিকে নিক্ষেপ করিল, এবং পরাজিত ব্যক্তির নিকট খালি হাতে দাঁড়াইয়া বিশ্রী গালাগালি দিতে লাগিল। ঐ ব্যক্তি যেমন ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিল, অমনি সেই সর্দ্দারটী তাড়িতের ন্যায় একটী পেঁচ খাটাইয়া, তাহাকে এমন ধাক্কা

দিল যে, ঐ বলবান ব্যক্তির নিজ শক্তির গতি অন্যদিকে চালিত হইয়া, ঘুরিতে ঘুরিতে দাণ্ড সর্দ্দারের গায়ে গিয়া পড়িল। সকলে সাবাস সাবাস বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় দেখিলেন এই কৃশকায় যুবকের যেরূপ দক্ষতা অন্য দুই চারিজন এগুইলে আর রক্ষা নাই। তিনি অমনি গায়ের বনাত খানি যুবককে দেওয়ার নিমিত্ত কালু সর্দ্দারের দিকে ফেলিয়া দিলেন। আর বলিলেন, "তোমরা পূর্ব্বাপরই এবিষয়ে ওস্তাদ।" দেবনাথ চৌধুরী মহাশয় তাহাকে বলিলেন, "তুমি নিজে একক কিছু খেলাইয়া দেখাও না।" কালু বলিল, "আজ্ঞে কি দেখাইব এখন সে কাল নাই। যদি আজ্ঞা করেন তাহা হইলে দুই এক হাত তলওয়ার ভাঁজ দেখাইতে পারি।" চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, 'তাহাই কর।' কালু বলিল, "আপনারা কতকগুলি কড়ি যোগাড় করিয়া আমাকে ঘেরিয়া দাঁড়ান। আমি তলওয়ার ভাঁজ করিতে থাকি। আপনারা চেষ্টা করিয়া দেখুন, আমার গায়ে একটা লাগাইতে পারেন কিনা।" সভাস্থ সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কেহ কেহ মনে মনে বলিতে লাগিলেন বলে কি? লোকটা ক্ষেপেছে নাকি? চৌধুরী মহাশয় তাহার খানসামার দিকে চাহিলেন, সে দৌড়িয়া গিয়া একটি ছোট রকমের ঝাঁকা পরিপূর্ণ কড়ি আনিল। লক্ষ্মণ রায়, চৌধুরী মহাশয় প্রভৃতি পাঁচ ছয় জন লোক কালু সর্দ্দারকে ঘেড়িয়া দাঁড়াইলেন। কালু সর্দ্দার সকলকে প্রণাম করিয়া তলওয়ারখানা মাটিতে রাখিয়া তাহার উপর মাথা থুইয়া প্রায় এক মিনিট কাল বিড় বিড় করিয়া কি যেন কতকগুলি মন্ত্র পড়িল। তৎপর ওস্তাদের নাম লইয়া উদ্দেশে প্রণাম করিল, দুই চারি বার তলওয়ারখানা ভাঁজ করিয়া ক্রমেই বেগ বৃদ্ধি করিতে লাগিল। কিছুকাল পর বলিল, "আপনারা আমার গায় কড়ি ফেলতে থাকুন,।" চতুর্দ্দিক হইতে কড়ি বর্ষণ হইতে লাগিল,

কিন্তু সকলগুলিই তলওয়ারে ঠেকিয়া এদিক ওদিক ছুটিতে লাগিল। কাহারো গালে, কাহার বা মুখে, কাহারও বা চক্ষুতে লাগিতে লাগিল। সকলে বেগতিক দেখিয়া থাম থাম বলিয়া দূরে পলাইলেন। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় সাবাস সাবাস বলিয়া কালুকে দশটাকা বক্সীস দিলেন ও চৌধুরী মহাশয়কে বলিলেন, "তোমরা নিজেরাই পূর্ব্বাপর লাঠিয়াল মানুষমারা কত রকম কল জান। তোমাদিগের লোক জন আর এ বিষয়ে দক্ষ হইবে না কেন?" এই কথায় চৌধুরী মহাশয় একটু হাসিলেন, কারণ তিনি লাঠির জোরে রায় মহাশয়ের একখানা তালুক বেদখল করিয়া রাখিয়াছিলেন। সভাভঙ্গের পর জয়চন্দ্রের সভা বড় জাঁকাল হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে পাড়ার সকল ছেলে পিলে তাহাকে ঘেরিয়া বসিল ও নানারূপ হাসি কৌতুকে সময় কাটাইতেছিল। সানাইদার আশার অতিরিক্ত বক্সীস পাওয়াতে তাহার আশা বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সভাভঙ্গের পর এই বালকগণের নিকট আসিয়া সেলাম করিয়া শ্যামকে উপলক্ষ করিয়া বলিল, 'আজ্ঞা একটু বাজাইতে চাই।' জয়চন্দ্র বলিলেন, "বাজাইয়া আর কি হবে? বক্সীস যে পেয়েছ।" সানাইদার বলিল, "আজ্ঞা আপনাদের নিকটও কিছু চাই।" জয়চন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা সুর দিতে থাক যদি বাজাইয়া নিতে পার ক্ষতি নাই।"

এই বলিয়া হরনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মামা একটা কথা শুন।" হরনাথ কাণ এগিয়ে দিলেন। জয়চন্দ্র কি যেন বলিলেন। হরনাথ বাড়ীর ভিতর গেলেন। ক্ষণকাল মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। এবার গায়ের কাপড়খানি বেশ করে গায় দিয়ে এসে জয়চন্দ্রের নিকট বসিলেন, জয়চন্দ্র বলিল "শুন হে বাজাইতে না পারিলে কিন্তু বক্সীস পাবে না।" সানাইদারের পূর্ব্ব ঘটনাতে মনে একটু অহঙ্কার জন্মিয়াছিল। তাহাতে আবার এ বালক সভা, শুনিয়া

একটু ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, তা ওস্তাদজি জানেন।" জয়চন্দ্রের সঙ্গীত বিষয়ে ব্যুৎপত্তি আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অসময়ে পুরবীর সহিত বেহাগ মিশ্রিত করিয়া, একটু আড়তালে সানাইতে গাহিতে লাগিল। জয়চন্দ্র হরনাথের দিকে চাহিলেন। হরনাথ কিছু এগিয়ে গিয়ে সানাইদারের মুখামুখী বসিয়া চাদরের নীচ হইতে একখানা কাঁচাতেঁতুল বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইয়া চিবাইতে লাগিলেন। সানাইদারের মুখে লালা আসিতে লাগিল। সে একটু ঘুরিয়া বসিয়া বাজাইতে লাগিল। হরনাথও ঘুরিয়া তাহার মুখামুখী হইয়া তেঁতুলের অবশিষ্ট অংশ বাম হাতের তলের লবণে বার বার ছোঁয়াইয়া টক্ টক শব্দ করিয়া খাইতে লাগিলেন। এবার আর সানাইদার বাজাইতে পারিল না। লালাতে সানাই ভরিয়া গেল, নিতান্ত বিপদ দেখিয়া সে দৌড়িয়া পালাইল। বালকগণ হৈ হৈ রবে হাতে তালি দিতে দিতে তাহার পিছনে পিছনে দৌড়িয়া গেল। নীলকণ্ঠ সেন মহাশয় তাড়াতাড়ি বাহির বাড়ী আসিলেন। লক্ষ্মণ রায় মহাশয়ও এই সময়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কারণ অবগত হইয়া দুইজনে বাড়ীর ভিতর গিয়া হাসিতে হাসিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। গ্রামের যেখানে যে এই কথা শুনিল, সে অমনি হো হো করিয়া হাসিল।

বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়া আসিল। বাসিবিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হইল। রামশরণ রক্ষা পাইলেন। বাসিবিবাহের পুকুরটী শাশুড়ীকে মাটি দিয়া ভরিতে হয়। কমলাগুপ্তা যখন ভরিতে গেলেন তখন তাঁহার বৈবাহিকা ও ভ্রাতৃবধুগণ আসিয়া পুকুর হইতে কাদা উঠাইয়া তাঁহার সুন্দর মুখখানি লেপিয়া দিলেন। কেহ কেহ বা তাঁহাদের সুঠাম হাতের ছাপ তাঁহার কাপড়ে উঠাইতে লাগিলেন। পরে একে অন্যের গায় দিতে লাগিলেন। কেহ অর্দ্ধগালে, কেহ কপালে, কেহ বা নাকে কাদা লইয়া

পুলকে হাসিতে হাসিতে স্নান করিয়া আসিলেন। কমলা গুপ্তা স্নান করিয়া আসিয়াই রামশরণকে ডাকিয়া আনিলেন। একখানি পীঁড়ি ফেলিয়া, এক গ্লাস জল রাখিয়া বলিলেন, "বাবা, বেলা শেষে সকলের সহিত আহার করিতে হইবে। কাল অনাহারেই কাটাইয়াছ। দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ বলিয়া, দু'বেলা অন্নাহার করিবে না। অনাহারে থাকিলে বড়ই কষ্ট হইবে। এখন কিছু খেয়ে নেও। এইখানে বস"—বলিয়া তাড়াতাড়ি অন্য গৃহে চলিয়া গেলেন। জামাতার সহিত কথা কহিতে দেখিয়া কোন কোন স্ত্রী কিছু বিদ্রূপ করিতে লাগিল। তাহাতে অন্য আর একজন বৃদ্ধা বলিলেন, "আঃ ও শোকী তাপী মানুষ, আঠার বৎসরের দুইটী সোণার গোপালও হারাইয়াছে। বড় মেয়েটীও মারা গিয়াছে। এ মেয়েটাই যে বাঁচিবে তাহারই বা ঠিক কি? নিজের পেটের ছেলের মত একটি কাঁচা ছেলে জামাতা পেয়েছে। উহার সহিত কথা কহিয়া উহাকে ঠাণ্ডা হইতে দে। ওর বুকের ভিতর যে আগুণ জ্বলিতেছে তাহা নিবাইতে দে। আঃ, মায়ের আমার কেমন চরিত্র, কাহাকে কখন ভুলেও কটু কথা কয় না। মায়ের আমার কেমন মমতা, খাবার বেলা যদি কোন কাঙ্গালি আহারের নিমিত্ত এসে দাঁড়ায়, নিজে না খাইয়া থালা খানি ধরিয়া কাঙ্গালের সম্মুখে দেয়। হা, বিধি, এমন আনন্দের প্রতিমা খানি শোকে পোড়াইতেছ!"—এই বলিয়া চক্ষের জল ছাড়িয়া দিলেন। যাঁহারা নিন্দা করিতেছিলেন, তাঁহাদেরও চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "পেটের ছেলে ও জামাতাতে আমি কিছু তফাত দেখি না। আমি আমার জামাতার সহিত কথা কহিব। ইহাতে লোকে নিন্দা করে করিবে।" কমলা গুপ্তা একখানি রেকাবে করিয়া কয়েকখণ্ড আঁখ, দু'চারিটী কমলা লেবু, অর্দ্ধখণ্ড দাড়িম ও একখানি থালাতে কতকখানি লুচি, কয়েক খণ্ড আদার কুচি ও দালনা

আনিয়া রামশরণের নিকট রাখিয়া সম্মুখে বসিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মতে লেবুক'টি ছুলিতে লাগিলেন। আর বলিলেন, "বাবা, খাওনা।" শ্বাশুড়ীর এই ভাব দেখিয়া রামশরণের নিজ মাতার স্নেহভাবের কথা মনে পড়িল। শশুর বাড়ী যে আসিয়াছেন তাহা ভুলিয়া গেলেন, মনে হইতে লাগিল সেই মায়ার মূরতি মা, সেই চিরানন্দদায়িনী মা, সেই অমৃতময়ী মা স্বর্গলোক হইতে আসিয়া এই আনন্দের দিনে সম্মুখে বসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেছেন। খাইতে খাইতে রেকাবখানি শেষ করিলেন। কমলা, লুচির থালাখানি এগিয়ে দিলেন। রামশরণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "খাওনা বাবা, ইহাতে দোষ নাই। এ ঘৃতপক্ক, আমার বাবাকে আমি প্রত্যহই বিকাল বেলা এইরূপ খাবার প্রস্তুত করিয়া দিতাম। তুমিও আমার বাপ তাই তোঁমাকেও দিয়াছি।" এ কথাতেও রামশরণ হাত বাড়াইলেন না। তখন আবার বলিতে লাগিলেন, "আমি তোমার মা, মাতার আজ্ঞা অবহেলা করিও না।" রামশরণ বলিলেন "মা যে তাহার আর ভুল কি" বলিয়া তাড়াতাড়ি মুখে দিতে লাগিলেন। কমলা বলিলেন, "আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে দুটীভাতই এইবেলা খাওয়াইয়া নেই, কিন্তু একে কোন্ পাপে যেন এত কষ্ট পাইতেছি তোমাকে এক রবিতে দু'বার অন্নাহার করাইয়া, আরও পাপসঞ্চয় করিতে ভয় হয়; তাইতে পাতে এখন ভাত দিলাম না, ঘৃতপক্কে দোষ নাই বলিয়া তাহাই, পরাণ ভরিয়া খাওয়াইলাম। তুমি খাইলে, আমি বড় সুখী হইলাম।" রামশরণ এ থালাখানিরও সমুদয় নিঃশেষ করিয়া পাত্র ত্যাগ করিলেন। কমলা পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "বাবা, হর যে আমার কপালে বাঁচিবে তাহা আশা করি না। তবে তোমার পূর্ব্বপুরুষদের পুণ্যের ফলে যদি বাঁচে। আমি শোকে তাপে পাগলিনীর ন্যায় এ সংসারে কাল কাটাইতেছি। আমি উহাকে ভাল করিয়া কোন কাজ কর্ম্ম শিখাইতে পারি

নাই। উমা ও অন্নদাই আমার ভরসা। তবে তোমাকে এই একটা মাত্র কথা বলি যে, আমার পিতৃ ও শ্বশুরকুলের কোন মেয়েরই নিন্দা এপর্য্যন্ত হয় নাই। আমার মাতা ও শাশুড়ী উভয়েই সহমরণে স্বর্গে গিয়াছেন। এ কন্যার সুখ্যাতি অখ্যাতিলাভ তোমাদের হাতে।" পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন মেয়েরা আসিয়া ঘর পুরিয়াছে। তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন। হরসুন্দরীর মামাত ভ্রাতৃবধূ সরমা রামশরণকে বলিলেন, "কি মহাশয়, মায়ের পেটে যে ব'ন্ হয়, আপনি কি ব'ন্ বিবাহ করিলেন?" রামশরণ বলিলেন, "আমি আপনার ননদকে ব'ন্ বলি নাই। কালীনাথ আমাকে বলেছে যে আপনি আজ ক'দিন হ'ল চৌধুরী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন 'যাও ভাই অমন কথা বল না। আপনি ভাইকে বিবাহ করেছেন?" সরমা প্রকৃত পক্ষেই কোন কথার উপরে ঐরূপ বলিয়াছিলেন। সরমা এ কথায় কিছু অপ্রস্তুত হইয়া, আর এক পেছ ধরিয়া বলিলেন, "মহাশয় আপনি দেখি মন্দ খাদক নহেন, পাতে যে একখানা লুচিও রাখিলেন না।" এই কথাতে রামশরণ কিছু লজ্জিত হইলেন। বলিলেন, "মায়ের কাছে খেতে বসে কিছু পাতে রাখলে, মায়ের মনে হয় ছেলের পেট ভরিল না, তাইতে সব খেয়ে ফেলেছি। আপনারাই বা চালাকি ক'রে এত কম দিয়াছিলেন কেন?" সরমা তাহার ননদকে উপলক্ষ করিয়া বলিলেন, "শুন ভাই উনি বেহায়ার মত ফের মা মা বল্‌ছেন।" রামশরণ বলিলেন, "আপনারা শুনুন উনি ননদকে পুরুষ বানায়ে ফেল্‌লেন। ব'ন্ না বলিয়া ভাই বলিয়া বিষম ভুল করিতেছেন।" এইরূপে স্ত্রী মহলে আমোদ প্রমোদ হইয়া গেল।

দেবনাথ চৌধুরী মহাশয় পূজা আহ্নিক সমাপনান্তে কিছু জলযোগ করিয়া, কুলীন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা পরিষ্কার করিয়া দিলেন। পংক্তিভোজন হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দিন

অবসান হইল। সূর্য্যকিরণ উঠান ছাড়িয়া গৃহচালে, গৃহচাল ছাড়িয়া বৃক্ষে, বৃক্ষ ছাড়িয়া বৃক্ষচূড়ায় উঠিয়া অদৃশ্য হইল। অন্ধকার দেখা দিল। নীলকণ্ঠ সেন মহাশয়ের হৃদয়ে আঁধার প্রবেশ করিল। প্রাণের প্রিয়তমা ননির পুতুলখানি এখনই কাড়িয়া লইয়া যাইবে। এই কথা মনে উঠিয়াই হৃদয় মন বিষম ব্যথায় আকুলিত হইল। কতবার সুস্থির হইতে চেষ্টা করিলেন। অভ্যন্তর হইতে কি যেন সাঁ সাঁ করিয়া উঠিয়া সে চেষ্টা ডুবাইয়া দিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন কন্যা সৎপাত্রে সম্প্রদান করা জীবনের একটি মহৎ কর্ত্তব্য কার্য্য। আমি তাহা সম্পন্ন করিয়াছি। ইহাতে আমার মন ব্যথা পাইতেছে কেন? কন্যার কোন ব্যারাম হয় নাই, নিরাপদে সমাদরে স্বগৃহে যাইতেছে, তাহাতে আমার মন কাঁদে কেন? বুঝেছি মায়া, তুমি বিচ্ছেদের আবরণ দেখাইয়া আমাকে আকুলিত করিতেছ। তোমার অনুসরণ করিলে না জানি এই সংসার হইতে চিরবিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় আমার হৃদয় মন আকৃষ্ট করিয়া কত যেন কষ্ট প্রদান কর। হে মাতঃ, শোক তাপ বিনাশিনী ত্রিনয়নে, তুমি আর এই সৃষ্টিরক্ষিণী মায়ারূপে আমার চিত্তে প্রবেশ করিয়া আমাকে দুঃখভাগী করিও না। হে মাতঃ, তুমি তোমার বশীকরণ নেত্রে এ অধমের দিকে চাহিয়া সেই অন্তিম সময়ে তোমার দিকে লইয়া যাইও। এইরূপে নীলকণ্ঠ সেন মহাশয় হৃদয় দৃঢ় করিতে লাগিলেন।

কমলা ওপ্তা মেয়ের দিকে চাহিয়া চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। এ বালিকা শ্বশুর সময় থেকে পাবে কি? মনের কথা কাহারও নিকট বলিতে পারিবে না, ইত্যাদি নানা আশঙ্কায় অস্থির হইতে লাগিলেন। চক্ষের জল বার বার ত্যাগ করিয়া হৃদয় ভার পাতলা করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃবধূরা হরসুন্দরীর বেশ ভূষা করিতে লাগিলেন। মাতা বলিলেন, "হর, তুমি কেঁদ না, শীগগিরই তোমাকে আনিব। এই তারা পিসী

তোমার সঙ্গে চলিল, তোমার যখন যাহা মনে লয় তাহা ইহারই নিকট বলিও। মাথার কাপড় কখনই ফেলিও না। কোন গুরুজন সম্মুখে পড়িলে দৌড়িয়া পালাইও না। মাথা ও গায়ের কাপড় সুন্দরমত টানিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া যাইও। খুব আস্তে আস্তে কথা বলিও। কাহারও কথার অবাধ্য হইও না।” হরসুন্দরী মায়ের কান্না দেখিয়া আরও কাঁদিতে লাগিলেন। বাজনা বাজিয়া উঠিল; আয়ন্তীগণ পাত্র ও পাত্রী একখানে করিয়া যথাবিধি মঙ্গলাচরণ করিয়া যাত্রা করাইলেন। বর ও কন্যা এক পাল্‌কীতে উঠিল। হরসুন্দরীকে পাল্‌কীতে উঠাইয়া দেওয়ার সময় সরমা রামশরণকে বলিলেন, “শীগ্‌গির খুব শক্ত ক’রে ধ’রে রাখুন, নইলে উড়ে যাবে।” রামশরণ বলিলেন, “এ পাখীর পাখ উঠে নাই, উড়তে জানে না। ঐ দেখুন চৌধুরী মহাশয় শিকল নিয়ে আস্‌চেন, পালান ধরা দিবেন না।” সরমা পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই তাঁহার স্বামী রামশরণের সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন। তিনি দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে পালাইলেন। রামশরণ বলিলেন, “দেখুন পাখী পালায়।” চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, “এ পোষা পাখী, বদ্ধ পাখ, উড়ে যেতে পারবে না।” বেহারাগণ পালকী কাঁধে করিল। সকলে সমারোহে ভবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বাড়ীটি নিরিবিলি হইল। হরসুন্দরীর নিজ বাড়ী পরের বাড়ী হইল। নীলকণ্ঠ সেন মহাশয় অনেক দূর পর্য্যন্ত পাল্‌কীর পিছনে পিছনে গিয়া উদাস মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

এ দিকে ভবদ্বীপে উমাসুন্দরী গ্রামস্থ কামিনী ও আত্মীয় স্বজনগণের সহিত বর-বধুর আগমন, নিতান্ত উৎসাহের সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। চারিদণ্ড রাত্রি গেল, প্রহর গেল, দেড় প্রহর গেল তবু বর আসিতেছে না। বরযাত্রীর বাদ্যের শব্দ শুনা যাইতেছে না দেখিয়া উমাসুন্দরী বড়ই উৎকণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন। ভালবাসার স্বধর্ম্মই অনিষ্ট আশঙ্কা। তুমি যারে ভালবাস সে নিকটে থাকিলেও দেখি তোমার দুর্ভাবনার শেষ নাই। "এ বোধ হয় বাঁচিবে না, ইহার বোধ হয় ব্যারাম হইবে, ইহার ব্যারাম হইলে আমি কি করিব, না বাঁচিলে ত আমি কষ্ট সহ্য করিতে পারিব না,'——এইরূপ অনর্থক দুশ্চিন্তার কাল-ছবি আঁকিয়া তুমি তোমার মন কাল কর। এ ত স্নেহের ও ভক্তির মূর্ত্তি কয়েকটি নিকটে নাই। উমাসুন্দরী ভাবিতে লাগিলেন, ইহাদের আসিবার এত বিলম্ব হইতেছে কেন? শুনেছি সেনপাড়ার লোকগুলি বড় দাঙ্গাবাজ। বর প্রবেশ করিবার সময় হয়তে লাঠালাঠি করিয়া কতক-গুলি খুন হইয়া গিয়াছে। ওমা! একি সর্ব্বনাশ, বিয়ে না হয়ে বুঝি একটা মামলা মোকদ্দমায় সকলে জড়িয়া পড়িয়াছে। দূর হ, এমন হ'তে পারে না। তাহা হইলে দুই চারিজন মানুষ অবশ্যই ফিরিয়া আসিত। এই ভাবিয়া কিছু সুস্থির হইলেন। আবার ভাবিলেন, মানুষের ক্ষণমাত্রে বিশ্বাস নাই, বোধ হয় কাহারও ব্যারাম হইয়া থাকিবে। এই কথা মনে উঠিয়া উমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া কপালদেশ ঘামিল। এ সব কথা অন্যের নিকট বলিবার যো নাই, লোকে পাগল

বলিবে। কি করেন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে দূরে কি যেন শুনিতে পাইলেন। চকিতের ন্যায় সেইদিকে কাণ পাতিলেন, সন্দেহ বোধ হইল, কিছুই বিশেষ করিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। ক্রমে কিছু স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন, আরও কিছুকাল গেল, তখন সুন্দরমত বুঝিতে পারিলেন বাজনা বাজিতেছে। উমার হৃদয়ের ঢেউ থামিতে লাগিল। যতই স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল, ততই ঢেউ মিশিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে কলরব শুনা যাইতে লাগিল, উমার হৃদয় নির্ব্বাত তড়াগের ন্যায় স্থির হইল। আহ্লাদের চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কিরণ তাহাতে খেলা করিতে লাগিল। উমা তখন ভাবিতে লাগিলেন বিধি বুঝি আমার অদৃষ্টে পাগলিনী হইতে লিখিয়াছেন। এখনই ত পাগলিনী হইয়াছিলাম। কেবল উলঙ্গ অবস্থায় দৌড়ান বাকী ছিল। আমরা বলি এরূপ পাগল শুধু তিনি নন। সকলেই মনে মনে পাগল। যাহারা মনের কথা প্রকাশ করে, তাহাদিগকেই লোকে পাগল বলে, আর যাহারা গোপন রাখে তাহারাই মানুষ।

ক্রমে বরযাত্রীরা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এযাবৎ রামশরণ হরসুন্দরীকে নিজ অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। হরসুন্দরী এক একবার লজ্জায় সুকোমল দেহ লতা সঙ্কুচিত করিতেছিলেন। পরে নিদ্রার আবেশ হওয়াতে মস্তকখানি অবলম্বিত বৃক্ষের স্কন্ধে রাখিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। রামশরণের নিদ্রা নাই। তিনি যে অমৃত অঙ্কে রাখিয়াছিলেন, তাহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না, নিদ্রা আর কত বড় কথা। পালকির দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত ছিল। তাহা দ্বারা মধ্যে মধ্যে মসালের আলো প্রবেশ করিতেছিল। তিনি সেই আলোতে ঐ মুখকমল অতৃপ্ত নয়নে এক এক বার দেখিতেছিলেন। আবার আলো প্রবেশের বাধা হওয়াতে এক একবার বিরক্ত বোধ করিতে-

ছিলেন। এক এক বার বন্ধনমুক্ত, কপোল-বিলম্বিত-সুকোমল-সুমধুর-সূক্ষ্ম কেশপাশ উঠাইয়া যথা স্থানে বিন্যস্ত করিতেছিলেন। কখন বা চকিতের ন্যায় ঈষৎ বিকসিত বিম্বওষ্ঠের দিকে চাহিয়া প্রক্ষেপিত লাজ উহার মধ্যে পড়িয়াছে জ্ঞানে, কোমল হাতে উঠাইতে যাইয়া নিজেই ব্যাকুল হইয়া মনে মনে হাসিতেছিলেন। নানারূপ বাজির যোঁগ্ যোঁগ্ শব্দ হইতেছে। বাজনা বাজিতেছে। লোকের কলরব হইতেছে। তাহার দিকে রামশরণের কাণ নাই। তিনি অনিমিষ নয়নে এই মুখ-প্রসূনই দেখিতেছেন। তিনি দেখেন কি? বালিকার মুখ কি তিনি আর কখনই দেখেন নাই? যাহা প্রতিদিন দেখেন তাহা দেখিয়া আবার এত বিহ্বলতা কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? ইহার গূঢ়তত্ত্ব কে জানিতে পারিয়াছেন? এ কি মুখের কারুকার্য্য দেখিয়া? হরসুন্দরীর মুখ অপেক্ষা ভাল মুখ ত আরও আছে, তাহাও ত রামশরণ দেখিয়াছেন। তবে কেন? হয়ত অনেকেই বলিবেন, রামশরণ চক্ষুতে প্রেমের চসমা লাগাইয়া এই মুখ দেখিতেছিলেন, তাহাতেই তাঁহার চিত্ত এইরূপ হইয়াছিল, কাজেই এইরূপ অতৃপ্ত মনে দেখিতেছিলেন।—কিন্তু আমরা বলি তাহা নয়। এ মায়াদেবীর খেলা; তিনিই কামিনীমুখে, কণ্ঠে, সর্ব্বাবয়বে, অলক্ষিত ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া মদিরাপূর্ণ অপূর্ব্ব সুগন্ধ বিকাশ করিয়া প্রতি মানবমনকে আস্তে আস্তে নেশাযুক্ত করিয়া, উন্মত্তের ন্যায় কখন হাসাইতে, কখন কাঁদাইতে থাকেন। কোন কারণে এ নেশা ছুটিলে হৃদয় অবসাদে ঢাকিয়া সবই শূন্যাকার করিয়া তুলে। এ মাদক আবার পান না করিলে মন, কাজেই শরীর, স্ফূর্ত্তি পায় না। যাহার ভাগ্যে তাহা ঘটে না, সে শুকাইতে শুকাইতে এ পৃথিবী শূন্য দেখিয়া চিরশূন্যে বিলীন হইয়া যায়। এই মায়া-বলেই স্বয়ং মহাদেব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া পাগলের ন্যায় অনা-

হারে অনিদ্রায় ত্রিভুবন ঘুরিয়াছিলেন। রামশরণ ত যৎকিঞ্চিৎ লোক। তাঁহার হৃদয় এই আকৃতিতে বিমোহিত করিয়াছিল, এ আর বেশী কথা কি? আশ্চর্য্যের বিষয় কি? পাল্‌কী আসিয়া উঠানে নামিল। বড় বাপের ধুম পড়িয়া গেল। রামশরণ হরসুন্দরীর মুখ হ'তে আপনাতে আসিলেন; হরসুন্দরীর মুখখানি নিজ কাঁধ হইতে আস্তে আস্তে নামাইয়া একটু একটু ঝাঁকিয়া, কোমল হাতে ঝাঁকিয়া পাছে মোমের পুতুলখানি চেপ্‌টা হইয়া যায়, নিজের মুখ তাঁহার কাণে ছোঁয়াইয়া অতি মৃদু স্বরে বলিলেন, 'বাড়ী আসিয়াছি, এখনই নামিতে হবে।' হরসুন্দরী চকিতের ন্যায় উঠিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের ও মুখের কাপড় টানিয়া বসিলেন।

গ্রামস্থ মেয়েরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বর-বধূর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া অনেক রাত্রি হওয়া প্রযুক্ত সকলেই নিজ নিজ ঘরে চলিয়া গেলেন। কেহ কেহ মনে মনে এ খেলার কথা ভাবিয়া হাসিতে হাসিতে, কেহ কেহ বা পূর্ব্বস্মৃতির দুঃখতরঙ্গ হৃদয়ে উঠাইয়া খালি হাতখানি দ্বারা সাদা কাপড়ের সাদা অঞ্চল খানা উঠাইয়া চক্ষের জল বারংবার মুছিয়া হৃদয় সাদা করিয়া ধুইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চিরদুঃখ-বিনাশিনী নিদ্রা দেবীর শান্তিময় কোলে আত্মসমর্পণ করিলেন।

বর-বধূ বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হওয়া মাত্রেই উমাসুন্দরী কয়েকজন আয়স্তী লইয়া যথাবিধি মঙ্গলাচরণ করিয়া তাহাদিগকে গৃহে লইয়া গেলেন। উমাসুন্দরীর শাশুড়ী সহমরণের সময় তাঁহাকে যে সমস্ত গহনা দিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সেই সমস্ত দিয়া বউ পরিচয় করিলেন। নিজের একখানিও দিলেন না। গোপালের স্ত্রীর নিমিত্ত পুঁটলি করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া দিলেন না।

অগু কাল-রাত্রি। রামশরণ নিজ গৃহে যাইয়া শয়ন করিলেন।

নিদ্রাদেবী তাঁহাকে আজ বড় দয়া করিলেন না। কাল নিদ্রায় রাত্রি বড় দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। উমাসুন্দরী হরসুন্দরীকে বক্ষে লইয়া শয়ন করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, পাড়ার সমুদয় মেয়েরা আসিয়া বাড়ী ভরিল। সকলেই নব বধূর মুখ দেখিতে লাগিলেন। উমাসুন্দরী এক একবার মুখের কাপড়খানি উঠাইয়া দেখাইয়া আবার তাড়াতাড়ি ঢাকিয়া ফেলিতে লাগিলেন, পাছে সূর্য্য কিরণে ননির মুখখানি গলিয়া যায়। যতবারই মুখের আবরণ খোলা হইল ততবারই হরসুন্দরী চক্ষু মুদিয়া রহিলেন, পাছে অক্ষিগোলকের সুকৃষ্ণবর্ণ সূর্য্য কিরণে গলিয়া বিবর্ণ হইয়া যায়। যাঁহারা দেখিলেন সকলেই বলিলেন 'বড় সুন্দর বউ।' কেহ কেহ বলিলেন, "এ যে তুলির আঁকা ছবির মত দেখায়। কেমন হরিতাল মাখান সুন্দর রঙ গো। কেমন তুলিতে আঁকা ভ্রূ দু'খানি। হাত পায়ের আঙুল কেমন সুন্দর, কেমন সুডৌল, কেহ যেন একটি একটি ক'রে আস্তে আস্তে বসাইয়া রেখেছে। কেমন সুডৌল সরু নাক, বাঁশি দুটি প্রায় দেখা যায় না। মা বাপ কেমন সুন্দর ক'রে সাজাইয়াছে। গলায় মোহনমালা, হাতে বাজু, কঙ্কন, দেখেছ কেমন সুন্দর বাইয়ানা নত। সেনপাড়ার ভদ্র লোকেরা খুব দিতে থুতে জানে। ওদের মেয়েরা যেমনই সুন্দর তেমনই সচ্চরিত্র। দেখেছ এতবার মুখের কাপড়খানি খোলা হ'ল লক্ষ্মী মেয়েটি একবারও চক্ষু মেলে চাইলনা। জামাইকেও বেশ্ দিয়াছে। দিব্বি খাট, মশারি, বাসনপত্রও সুন্দর সুন্দর। কেমন সুন্দর আয়না বাটা দেখেছ।" এইরূপ যাহার যে মন্তব্য তাহা প্রকাশ করিয়া যে যার বাড়ী যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে এক কামিনী অন্যাকে বলিলেন, "তোমরা ভাই সকলেই বৌটিকে বড় সুন্দরী বলিলে। আমি ত ভাই অত সুন্দর দেখিলাম না। এত ধব্‌ধবে রঙ কি ভাল। এত সরু নাক ভাল দেখায় না। মেয়েটার গায়ে

মাংস নাই, হাড়ে মাংসে জড়ান। চুলগুলির গোছা বড় মোটা, তাহা আবার এত লম্বা যে প্রায় মাটীতে ছোঁয়ায়। কিছুই বড় বেশী ভাল নয়। আচ্ছা আমার কামিনী কি এ অপেক্ষা কুৎসিত?" অপরটী বলিলেন, "তাহা কেন হবে, সে আর এক রকমের সুন্দর। বলতে কি ভাই আমি এ মেয়েটীকে বড়ই সুন্দর দেখিলাম।" কামিনীর মাতার এইরূপ বলার কারণ এই যে রামশরণের পুত্রে তাঁহার কন্যার বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু উনি নীচ কুলোদ্ভবের কন্যা বলিয়া লক্ষণ রায় মহাশয় ও অন্নদাদিদি তাহা করিতে দেন নাই।

অন্নদাদিদি এ পর্য্যন্ত ভ্রাতৃবধূকে দেখেন নাই, গত রাত্রিতে বর-বধূকে যখন ঘরে লইয়া যাওয়া হয়, সেই সময় একবার ঘরে আসিয়াই কোনলোক জল অনাহারে আসিয়াছে কিনা, যে যে কুটুম্ব সন্তান বাড়ীতে থাকিবে তাহাদের শয্যার যোগাড় আছে কিনা, ইত্যাদি কাজের নিমিত্ত তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। অদ্য এ পর্য্যন্তও তিনি দেখিতে অবসর পান নাই। প্রাতে উঠিয়াই প্রাতঃস্নান করিয়া লক্ষণ রায় প্রভৃতি গুরু জনের ও ইষ্টদেবতার পূজার উপকরণ বিন্যস্তে বিশেষ নিমগ্ন ছিলেন। এমন কি, তাঁহার নিয়মিত পূজাটীও সম্পন্ন করিতে অবসর পান নাই। কেবল দুই চারিবার জপ করিয়াছিলেন মাত্র। এখন একটু অবসর পাইয়া বধূকে দেখিতে আসিলেন। হরসুন্দরীকে সম্মুখে টানিয়া আনিয়া কোলে বসাইয়া তাহার মুখের আবরণ খুলিলেন। মাথার ঘোমটা খুলিয়া ফেলিলেন। হরসুন্দরীর চক্ষু বুজা দেখিয়া বলিলেন, "চক্ষু মেল, আমি তোমার ননদ, আমার দিকে চক্ষু বুজিয়া থাকিলে চলিবে না।" হরসুন্দরী জানিতে পারিলেন এই অন্নদা ঠাকুরাণী। তিনি তবু চক্ষু মেলি-লেন না। উমা বলিলেন, "চক্ষু মেল, উনি উহাতে মন্দ বলিবেন না, ভাল বলিবেন।" হরসুন্দরী চক্ষু মেলিলেন। অন্নদাদিদি বিশেষ মনোযোগের

সহিত হরসুন্দরীর আপাদ-মস্তক দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ ক্রমেই গম্ভীর হইতে লাগিল। উমাসুন্দরীর কথা মনে পড়িল। উমাসুন্দরীও বিলক্ষণ সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যের ফুলের সৌরভ অনেক দিন রহে নাই। সে কমনীয়, সুকোমল, সুস্নিগ্ধ সুরভি ফুল অকালে বৃন্ত ছিন্ন হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে। সে ফুলে কোন ফল ফলে নাই। এ ফুলের পূর্ণ বিকাশ দেখিয়া হৃদয় মন শীতল হয় নাই। সে ফুলের আর একটি কলিকা কেন আবার বিধি আনিয়া নয়নের নিকট রাখিলেন? পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি হয় নাই? হৃদয় পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গিয়াছে, সেই অঙ্গারে আবার আগুণ জ্বালাইয়া ভস্ম করিবার কি এই সূত্রপাত? এইরূপ পূর্ব্ব স্মৃতির কত কথা, কত বিষ মাখান কথা তাঁহার মনে আসিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া ফেলিল। তাঁহার সাদা দৃঢ় মন প্রায় গলাইয়া ফেলিল। তিনি আস্তে আস্তে হরসুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ কয়েক দিন গণ্ডগোলে পূজা ও মালা জপ করিতে পারি নাই। তুমি ইহাকে নাওয়াইয়া ধোয়াইয়া সুন্দরমত খাওয়াও পরাও। জ্যেঠা মহাশয় ও জ্যেঠীমাতাদিগের পরিচর্য্যা কর। এ ত তোমারই কাজ, আমার শরীর আর বয় না। আর তোমার মা বাপকে তুমি একদিনও সেবা করিতে পার নাই, আজি কর। শুভরাত্রির যাহা যাহা করিতে হয় তুমিই করিও, সব ঘরে গোছান রহিয়াছে। আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিও না। আমি আজ সন্ধ্যার পরে খেয়ে শুয়ে থাকিব।" এইরূপ বলিয়া অন্নদা চলিয়া গেলেন। তাঁহার মনের ভাব কেহই বুঝিতে পারিল না, কেবল বুঝিলেন উমাসুন্দরীর মাতা। অন্নদা নিজ ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া একাগ্রচিত্তে সেই সর্ব্বমঙ্গলময় ভোলানাথের মাথায় বিল্বপত্র দিয়া নিমীলিত নয়নে জপে বসিলেন। সন্ধ্যা হওয়া মাত্র ঘর হইতে বাহির হইয়া হবিষ্য করিলেন, তৎপর 'শুই গিয়া' বলিয়া নিজ ঘরে গিয়া দ্বার অবরুদ্ধ

করিলেন। তাঁহার চক্ষুতে যত নিদ্রা ছিল তাহা পাঠক মহাশয় পূর্ব্বেই জানেন; তিনি যাহা প্রতিদিন করেন তাহাই করিতে লাগিলেন। তবে পূর্ব্বাপর নিশীথে, অদ্য সন্ধ্যা না হইতেই তাহা আরম্ভ হইল।

শুভরাত্রির সমস্ত কাজ যথানিয়মে হইয়া গেল। উমাসুন্দরী হরসুন্দরীকে লইয়া গিয়া তাহার আঁচলের সহিত রামশরণের চাদর বন্ধন করিয়া আসিলেন। বন্ধন সময়ে একাগ্রতার সহিত ঈশ্বরের নিকট মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, "হে অনাথনাথ, এ বন্ধন যেন আর বিচ্যুত না হয়।"

হরসুন্দরী কিছুকালের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। রামশরণ জাগিয়া জাগিয়া তাঁহার গায়ের লেপখানি গুঁজিয়া গুঁজিয়া দিতে লাগিলেন। এই দাম্পত্যের ভিত্তির ইষ্টক বসিতে লাগিল। পরে কি হইয়া দাঁড়ায়, ঈশ্বর জানেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ অন্তে আত্মীয় কুটুম্বেরা যে যাহার বাড়ী চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় যাইবার সময় অন্নদাকে বলিলেন, "মা, তোমার পুত্রটী বাঁচিয়া থাকিলে তোমার দুঃখ থাকিবে না। সে যেমনই সদ্বংশজাত, তেমনই সুবোধ। বিধাতা তোমাকে একটি রত্ন দিয়াছেন। কালে লোকে তোমাকে রত্নগর্ভা বলিবে।" স্বজনের প্রশংসা শুনিলে ব্যক্তিমাত্রেরই আনন্দ হয়। মায়ের ত আর কথাই নাই, শুনামাত্রই তাঁহার মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠে। তাহাতে আবার লক্ষ্মণ রায় মহাশয়ের মত লোকের মুখে অন্নদা আজ তাঁহার পুত্রের, সেই জয়চন্দ্রের, যাহাকে আজ দেড় বৎসর মাত্র অতীত হইল মূর্খ হইবে বলিয়া দারগাগিরী করিয়া খাইতে বিদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই পুত্রের এত প্রশংসা শুনিলেন। শুনিবামাত্র তাঁহার কঠিন মন দ্রব হইল। তিনি যে প্রাণের পতি, তৎপর নিতান্ত স্নেহের ধন ও ভালবাসার ছবিখানি হারাইয়া মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, এ জগতে আর কাহারও উপর ভালবাসা রাখিবেন না, কাহারও সুখে উল্লাসিত হইবেন না, মায়ার আবরণ দ্বারা আর হৃদয় ঢাকিবেন না, সে মনন ভাসিতে লাগিল। সঙ্কল্পের বাঁধ অতিক্রম করিয়া দ্বিগুণিত বেগে আনন্দের স্রোত বহিতে উদ্যত হইল। তিনি রায় মহাশয়কে বলিলেন, "জয় যদি ভাল হয় সে আপনার গুণে, আপনি অন্নদান, ও লেখাপড়ার নিমিত্ত অর্থ দান করিতেছেন, সে মানুষ হইলে আপনার প্রসাদেই হইবে।" এই বলিয়া তাহার চরণে প্রণাম করিলেন। অন্নদার মন আজ নিতান্ত পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত জগত যেন একটি

আনন্দধাম বোধ হইতে লাগিল। উল্লাসে হৃদয়-পদ্ম বিকশিত হইল। উমাসুন্দরীও তাঁহার পিতার চরণে প্রণিপাত করিলেন। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় বলিলেন, "মা আমি এখন আসি গিয়ে।" অন্নদা দেখিলেন রায় মহাশয়ের হৃদয়ের দুঃখাগ্নি তাঁহার কণ্ঠ অবরোধ করিয়া বাষ্পাকারে চক্ষু দিয়া বাহির হইতেছে। রায় মহাশয় আর তিলার্দ্ধ গৌণ না করিয়া চলিয়া গেলেন। উমাসুন্দরী মুখখানি ম্লান করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মাতার নিকট গেলেন। এই দৃশ্যে অন্নদার মনে সমবেদনার আঘাত লাগিল। সেই স্নেহময় ভ্রাতার কথা মনে পড়িল। হৃদয়ের অগ্নি আস্তে আস্তে জ্বলিতে লাগিল। ক্রমে সাঁ সাঁ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আনন্দস্রোত শুকাইয়া ফেলিল। হৃদয় পুড়িতে লাগিল। অসহ্য ব্যথায় সব কাল করিয়া ফেলিল। ভাবিতে লাগিলেন, পৃথিবীতে আর সুখ কোথায়? সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, যে দিকে চাও সেই দিকেই দুঃখ। তবে কেবল দুঃখ নিরাধারা বহিতে থাকিলে মানব মনে যন্ত্রণা বোধ হয় না, তাই মাঝে মাঝে কোন রকমের একটা সুখের আকৃতি ধাঁধাঁর মত সম্মুখে পড়ে, ধরিতে না গিয়া থাকা যায় না, গেলেই পলায়ন করে। এ সমস্ত ত আজ প্রায় যুগাধিক কাল পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিতেছি, তবে আর কেন? আর এ মোহ কেন? এ সুখের বিজলীতে মন কেন আর বৃথা চঞ্চল করি? তা হবে না। আর এ দুঃখের মানব জন্ম যাহাতে না হয় তাহারই চেষ্টা করিব। আমি মুক্তি জানি না। নির্ব্বাণ জানি না। জানি মাত্র শিব শম্ভুর চরণ। জানি কেবল উমা মায়ের চরণ। তাহাই ধ্যান করিব। তাহাই মনের সাধে পুজিব। দেখিব মা আমায় কোলে না নিয়ে কেমনে থাকিতে পারেন। আর যদি পাপিনী সন্তান, পাপের স্থানে আবাস বলিয়া ঘৃণা করিয়া, স্পর্শ না করেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি, লাভ আছে, শান্তি ত পাইব। অন্ততঃ

জন্মান্তরে এমন কোন স্থান পাইব, যে স্থানে রোগ শোক নাই, যে স্থানে পাপ তাপ নাই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এই সংসারের সমস্তই ছায়া জ্ঞান করিয়া একাগ্রচিত্তে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া জপে বসিলেন। দুই তিন ঘণ্টার পর তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার মাতা যেন আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। শুভ্র বসন পরিধানা, নির্ম্মল বিশুদ্ধ কান্তি, চক্ষু হইতে দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। সমুদয় অবয়ব হইতে সুগন্ধ বহির্গত হইয়া সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ করিতেছে। তিনি নিতান্ত সুমধুর হাসি হাসি মুখে বলিলেন, "মা, ভয় নাই তোমার সমুদয় যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে। আর বাকী নাই। আমি তোমার নিমিত্ত কোল প্রসারণ করিয়া রহিয়াছি।" অন্নদা চকিতের ন্যায় চক্ষু মেলিলেন, কিছু দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু তাঁহার মনে নিতান্ত শান্তি বোধ হইতে লাগিল। ধ্যান ছাড়িয়া পূজায় বসিলেন, খুব তদ্গতচিত্তে পূজা করিলেন। বিসর্জ্জন দিয়া উঠিবার সময় তাঁহার শরীরটা অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল। মাথা ঝাঁকিয়া অনুভব করিলেন জ্বরের পূর্ব্ব লক্ষণ। উমাসুন্দরীর মাতাকে বলিলেন, "জ্যেঠীমা আমি কিছু খাই না ব'লে আপনি মনে মনে বড় ব্যথা পান, আচ্ছা আপনি আমাকে আজ সুন্দর ক'রে খাওয়ান, দেখ্‌বেন আমি কত খেতে পারি। কত পরমায় খেতে পারি।" এই বলিয়া হাসিয়া হাসিয়া সকলকেই হাসাইতে লাগিলেন। উমাসুন্দরীর মাতা এইকথা শুনামাত্র তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন পাক করিলেন। অন্নদা ও উমাসুন্দরী উভয়েই খাইতে বসিলেন। অন্নদা আজ বেশ হাসি খুসিতে খুব তৃপ্তির সহিত সুন্দর মত আহার করিলেন। উভয়ের খাওয়া শেষ হইলে পর, জয়চন্দ্র ও গোপালকে ডাকিয়া আনিয়া অন্নদা বলিলেন, "জ্যেঠীমার পাক বড় ভাল হইয়াছে, সবই মিষ্টি হইয়াছে, তোমরা আমাদের পাতে ব'সে

দুটা খেয়ে নেও।" জয়চন্দ্র মাতার পাতে ও গোপাল উমাসুন্দরীর পাতে বসিয়া খাইতে লাগিলেন। অন্নদা হাসিতে হাসিতে জয়চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বাবা বল দেখি, তুমি আমাকেই বেশী ভালবাস না বৌকে বেশী ভালবাস।" জয়চন্দ্র উত্তর করিলেন, "আপনি বোধ হয় শুনিতে চাহেন যে আমি মামীমাকে বেশী ভালবাসি।" উমা ও অন্নদা হাসিতে লাগিলেন। জয়চন্দ্র বলিলেন, "আমি ঠিক মনের কথা বলি শুনুন। আমি কাহাকেও বেশী ভালবাসি না।" উমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এ সন্ন্যাসিনীর পো সন্ন্যাসী।" জয়চন্দ্র বলিলেন, "না মা, আপনারা আমার কথা বুঝিতে পারেন নাই, আমি মাকেই বেশী ভালবাসি না তোমাকেই বেশী ভালবাসি এ ঠিক করিতে পারি না। তুমিই আমার মা, না মাই আমার মা এ'টি আমি ঠিক করিতে পারি নাই।" উভয়েই হাসিতে লাগিলেন। জয়চন্দ্র আবার বলিলেন, "এই বারই ঠিক হয়েছে, এক বাপের দুই কন্যা থাকিলে ছোটটীকে বেশী ভালবাসেন, তাই আমি তোমাকেই বেশী ভালবাসি।" একথা শুনিয়া তাহারা আরও হাসিতে লাগিলেন। অন্নদা বলিলেন, "আমি তোমার মাতা, তোমাকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করিয়াছি। আমার রক্তমাংসে তোমার শরীর, আমি তোমাকে এই একটি কথা বলি, আজ তুমি যেরূপ অমৃতমাখা কথা বলিয়া তোমার মামী-মাতাকে নিজমাতা অপেক্ষা বেশী ভালবাস বলিলে, যতদিন বাঁচিয়া থাক এইরূপ ভালবাসিও এবং ভালবাসা কার্য্যে দেখাইও। এ তোমার মাতৃ-আজ্ঞা, অবহেলা করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিও না। ইঁহার মনে যেন তোমার কোন কাজ দেখিয়া ব্যথা না হয়।" উমাসুন্দরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পেটে ছেলে না হ'লে কি হয়, আমি আমার এই সোণার গোপালকে তোমায় দান করিলাম। তুমি ইহাকে নিজ পুত্রজ্ঞানে প্রতিপালন করিতে থাক।

আমি প্রকৃতই সন্ন্যাসিনী।" গোপালকে উমাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহাকে ভালবাস।" 'তোমাকে ভালবাসি।' অন্নদা বলিলেন, 'আমাকে ভালবাস না ?' 'তোমাকেও ভালবাসি।' 'আচ্ছা বেশ্ কথা।' এইরূপ কথাবার্ত্তায় খাওয়া শেষ হইয়া গেল। অন্নদা আঁচাইবার সময় উমাকে বলিলেন, "তুমি এখনই আমার ঘরে একবার যেও আমার একটু কাজ আছে।" কিছুকাল পর উমাসুন্দরী অন্নদার গৃহে প্রবেশ করিলেন। অন্নদা এ কথা সে কথা, মাতা তাঁহাকে কি কি ব্রত নিয়ম করিতে বলিয়া গিয়াছেন, তাহার কথা, বলিয়া তাঁহার মন ভুলাইয়া বলিলেন, "দেখ বৌ তোমাদের সংসারে কোথায় কি টাকাকড়ি আছে, তাহা তুমি কিছুই জান না। এ সকল কথা তোমার জানা উচিত। রামশরণ বিবাহ করিয়াছে এখন এগুলি আমার হাতে থাকা উচিত নহে।" উমা বলিলেন, "আমি উহা রাখিতে পারিব না।" "আচ্ছা না পারিলে কোথায় কি আছে জানিলে দোষ কি ?" এই বলিয়া একখানি দা দ্বারা তিনি যে স্থানে বসিয়াছিলেন সেই স্থানটা খুঁড়িতে লাগিলেন। হাত কয়েক খুঁড়িয়াই একটি বড় রকমের ঘটি উঠাইয়া আবরণ খুলিয়া ছোট ছোট দুইটী কৌটা উহার মধ্য হইতে উঠাইলেন। একটি খুলিয়া বলিলেন, "এই এক কুড়ি পাঁচ খান মোহর। মা আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, বাবা এইগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আর এই কৌটায় দেখ দশটি আকবরী মোহর। এই মোহর কয়েকটি আমার দাদাশ্বশুর কুলমর্য্যাদার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজনগরের রাজাদিগ হইতে পাইয়াছিলেন। আর দেখ, এই ঘটির মধ্যে একশত সাবেকী ও ছয়শত কোম্পানির টাকা আছে। আরও পাঁচশত ছিল, তাহা বাবা ও মাতার শ্রাদ্ধের সময় খরচ হইয়াছে। ইহা বই ঘরে আর টাকা নাই। রামতারণ ও রামশরণ যে টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহা এই বিবাহে খরচ হইয়া গিয়াছে। দুই একশত যাহা

আছে তাহা ঐ পেটরাটির মধ্যে আছে।” এই বলিয়া পেটরাটি খুলিয়া বলিতে লাগিলেন—“এই বাসমণ্ডল শাড়ীখানি আমার শাশুড়ী ঐ রাজাদের বাড়ী পাইয়াছিলেন। আমি, কয়েক দিন পরিয়াছি, কেমন উত্তম জিনিস, দেখ এতকাল হইয়াছে তবু ঠিক নূতনের মতই আছে। এই জামিয়ারখানা আমার স্বামী গায় দিতেন। জয়চন্দ্র এখন বড় হইয়াছে, এখন সেই গায় দিবে।” এই বলিয়া সেইখানা বাহির করিলেন, আর একটা বোচকা হইতে একখানা মোটা রকমের সাদা চাদর বাহির করিলেন, এবং শীত বোধ হইতেছে বলিয়া হাসিতে হাসিতে গায় দিলেন। উমাসুন্দরী একটু হাসিয়া বলিলেন, “আপনাকে এখন বেশ দেখায়।” অন্নদা “থাম, আরও আছে” বলিয়া এক যোড়া খড়ম বাহির করিলেন এবং বলিলেন—“কেমন, এখন পায় দিলেই ত হয়। মাথায় চুল নাই, দাড়ি গোঁফ ত আপনা আপনিই কামান আছে।” এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে পেটারা বন্ধ করিলেন। আবার তাড়াতাড়ি খুলিয়া একগাছি চুলের দড়ি বাহির করিয়া, উমাকে বলিলেন—“এ গাছি মা’র মাথার চুলের, নিবে?” তিনি বলিলেন, “এখন আমার নিকটেও আছে।” “আচ্ছা তবে এখানেই থাকুক” বলিয়া অন্নদা পেটারা বন্ধ করিলেন। উমা বলিলেন, “খড়ম যোড়া রাখিলেন না, এত বড় খড়ম জয়চন্দ্রের পায়ে মানাইবে না।” অন্নদা বলিলেন, “পেটারা বন্ধ করিয়াছি। বার বার খুলিতে ভাল লাগে না।” এইরূপ বলিয়া উমার মাথায় বার বার হাত বুলাইয়া নানারূপ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। উমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি কাশীবাসী হইতে চাহেন? তা হবে না, আমাকে খালি বাড়ীতে রাখিয়া, আপনি কোথাও যাইতে পারিবেন না। জয়চন্দ্রের বৌ না দেখে কোথাও যাইতে দিব না।” অন্নদা বলিলেন, “না, আমি কোন তীর্থে যাইব না। অনেক দিন পাড়া বেড়াই না, পা’টা

হাটুতে না পেয়ে কাঁদছে।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে পাড়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। উমাসুন্দরী কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিরস মনে চলিয়া আসিতেছিলেন, গোপাল আসিয়া তাঁহাকে ধরিল, তিনি সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, তখন অন্নদা জ্বরের অন্তর্জ্বালাতে অস্থির ছিলেন।

জয়চন্দ্র দুই এক দিনের মধ্যেই বাড়ী হইতে যাইবেন। তাঁহার মনটা বড় ভাল লাগিতেছিল না। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মাতুল মহাশয়ের নিকট গিয়া বসিলেন। তিনি বিবাহে গিয়া শ্লোক বিচারে জয়ী ও সকল প্রকার লোকের সহিতই বিনয় ও শিষ্টতার সহিত আলাপ করিয়া প্রত্যেকেরই প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। ইহাতে রামশরণের বড়ই আনন্দ বোধ হইয়াছিল। গুণে লোক মাত্রকেই মিঠা করিয়া তুলে, সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করে। জয়চন্দ্রের সকলই এখন রামশরণের নিকট বড় মিঠা বোধ হইতেছিল। তিনি তাঁহাকে নিয়ে এখন অনেক সময়েই নীতিপূর্ণ আলাপ করিয়া হর্ষে কাল কাটাইতেন। কোন কথার প্রসঙ্গে জয়চন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি বুঝিতে পারি না, বিবাহের দিন সভাতে সকলে আমাকে এত সমাদর ও সম্মান করিল কেন? দেবনাথ চৌধুরী মহাশয় নিতান্ত প্রবীণ লোক, তাঁহার মত আর আর অনেকেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। অন্য অন্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই আমা অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ, বুদ্ধিমান ও বিদ্বান। আমি না বসিলে অন্য কেহ বসিলেন না কেন? এতগুলি বড় বড় লোককে দাঁড়ান দেখিয়া আমার নিতান্তই লজ্জা বোধ হইয়াছিল। ইহার কারণ কি?" রামশরণ বলিতে লাগিলেন, "পূর্ব্বকালে যখন এই দেশে হিন্দু রাজা ছিলেন, তখন আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, নিষ্ঠা, তপ, দান প্রভৃতি নয়টী গুণের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এই নয় গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি-

দিগকে সমাজে উচ্চস্থান প্রদান করা হইত। সকলেই এই নয় গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সম্মান করিত। তোমার পূর্ব্বপুরুষ এই নয় গুণবিশিষ্ট ছিলেন বলিয়া বৈদ্যজাতির মধ্যে সমাজে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেরূপ উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বজায় রাখিবার নিমিত্ত তোমার অনেক পুরুষ ঐ গুণবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। কালে হিন্দু রাজত্বের অবসান হয়। এ দেশ মুসলমান অধিকারে আইসে। তাঁহাদের আচার রীতিনীতি ও ধর্ম্ম বিভিন্ন। অনেক হিন্দু রাজপ্রসাদ পাওয়ার নিমিত্ত আত্মজাতীয় সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া ম্লেচ্ছ আচারের বশবর্ত্তী হয়। রাজ-সম্মান অভাবে কৌলীন্যপ্রথার এখন নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। সুতরাং ঐ নয় গুণেরও এখন উৎকর্ষ নাই। বিনয়ের পরিবর্ত্তে ঔদ্ধত্য, বিদ্যার স্থলে মূর্খতা, শান্তিস্থলে অশান্তি, ধর্ম্মের স্থলে অধর্ম্ম আসিয়া সমাজ অধিকার করিতেছে। প্রকৃত কৌলীন্য এখন নাই। তবে যে একটু সম্মান আজও বর্ত্তমান আছে, সে কেবল সেই মহাপুরুষগণের তপস্যার ফলে। সৎকার্য্যের এমনই আশ্চর্য্য ফল যে অপাত্রে অর্পিলেও একবারে বিলীন হইয়া যায় না। আমি আশা করি তুমি উপরি উক্ত নব গুণের উৎকর্ষ সাধন করিয়া তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের অক্ষয় কীর্ত্তি চিরস্থায়ী রাখিতে আজীবন চেষ্টা করিবে তোমার মনে যেন সর্ব্বদা এই ভাবটুকু জাগরূক থাকে যে, তুমি যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ সে কুল কোন দিন সর্ব্বাংশে সমাজের সর্ব্ব উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। কুলীনের বংশধর বলিয়াই তুমি সে দিন এ সম্মান পাইয়াছিলে।" এইরূপ আলাপ করিতে করিতে অনেক রাত্রি হইলে উভয়েই যাইয়া শয়ন করিলেন। জয়চন্দ্র উমাসুন্দরীর নিকটই শয়ন করিতেন। উমাসুন্দরী ও তাঁহার মাতা শয়ন করিয়া নানাবিধ আলাপের পর, উমাসুন্দরী জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দীনেশ ও গণেশ তোমাকে ভালবাসে ত? আমার সম্বন্ধে তাহারা কোন

কথা কয় কি ?" জয়চন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "তাঁহারা আমাকে কোন কটু কথা বলেন না। যাহা দেখা যায় তাহাতে বোধ হয় আমাকে ভালই বাসেন। কিন্তু আমি যে দিন আপনাদের বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সেই দিন একটা কথা শুনিয়া আমার বড়ই ঘৃণা হইয়াছিল। আমি যদি গরীবের ছেলে না হইতাম, আমার যদি অন্য কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় আপনাদের বাসায় থাকিতাম না। গরীবের আবার মান অপমান কি। তাহাতেই মিলে মিশে মুখ বুঁজিয়া রহিয়াছি।" উমাসুন্দরী কিছু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি ? তাহারা কি তোমাকে কটু কথা বলিয়াছিল ?" "না মা তা নয় ? আমাকে তাঁহারা যত্ন করিয়াই থাকেন।" "তবে কেন অমন কথা বল ?" জয়চন্দ্র বলিলেন, "মা, আমি যে দিন সে বাসায় যাই, সেই দিন কোন কথার উপরে দীনেশ মামা বলিয়াছিলেন 'আমাদের ভাত কত শেয়াল কুকুরে খায়, আমাদের টাকায় কতজনের শ্রাদ্ধ হয়।' তবে আমরা কি শেয়াল কুকুর ?" উমাসুন্দরীর মাতা শুনিয়া বলিলেন, "ওদের দুই ভাইয়েরই এইরূপ ছোট লোকের নজর হইয়াছে। হিংসাতে এখনই উহাদের মন পোড়া, বড় হইলে যেন কি হ'য়ে দাঁড়ায়। তা যাক্, তোমার উহাতে মনে ব্যথা পাইয়া দরকার কি ? ওরা ত আর তোমাকে খেতে দেয় না ? ঠাকুরপোরা ত তোমাকে কিছু বলেন নাই ?" "না তাঁহারা আমাকে বড় ভালবাসেন, বড় যত্ন করেন।" উমা বলিলেন, "তবে আর তোমার ভাবনা কি ? উহারা যখন উপার্জ্জন করিবে, তখন তুমি উহাদের ভাত খেও না। তা'হলেই হবে। আচ্ছা উহারা ত আর কিছু বলে নাই ?" জয়চন্দ্র বলিলেন, "দীনেশ মামা ব'লেছেন যে, দাদা মহাশয় নাকি আপনাকে গোপনে কতকগুলি টাকা দিয়াছেন।" এই কথা শুনা মাত্র উমাসুন্দরী, "ওমা একি কথা," বলিয়া মাতার দিকে চাহিয়া চক্ষের জল

ছাড়িয়া দিলেন। উঁহার মাতা বলিলেন, "হাঁ, এখন বুঝিতে পারিলাম। উমা, মা, তুমি এ কথাতে কাঁদ কেন? তোমাকে টাকা দিলে গোপন করিব কাহার ভয়ে। আমার নিজ অংশেই আট নয় হাজার টাকা বছর বছর আয় হয়। আমার তুমি বই আর সন্তান নাই। ইচ্ছা করিলে আমি সমস্তই একজন পথের লোককে দিয়া যাইতে পারি। তুমি ত আমার পেটের সন্তান। এখন বুঝিলাম বিষয়টা কি। আমি শু'নেছিলাম নায়েবের নিকট ওরা দুই ভায়েই গোপনে কি যেন একখানা চিঠি লিখে। নায়েব নিতান্ত বিশ্বাসী বলিয়া কর্ত্তাকে ঐ চিঠি দেখায়। তাহাতে তিনি নিতান্ত রাগ করেন। এই কথা নিয়ে মেজবউ ছোটবউ একযুটী হইয়া সর্ব্বদাই ছুতায় নাতায় আমাকে নানারূপ জ্বালা দিতেছে। আমার প্রতি কাজেই হিংসা করিতেছে। আমি কত সাধ্যি সাধনা করিলাম, তাতেও তাঁহারা কেহই এ বিবাহে আসিল না। আমাকে বলে যে তাহাদের কোন ছেলেই আমাকে পোষ্য-পুত্র করিয়া দিবে না। মা, পুত্র হওয়া আমার বরাতে নাই। পরের ছেলেকে, পরের গোপালকে কাড়িয়া আনিয়া নিজ পুত্র বলিলে কি সুসার হইবে? আমি কোন দিনও উহা চাই নাই। আমি একপয়সাও বৃথা ব্যয় করিতেছি না। মনে মনে সর্ব্বদাই এই বাসনা করিয়া আসিতেছি, শ্বশুরের সম্পত্তি যেন তাঁহার পিণ্ডদাতারাই পায়। খগেশ কি রমেশ আমার পোষ্যপুত্র হইলে বেশী লাভ কি? উহাদের কা'রইত আমার রক্ত মাংসে শরীর হয় নাই। তাহারা এখনও যে ভাবে আমায় পিণ্ড দিবে, বড় হইলে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেও সেই ভাবে দিবে। লাভের মধ্যে এই যে এ অবস্থায় পূর্ণ অশুচি গ্রহণ করিবে, পোষ্য হইলে তিন রাত্রি মাত্র। আমি উহাদের মাতৃকুলের পিণ্ড লোপ করিব কেন? আমার মনে যদি অন্য কোনরূপ ভাব থাকিত, অন্য ঘরের ছেলে কিনে আনিতাম। তাহাতে

আমাকে কেহই বাধা দিতে পারিত না। আমার পোড়া অদৃষ্ট তোমার কোলে সোণার চাঁদ দেখিতে পাইলাম না।"—এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উমাসুন্দরীও কাঁদিতে লাগিলেন। জয়চন্দ্র মনে বড় ব্যথা পাইলেন, তিনিও চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। উমাসুন্দরী তাহাকে চক্ষের জল ফেলিতে দেখিয়া, তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "বাবা, কেঁদ না, তুমিই যে আমার পেটের ছেলে। আমার দুঃখ নাই। তোমারই বা ভাবনা কি? ভগবান তোমার লেখাপড়ার যোগাড় করিয়া দিবেন। খুড়া মহাশয়েরা আমাকে নিতান্ত স্নেহ করেন। নিজ সন্তানের মত দেখেন। যে দিন দেখিব তাঁহাদের ভালবাসা কমিয়াছে, সেইদিন মায়ের হাতের এই সোণার কঙ্কণ ও গলার মালা ভিক্ষা করিয়া লইয়া আমার ছেলে মানুষ করিব। মায়ের নিজ সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার। ইহা লইলে অধর্ম্ম নাই।" জয়চন্দ্র উদাস মনে এই কথাগুলি শুনিলেন।

স্বার্থ কি ভয়ানক বিষ! ইহা হৃদয়ে প্রবেশ করিলে আপন পর হয়। অনর্থ অর্থজ্ঞান হয়। প্রীতি, শ্রদ্ধা, সারল্য, অমায়িকতা, দয়া, দাক্ষিণ্য সদ্‌গুণগুলি পলায়ন করে। কুটিলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, ছলনা, নির্দ্দয়তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। শান্তি ডুবিয়া যায়। অশান্তির তরঙ্গে মানব হৃদয় সদা আলোড়িত হয়। লক্ষ্মণ রায় মহাশয়ের পরিবারে এই স্বার্থ-বিষ প্রবেশ করিয়াছে। তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তবে তাঁহার চতুর্থ কাল, পুত্রসন্তানরূপ ভববন্ধন-মুক্ত বলিয়া এই বিষ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে পারিতেছে না; পারিতেছে না বটে কিন্তু প্রতি আক্রমণেই তাঁহার হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিতেছে। এখন পর্য্যন্ত অসহনীয় হইয়া উঠে নাই, কারণ তাঁহার বাম অঙ্গ দক্ষিণ অঙ্গ তুল্য বলিষ্ঠ।

উমাসুন্দরী, তাঁহার মাতা ও জয়চন্দ্র অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এইরূপ হৃদয়-বিদারক আলাপ করিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া ফেলিয়া হৃদয় পাতলা

করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। পরদিন উঠিতে সকলেরই দেরী হইল। উমাসুন্দরী জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন সূর্য্য প্রায় উদিত হইতেছে। অন্নদা দিদী মন্দ বলিবেন ভয়ে তাড়াতাড়ি তাঁহার গৃহের নিকট গেলেন। গিয়া দেখিলেন দ্বার অবরুদ্ধ। ইহাতে মনে মনে আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। তাড়াতাড়ি উঠানে গোময়ের ছড়া দিয়া অন্য অন্য কাজ করিতে লাগিলেন। বেলা প্রায় দণ্ডেক হইল, তবু অন্নদার গৃহের দ্বার খুলিল না। ইহাতে তিনি নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া তাঁহার মাতার নিকট বলিলেন, তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং ব্যস্ততার সহিত ঐ ঘরের সম্মুখে আসিয়া "অন্নদা, অন্নদা" বলিয়া বারংবার ডাকিতে লাগিলেন। গৃহ হইতে অতি মৃদু ও কাতরস্বরে অন্নদা উত্তর করিলেন, "মা, আমি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, উঠিয়া দ্বার খুলিবার শক্তি নাই।" গোলমাল শুনিয়া রামশরণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি অতি কষ্টে বাহির হইতে দ্বার খুলিলেন। সকলেই অস্থির চিত্তে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অন্নদা তাঁহার স্বামীর সাদা মোটা চাদরখানি গায় দিয়া খড়ম যোড়া শিয়রে করিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। মালাটী বুকের উপর রাখিয়া নিমীলিত নয়নে জপ করিতে-ছেন। রামশরণ, উমাসুন্দরী, জয়চন্দ্র তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন। রাম-শরণ নিকট যাওয়া মাত্রই তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "একটু থাম।" সকলেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি ক্ষণকাল পরেই হস্ত দু'খানা চাদরের নীচ হইতে কষ্টে বাহির করিয়া জয়চন্দ্রকে নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। জয়চন্দ্র অবসন্ন হৃদয়ে তাঁহার নিকটে গেলেন। তিনি তাহার মস্তকে মালাটী ছোঁয়াইয়া উহার দিকে চাহিলেন, তিনি যাই তাঁহার মুখের কাছে মুখ নিলেন অমনি "আমি চলিলাম" বলিয়া মালাটী তাঁহার হাতে দিলেন। সকলে কাঁদিয়া উঠিল। রামশরণ তাড়াতাড়ি হাত ধরিয়া নাড়ীর গতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, কিছু অনুভব করিতে না পারিয়া

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অন্নদা বলিলেন, "তুমি আমাকে এখন বিষ প্রয়োগ করিও না, ইহাতে কোন ফল হইবে না। আমি বিষপান করিয়া এ পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে চাহি না। বৈদ্যের ঔষধ না খাইলে গতি হয় না। কোন একটা ঔষধ দেও, বেশী পরিমাণ দিও না, তল করিতে পারিব না। আমার সমুদয় অঙ্গ ছাড়িয়া আসিতেছে, আর দেরি নাই।" সকলেই কাঁদিতে লাগিল। রামশরণ একটা বড়ী দিলেন, অন্নদা অনেক কষ্টে খাইলেন। অন্নদা উমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার জয়চন্দ্র-কে তো-মা-কে দি-য়া-ছি, তো-মা-র-ই পে-টে-র ছে—।" এই বলিতে বলিতে চক্ষু স্থির হইল। সকলে কাঁদিয়া উঠিল, ধরাধরি করিয়া বাহির করিয়া তুলসীতলে রাখিল। প্রাণ-বায়ু উড়িয়া গিয়া অনন্ত বায়ুতে মিশিল। দেহপিঞ্জর পড়িয়া রহিল। রামশরণ বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। উমাসুন্দরীর মাতা গলিত নয়নে সকলকে আবরণ করিয়া রাখিতে লাগিলেন। অন্নদার মৃতদেহ চিতায় ভস্মীভূত হইল। রামশরণ ও উমাসুন্দরী এতদিনে প্রকৃত সহায়-হীন হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অচিরে দেশের অরাজকতা অনেকটা দুর করিতে সমর্থ হইলেন। লোকে কিছু কিছু শান্তি বোধ করিতে লাগিল। ইংলণ্ডেশ্বর এই শুভ বর্ত্তাতে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। কোম্পানিকে যশের সহিত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে দৃঢ় আদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। নব সংস্থাপিত বিশেষতঃ উচ্ছৃঙ্খল রাজ্য বজায় রাখার মূল প্রজার মনোরঞ্জন করিয়া বশবর্ত্তী করা; একমাত্র বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা এই উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়, সুতরাং রাজপুরুষগণ জেলায় জেলায় বিদ্যালয় সংস্থাপন দ্বারা পাশ্চাত্য শিক্ষার সোপান স্থাপন করিতে লাগিলেন। প্রতিজাতির ভাষাতেই জাতীয় ধর্ম্মগত ওতপ্রোতভাবে নিহিত থাকে। পরকীয় ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিত ভাবে ঐসমস্ত ধর্ম্মের ভাব হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া নিজ ধর্ম্মের মূল ধীরে ধীরে শিথিল করিয়া পরিণামে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল করিয়া তুলে। তখন নিজের আচার রীতি নীতি সবই অসার বোধ হয়। অভ্যস্ত ভাষায় যে যে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেয় তাহাই সার বলিয়া বোধ হয়। কাজেই জাতীয় বল ক্রমে ক্রমে নাশ হইয়া যায়। একারণে দীনেশ ও গণেশ নানারূপ ইংরেজী পুস্তক পড়িয়া জাতিভেদ যে কিছু নয়, তাহা স্বতঃই বুঝিয়া ফেলিলেন। রুটী, ভাত হইতে অনেক অংশে বলকারী, মুরগীর মাংসে অনেক সার আছে, প্রত্যহই অ্যানিমল্ ফুড খাওয়া উচিত, আমরা কেন খাব না? সলিম সেখও মানুষ, আমরাও মানুষ, সে যাহা রাঁধে তাহা আমরা খাইব না কেন? কি কুসংস্কার! দুই

ভাইয়েই এইরূপ অনেক আলাপ করিয়া থাকেন। কেবল পিতার ভয়ে, ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না। নকড়ি উভয় ভাইয়েরই বড় প্রিয় খানসামা। তাঁহারা যাহা বলেন, সে তাহাই করিয়া থাকে। নানারূপ মিথ্যা আলাপ করিয়া তাঁহাদের মনোহরণ করিয়া বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। একদিন গণেশ বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আচ্ছা নকড়ি, তুমি আমাদিগকে পাঁওরুটী খাওয়াইতে পার?" নকড়ি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "এ নকড়ি না পারে এমন কাজ নাই, পাঁওরুটী কেন, যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে বড়টা এনেও খাওয়াইতে পারে। তবে এ গরীবের প্রতি আপনাদের একটু দয়া থাকিলেই হয়।" এই কথা শুনিয়া উভয়েই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, কি চমৎকার কথা, এ লেখা পড়া শিখে নাই তবু ইহার কুসংস্কার নাই। প্রকাশ্যে বলিলেন, "এখন বড়টার কাজ নাই। রুটী হ'লেই হবে। আচ্ছা বল দেখি কেমন করে আন্‌বে।" "কেন, এতে আর কষ্ট কি? কর্ত্তা-মহাশয়ের একটা ছেঁড়া চাপকান গায় দিয়ে, ছ'পয়সার একটা তাজ মাথায় দিয়ে গেলেই ত হবে; তবে এ মালাটা ফেলে দিতে হবে।" নকড়ি এই বলিয়া গলার মালাটা খুলিয়া ফেলিল। উভয়েই নকড়ির বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাহার হাতে একটি টাকা দিলেন। সে সন্ধ্যা হওয়া মাত্রেই উপরিউক্ত সাজে সাজিয়া এক আনা দিয়া একটী রুটী ও আধ আনার চিনি আনিয়া অতি সঙ্গোপনে ঘরে প্রবেশ করিল। তাঁহারা খাইতে লাগিলেন। ঘরে অন্য কোন লোক আসে কি না তাহার সংবাদ দিবার নিমিত্ত নকড়ি দ্বারে প্রহরী রহিল। ঘরের পিছনে যেন কিসের সাড়া শব্দ পাওয়া গেল, উভয় ভ্রাতাই সভয়ে তাড়াতাড়ি মুখ মুছিয়া রুটীর অংশ কাগজ দিয়া মুড়িয়া বিছানার নীচে রাখিয়া, উঁকি দিয়া দেখিলেন, একটী বিড়াল শুষ্ক পত্রের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে। উভয়েরই

ঘামদিয়া জর ছাড়িল। কুকর্ম্ম নিতান্ত সংগোপনে করিলে, মনুষ্য দেখিতে না পাইলেও নির্জ্জীব পদার্থ চেতনা পাইয়া ভয় দেখায়। তাহাতেও মনে অব্যক্ত অশান্তি জন্মে। উভয়েরই রুটী খাওয়া হইল। দীনেশ ও গণেশ অদ্য হইতে পূর্ব্বপুরুষগণের বহু চিন্তার ফল, জাতীয় একতার মূলের কিয়দংশ দন্তে কাটিয়া পোড়া উদরে পুরিয়া পুরীষে পরিণত করিতে লাগিলেন। এইরূপ দিন দিনই চলিতে লাগিল। ক্রমে ভয় হ্রাস হইতে লাগিল। কথনও ফুলবাগানের নিভৃত কুঞ্জবিতানে কথনও বা নদীর ধারে পোস্তার উপর বসিয়া, কথনও বা রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে থাইতে লাগিলেন। এথন আর নকড়ির সাহায্য লাগে না, নিজেরাই আনেন। পকেট প্রায় বিস্‌কিট ছাড়া থাকে না। জয়চন্দ্র আসাতে মনে কিছু সন্দেহ করিয়া গোপনেই খাইতেন। তাঁহার বাড়ী যাওয়ার পর নকড়ি দাদার সাহায্যে রাত্রিকালে বেশ্ করে মুরগীর ঝোল, অজানামাংসের কবাব দ্বারা উদর পূরণ হইতেছে। নকড়িও সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদ পাইতেছে। যুগল রায় মহাশয় ইহার কিছু জানিতে পারিতেছেন না। তিনি এক দিবস বিকাল বেলা ফুলবাগানে বেড়িয়া বেড়াইতেছেন, সহসা একখণ্ড রুটীর ছিল্‌কা দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "রাম রাম, একি?" নকড়ি হুঁকাটি হাতে করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁটিতেছিল। সে শুনা মাত্র বলিয়া উঠিল, "হু'বেটা নেড়ে আজি বেলা চারিটার পর পুকুরের ধারে ঐ ঝাউ গাছের তলে ব'সে অথাদ্য খাইতেছিল। বোধ হয় কাকে এনে তাহার কিছু এথানে ফেলেছে। নেড়ে বেটাদের উচ্ছিষ্ট জ্ঞান নাই, আমি এথনই এগুলি ফেলে দিয়ে স্নান করে আসি।" এই বলিয়া হুঁকাটী তাঁহার হাতে দিয়া ডান হাতে নাক ধরিয়া, বামহাতের দুটী অঙ্গুলিদ্বারা রুটীর ছিল্‌কাথানা উঠাইয়া দূরে ফেলিয়া দিল। গোবর গুলিয়া ঐ স্থানে ঢালিয়া দিয়া স্নান করিয়া আসিল। আসিবার সময়

বলিল "রাম রাম! আমার আজ খাওয়া হবে না। ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমায় একটু গঙ্গাজল দিন।" যুগলরায় মহাশয় নিতান্ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। নকড়ির এই ভাব যুগলরায় মহাশয়ের মনে ফের্জ্‌লেমি বোধ হইল। সন্দেহ হইল বটে, কিন্তু কে দুঃখের চিন্তা মনে আনিতে চাহে? তিনি অন্যদিকে মন ফিরাইয়া ঘরে আসিয়া জপ করিতে বসিলেন। দীনেশ ও গণেশ বাবু কর্ত্তা মহাশয় বাগানে যাইয়া পাঁওরুটীর ছিলকা দেখিতে পাইয়াছেন শুনিয়া, নানারূপ ভয়ের ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত করিতেছিলেন। নকড়ির বুদ্ধির তাৎপর্য্যে রক্ষা পাইলেন বলিয়া তাহার নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ হইলেন। কি আশ্চর্য্য, জন্মদাতা পিতা, যাঁহার প্রসাদে এই পৃথিবীর সুখ সম্ভোগ করিতেছেন; যাঁহার আশ্রয়ে পালিত হইয়া বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছেন; যিনি সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী,—এমন মূর্ত্তিমান দেবতার হৃদয়ে যে কাজে ব্যথা না দেয়, তাহার দিকে দীনেশ বাবুর মন গেল না। মন গেল শঠ, মিথ্যাবাদী চোরের দিকে। কাল, তুমি কি এতই অতল তলে ডুবিয়া গিয়াছ? তোমাকেই বা কেন বৃথা দোষি? কলিতে "নীচাগত মহত্বম্।"

এইরূপে কাল চলিতেছে, ইতিমধ্যে জয়চন্দ্রের পত্র আসিল যে তাঁহার মাতার বিয়োগ হইয়াছে। তিনি আরও তিন সপ্তাহ কাল আসিতে পারিবেন না। তিনি মাতার নিমিত্ত নানাবিধ শোকপ্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। দীনেশ বাবু পত্রখানি পড়িয়া একটু বিষন্ন হইলেন। গণেশ বলিলেন, "কি আপদ, আমাদের টাকাগুলি আর থাকিবে না। রামশরণ সেনের বিবাহের নিমিত্ত জিনিশ পত্রে এখান হইতে কত টাকার গিয়াছে। জ্যেঠা মহাশয় যে কত টাকা দিয়াছেন তাহার ত সংখ্যাই নাই। এ আবার কুলীনের ছেলের মায়ের শ্রাদ্ধ পড়িল। এতে দানসাগর না হ'লে চলিবে না। এবার প্রায় হাজার

টাকা বাহির হইয়া যাইবে। এ "ওল্ডফুল"দিগকে গলাটিপে মারিতে ইচ্ছা হয়। শ্রাদ্ধ আবার কি? মরে গেছে আপদ চুকে গেছে। সুসভ্য ইংরেজ-জাতি এইরূপ বৃথা কার্য্যে অর্থব্যয় করেন না। সেদিন পুলিস-সাহেবের মেম ম'ল, সকলে কাল পোষাক প'রে মাটির দেহ মাটিতে পুঁতিয়া রাখিল। সকলেই সাদা হাতখানি দিয়ে শোক-ব্যঞ্জক ভাবে রুমাল খানা এক একবার উঠাইয়া এক এক বার চক্ষু দুটি চাপা দিয়া রাখিতে লাগিল। অসভ্যের মত হো হো ক'রে কাঁদলে না। উহারা শোকের সময় যেরূপ ভাব প্রকাশ করে, তাহাও কি অপূর্ব্ব ও রমণীয়। কেমন সুন্দর কাল পোষাক পরিয়া থাকে। সকলকেই কেমন সুন্দর দেখায়। বলিতে লজ্জা বোধ হয়, আমাদের অসভ্যজাতির মধ্যে বিবাহের সময়ও এমন সুন্দর পোযাক পরে না। সকলে বাড়ী আসিয়া শোকচিহ্ন প্রকাশ করিবার নিমিত্ত হাতে কাল রিবণ্ বাঁধিয়া রাখিলেন। কেমন অপূর্ব্ব রুচি! লোকে দেখামাত্রেই অনুভব করিতে পারে যে, উহার শোক হইয়াছে। উহাদের বুদ্ধির কি তাৎপর্য্য! শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াও নিজের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সাদা কোটের আস্তিনের উপর কাল রিবণ্ বাঁধিলে কেমন সুন্দর দেখায়! আমার ইচ্ছা হয় আমি সর্ব্বদাই ঐরূপ বাঁধিয়া রাখি। আর দেখ, অসভ্য হিন্দুদিগের কেমন অসভ্যতা! একটা অসভ্য অশিক্ষিত স্ত্রী ম'ল, সকলে অসভ্যের মত হো হো ক'রে কাঁদিতে লাগিল। কেবল কাঁদিল না,—মাথা কুটিয়া, বুকে আঘাত করিয়া অসভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। মরাটাকে একটা চটদ্বারা বেঁধে কাঁধে ক'রে নিয়ে আগুণে পুড়িয়া ফেলিল। মাটির দেহ মাটিতে মিশাইল না। আগুণে পোড়ায় কেন? মানুষের শরীর কি আগুণে হইয়াছে যে আগুণে মিশাইল? এতেও অসভ্যতার শেষ হইল না। ছেলেটাকে ধরে এনে কাচা পরাইয়া বিনা সুনে একবেলা

শুধু ভাত খাওয়াইতে লাগিল। আত্মীয় স্বজনেরও গো-ছাগের আহার নিরামিষ খাইতে হইল। কয়েক দিন পরে সকলে দাড়ি গোঁফ ফেলে সং সাজিলেন। ছেলেটার মাথায় একটা কুমড়ার বোঁটা রাখা হইল। যেমন কুমড়ার জাতি, তেমনি রীতি। এই গেল শারীরিক দুরবস্থার কথা। তারপর ব্রাহ্মণ বেটাদের ষড়যন্ত্রে শ্রাদ্ধ করা হইল। শ্রাদ্ধ ত নয়, অর্থের শ্রাদ্ধ। কিরূপ অসভ্যতায় দেশ ঢাকিয়াছে! এসব ভাবিলেও অসভ্য হইতে হয়। দাদা! যেরূপ অসভ্য, সে সেইরূপ কাজ করুক, তাতে আমাদের ক্ষতি নাই, কিন্তু এই সমস্ত কুকাজে যে আমাদের টাকাগুলি যাইতেছে ইহাতে দুঃখ আর মনে ধরে না।" দীনেশ বাবু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তাইত ভাই! কিন্তু ইহার কোন উপায় নাই। নায়েবের নিকট যে চিঠিখানা লেখা হইয়াছিল তাহাতে ভাল ফল ফলে নাই। নায়েব না কি আমাদের ঐ চিঠিখানা জ্যেঠামহাশয়কে দেখাইয়াছিল। তাহাতে তিনি না কি বড় চ'টেছেন। রাগ ক'রে নাকি বলেছেন যে, আমরা এরূপ ব্যবহার করিলে তিনি তাঁহার অংশ মত সমুদয় সম্পত্তি নারায়ণ সেবার নিমিত্ত ব্রহ্মোত্তর দিয়ে যাবেন। আর যে কয়েক হাজার টাকা তাঁহার হাতে আছে তাহা সমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলিবেন। এই রাগের উপরই না কি তিনি রামশরণ সেনের বিবাহে প্রায় হাজার টাকা নিজ তহবিল হইতে ব্যয় করিয়াছেন। দিদিকে গোপনে টাকা দেওয়া কথাটা না কি মিথ্যা।" নকড়ি এই সময়ে তাঁহাদের নিকট বসিয়াছিল, এই কথা শুনামাত্র তাহার হৃদয় শুকাইয়া গেল। সে অমনি বলিল, "না বাবু, ও কথা ঠিকই, আমি স্বচক্ষে তাঁহাকে কতবার গোপনে টাকা নিয়ে ভবদ্বীপ যেতে দেখেছি। আমি কি আপনাদের নিকট মিথ্যা কথা বলেছিলাম? এ কি মিথ্যা হ'তে পারে? আমার মিথ্যা বলার দরকারই বা কি। আপনাদের মুখে যেদিন শুনেছি যে সাহেব লোক মিথ্যাবাদীকে

বড় ঘৃণা করে, সেই দিন হইতেই আমি মিথ্যা বলি না। আচ্ছা গণেশ বাবু, আপনি বলুন দেখি, আমি কোন্ দিন আপনাদের নিকট মিথ্যা কথা বলেছি, তবে যে আপনাদের রুটী প্রভৃতি আনিয়া দিতে ও আপনাদের খাওয়ার কথা গোপন রাখিতে চালাকি ক'রে থাকি, তাকি আপনারা মিথ্যা ভাবেন? আপনাদের নুন খাই তাইতে ওরূপ করিয়া থাকি।" এই বলিয়া নকড়ি দর দর ধারে চক্ষের জল ছাড়িয়া দিল। গণেশ বলিলেন, "প্রিয় নকড়ি, তুমি কেঁদ না। আমি জানি তুমি খুব সাচ্চা লোক।" দীনেশ ভাবনাযুক্ত ছিলেন বলিয়া এ সব কথায় কাণ না দিয়া বলিলেন, "জ্যেঠা মহাশয়কে ঝোঁকা বাঁকি দিয়ে আর কাজ নাই। উহারা তিন ভাইয়েই নিতান্ত গোঁয়ার। হয়ত একটা কাণ্ড কারখানা ক'রে ফেল্‌বেন। কে জানে যদি জ্যেঠা মহাশয় একটা পোষ্যপুত্রই রাখিয়া ফেলেন।" গণেশ বলিলেন, "সে গুড়ে বালি। আমি বেশ্ ক'রে মা ও মেজ জ্যেঠীমাকে পড়িয়ে রেখেছি, আমাদের কোন ভাইকেই তিনি পোষ্য পাইবেন না।" দীনেশ বলিলেন, "তাতে কি? ইচ্ছা করিলে পরের ঘরের ছেলে কিনে আনিতে পারিবেন। নিজের ভাইয়ে এত বড় অংশের অধিকারী হইলে বরং ভালই।" ইহাতে গণেশ বলিলেন, "আমার বড় দুঃখ বোধ হইতেছে যে, আপনি লেখাপড়া শিখেও সুসভ্যজাতিরা যে রূপ স্বার্থ সম্বন্ধে বদ্ধপরিকর, তাহা এখনও হয়েন নাই। এক ভাইয়ে এক তৃতীয়াংশ পাইবে, আর আমরা আর তিন ভাইয়ে দুই তৃতীয়াংশ পাইব, এ কি হ'তে পারে?" ইহাতে দীনেশ কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি বুঝ না, বৃথা কথা কও, পরের ছেলে আনিলে যে আরও কম পাওয়া যাবে।" এই কথাতে গণেশ বাবুর চৈতন্য হইল। তিনি বলিলেন, "দাদা, আমি না বুঝে আপনার উপর একটা মন্তব্য প্রকাশ করেছি। I beg your pardon. আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনি যাহা ভাল বুঝেন

তাহাই করিবেন।" দীনেশ বলিলেন, "এখন চুপ করে থাকাই উচিত। কোনরূপ কিছু বলিলে অনর্থ ঘটিতে পারে।"

এ দিকে জয়চন্দ্রের মাতৃশ্রাদ্ধের দিন এগিয়ে আসিতে লাগিল। উমাসুন্দরী আস্তে আস্তে সমস্ত যোগাড় করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় অন্নদাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া বড়ই শোকান্বিত হইলেন। কন্যাস্থানীয়া স্বজনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে যোগদান করা বড় বিষময় ব্যাপার। ভবদ্বীপ অভিমুখে তাঁহার আর পা চলিল না। তাঁহার নয়নে অন্নদা ও উমা এক বৃন্তের দু'টি সাদাফুল ছিল। তাহার একটি অকালে ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আর একটি যেন কবে কালে হরিয়া লইয়া যায়। এইভাব মনে উঠিয়া তাঁহার হৃদয় অস্থির করিয়া তুলিল। রামশরণকে লিখিলেন, "আমার শেষকাল, এখন কঠিন পরিশ্রম সহ্য করিতে পারি না। এ সাংঘাতিক শ্রাদ্ধ, ইহাতে গিয়া বেশী ফল নাই। তোমার অবস্থা বড় স্বচ্ছল নহে। বেশী ব্যয় বাহুল্য করিয়া ঋণী হইও না। যথাসম্ভব কার্য্যটি সমাধা করিও। যুগল ৫০৲ টাকা পাঠাইয়াছে, এই লোকসঙ্গে পাঠাইলাম"।

রামশরণ সেন মহাশয়ের শ্বশুর সস্ত্রীক ভবদ্বীপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্নদার মৃত্যুসংবাদে কমলা শুশ্রূ বড়ই অস্থির হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার কি পোড়াকপাল! যে ডাল ধরেন তাহাই ভাঙ্গিয়া পড়ে। কন্যার বাড়ী আসিয়া, উমাসুন্দরীর দয়াপূর্ণ অমায়িক ভাব দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় অনেকটা শীতল হইল। দেখিলেন কন্যা তাঁহার নিজের নিকট অপেক্ষা বেশী যত্নে প্রতিপালিত হইতেছে; এই অল্পকালের মধ্যেই উমাসুন্দরীর নিতান্ত অনুগতা হইয়া উঠিয়াছে। কর্ত্তব্যপরায়ণা হইয়া সাধ্যমত সংসারের কার্য্য হৃষ্টচিত্তে করিতেছে। এই সকল দেখিয়া তাঁহার মন অনেক পাতলা

হইল। তিনি ও উমাসুন্দরীর মাতা শ্রাদ্ধের যে যে অনুষ্ঠান করিতে হয় করিয়া লইলেন। শ্রাদ্ধ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়া গেল। জয়চন্দ্র ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মাতার উদ্দেশ্যে জলদান, অন্নদান, গোদানাদি করিয়া পবিত্রমনা হইলেন। মাতার বিয়োগে মন পুড়িতে লাগিল। উমাসুন্দরী দয়াবারি সিঞ্চন করিয়া শীতল করিতে লাগিলেন। সকলেই যাঁর যাঁর বাড়ী চলিয়া গেলেন। হরসুন্দরীও পিত্রালয়ে গেলেন। জয়চন্দ্র ভাল দিন দেখিয়া সহর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় উমাসুন্দরী বলিলেন, "বাবা তুমি এক বৎসর কাল মাতৃ উদ্দেশ্যে একাদশী করিও না। ও বড় কঠিন ব্রত, আমাদের এই পোড়া প্রাণেই প্রায় অসহ্য হইয়া উঠে। তোমার মাতা তোমাকে আমায় দিয়া গিয়াছেন, এখন আমিই তোমার মাতা। এ মাতা মরিলে দুইজনেরই স্মরণার্থ একত্রে একাদশী করিও।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

জয়চন্দ্র সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনটা বড়ই বিষণ্ণ। সর্ব্বদাই মাতার নিমিত্ত প্রাণ অস্থির থাকে। আসিয়া প্রথমেই যুগল ও কমল রায় মহাশয়দিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা উভয়েই বড় দুঃখ প্রকাশ করিলেন। যুগল রায় মহাশয় উমাসুন্দরীর ভাবনায় অস্থির হইলেন। জয়চন্দ্র তাঁহাদের থাকিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন দীনেশ ও গণেশ ঘরে নাই। মাঝ খানে দিব্বি একখানি টেবিল রাখা হইয়াছে। আলমারির ভিতর পুস্তকগুলি সুন্দরমত সাজান রহিয়াছে। নিজের জুতা যোড়া রাখিবার নিমিত্ত তক্তাপোষের নীচে চাহিয়া দেখিলেন কতকগুলি চীনের বাসন রহিয়াছে। জয়চন্দ্র দেখিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন। বিষণ্ণমনে চেয়ারে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় দীনেশ ও গণেশবাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন। দীনেশ বাবু "My dear Joy, when have you come? I am very sorry for your bereavement" * বলিয়া হাত এগিয়ে দিলেন। জয়চন্দ্র পাণি গ্রহণ করিলেন। দীনেশ বাবু ঝাঁকিতে লাগিলেন। গণেশের সহিতও করপীড়ন হইল। গণেশবাবু সাহেবি কেতায় চেয়ারে বসিয়া জয়চন্দ্রকে বলিলেন, "কেমন, এখন সভ্য জাতির মত বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছে না?" জয়চন্দ্র বলিলেন, "হাঁ হয়েছে; কিন্তু মামা, একটা কথা, আমাদের রঙটা ফরসা করা যায় কেমনে? দীনেশ মামায় একটু মেজে ঘসে নিলেই হবে। তোমার

---

* প্রিয় জয়, তুমি কখন এলে? তোমার মাতৃ-বিয়োগে আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছি।

আমার ত বার্ণিশ করা।” গণেশ বলিলেন “Yes, Jet black * তা ভেবে কি করব, খুব সাবান মাখ্‌ছি।” জয়চন্দ্র বলিলেন, “তাতে হবে না, বিলাত থেকে কোন একটা রঙ এনে গায়ে মাখতে হয়।” শুনে দুই ভায়েই হাসিতে লাগিলেন। জয়চন্দ্র বলিলেন, “আপনারা হাসেন কেন? সেদিন দেখেছিলেন না জজ সাহেবের ছোট মেয়েটার মুখে একটা কি রঙ যেন দিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করাতে আয়া বলিল পাউডার। ওদের পূর্ব্বপুরুষগণ গায়ে রঙ দিত কিনা, সে অভ্যাসটা এখনও যায় নাই। এরূপ ধপ ধপে বর্ণের উপর আবার রং কেন?” দীনেশ হাসিতে লাগিলেন। গণেশ চটিয়া বলিলেন “তুমি অসভ্য, সভ্য জাতির manners and customs † এর তাৎপর্য্য বুঝবে কিরূপে।” দীনেশ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “গণেশ তুমি wit কাহাকে বলে, তাহা জান না, I am sure he is not in earnest.” ‡ গণেশ বলিলেন, “ঠিক wit সম্বন্ধে সাহেব কা’ল অনেকগুলি কথা বলেছিলেন; হাঁ wit ভালই ত, জয়চন্দ্র I beg your pardon. § আমি বুঝ্‌তে পারি নাই। তুমি মনে ব্যথা পেওনা we are all friends.”* জয়চন্দ্র বলিলেন, “না মামা, আমি উহাতে কোন ব্যথা পাই নাই। মার নিমিত্তই আমার মন বড় ব্যথা পাইতেছে।” ইহাতে দীনেশ বাবু আলমারি হইতে Cowper’s works খানি এনে “My mother’s picture” নামক পাঠটি পড়িয়া সুন্দর মত বুঝাইতে লাগিলেন। শোকের নিকট শোকের কথাই ভাল লাগে। ইহাতে জয়চন্দ্র ক্ষণকাল শান্তি পাইলেন।

---

* হাঁ, নিরেট কাল।

† রীতি নীতি।

‡ আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি ও কৌতুক কচ্ছে।

§ আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি।

* আমরা সকলেই বন্ধু।

গণেশ বাবু বুঝিতে পারিতেছিলেন না, দীনেশ বাঙ্গালায় ব্যাখ্যা করাতে বুঝিয়া লইলেন। এইরূপে দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। জয়চন্দ্র অনেক দিন অনুপস্থিত থাকাতে পড়ার অনেক ব্যাঘাত হইয়াছিল। অতএব দ্বিগুণিত পরিশ্রম সহকারে ক্ষতিপূরণ করিয়া লইলেন।

উদাহরণের কি অপূর্ব্ব শক্তি; ইচ্ছা না থাকিলেও অলক্ষিত ভাবে নিজ চরিত্রে প্রবেশ করিয়া অধিকার করিয়া ফেলে। জয়চন্দ্র সাহেবি ভালবাসিতেন না। অখাদ্য খাইবেন না বলিয়া মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দীনেশ ও গণেশের সহিত থাকিতে থাকিতে অখাদ্যের উপর যে ঘৃণা তাহা দূর হইয়া গেল। তাঁহারা তাহাকে রুটী কি "বিস্কুট" খাইতে বলিলে, তিনি বলিতেন, "আমি উহা খাইতে বড় ভালবাসি না। আপনারা খাইতে থাকুন, আমি সম্মুখে বসিয়া আছি। আপনারা জাতিভেদ মানেন না, আমিও মানি না।" এই ভাবে কয়েক দিন কাটিয়া গেলে পর তাঁহারও খাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ অভ্যাসগুণে মনোহর বোধ হইতে লাগিল। তিনিও বৎসরেক পরে খাইতে লাগিলেন। জাতিভেদ মানা উচিত নহে; নিজ জাতিতে যাহা না খায় তাহা খাইলেই জাতিভেদ চলিয়া গেল। আর কি চাও? এতে অন্যজাতির লোক তোমাকে সাদরে গ্রহণ করিবে কি না, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই, ও অসার ভাবনা আবার কেন? এই নীতির অনুসরণ প্রায় সকল স্কুলের ছাত্রেরাই করিতে লাগিলেন। জ্বর হইয়াছে পাঁওরুটী খাও, এখানে এটী লঘুপাক। শরীর বলিষ্ঠ করিতে হইবে, পাঁওরুটী খাও, এখানে এটি নিতান্ত সারবান্ পদার্থ। পথে ঘাটে চলিতে হইবে, কি কাজ ভাত রান্ধিয়া, পাঁওরুটী খাও, কারণ ইহা হাতে লাগে না। ইচ্ছা করিলে খণ্ড খণ্ড করিয়া পকেটে পুরিয়া কিম্বা কবিরাজের পুটলির মত চাদরে বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া যায়। আজ-

চাউলের পিষ্টক খেওনা, বড় গুরুপাক, উহাতে সার নাই, বড় পেটের অসুখ জন্মায়। এই মত নব্য মহলে প্রচার হইতে লাগিল। মুরব্বিরা এ সব জানিতে পারিলেন। যাঁহারা অধীর প্রকৃতি তাঁহারা পিড়াপীড়ি করিতে গিয়া নিজেই ঠেকিতে লাগিলেন। সকলের ছেলেই যায়, লাভের মধ্যে তাঁহাদের ছেলেরাই জাতিভ্রষ্ট হয়। যাঁহারা বৈষয়িক বুদ্ধি রাখেন, দেখে না দেখে ভাবে আপন পথ পরিষ্কার রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর চলিয়া গেল। দীনেশ এখন জুনিয়র পাস হইয়াছেন। গণেশ কয়েকবার ফেল হইয়া জয়চন্দ্রের সমপাঠী হইয়াছেন। দীনেশ বাবু একজন নামক ছাত্র, তাঁহার ইংরাজী কথা বলার ধরান পরিপাটি। তিনি খুব ইংরেজী লিখিতে পারেন। জয়চন্দ্রের উপরও শিক্ষক মহাশয়ের বিশেষ ভরসা। তিনি বাড়ী হইতে আসিবার পর হইতেই সেনপাড়ার ছেলেদের সহিত তাঁহার বড় সৌহৃদ্য হইয়াছে। দেবনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র বিষ্ণুপদ এখন তাঁহার সমপাঠী, সর্ব্বদাই তাঁহাদের বাড়ী গিয়া থাকেন। ফ্রেণ্ডের সংখ্যা এখন বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হরিপ্রসন্ন নামক আর একটী ছাত্রের সহিত জয়চন্দ্রের বিলক্ষণ বন্ধুতা ও প্রতিযোগিতা। হরিপ্রসন্ন খুব সদ্বক্তা, কথা দ্বারা মন আকর্ষণ করিতে পারে।

এইরূপে দিন চলিয়া যাইতেছে। যুগল ও কমল রায় মহাশয়ের স্ত্রীদ্বয়ের হিংসা ও স্বার্থপরতা লক্ষণ রায় মহাশয়কে জ্বালাতন করিয়া তুলিতেছে। তিনি আর কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেছেন না। ইচ্ছা করিলেন, প্রাণের ভ্রাতাদের সহিত কয়েক দিন সহরে কাটাইয়া আইসেন। আবার ভাবিতে লাগিলেন, সেখানে যদি দীনেশ ও গণেশের ব্যভিচার দেখিতে পান, তাহারা যদি তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে, তাহা হইলে আরও কষ্ট হইবে। এইরূপ কত কি ভাবিতেছেন।

পোষ্যপুত্র রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সারগর্ভ কথা বলিয়া রাখিতে দিলেন না। সহসা মনে এই ভাব উদয় হইল যে, দীনেশ ও গণেশ সম্বন্ধে কুকথা কেবল লোকমুখে শুনিয়াছেন, কিছুই দেখেন নাই। না দেখিয়া দোষারোপ করিয়া মন কাল করা উচিত নহে, সুতরাং যাওয়াই স্থির করিলেন। শনিবার দিন রাত্রিতে সহরের ঘাটে তাঁহার নৌকা লাগিল। অনেক রাত্রি হইয়াছে বলিয়া বাসায় উঠিলেন না। পর দিন প্রাতে ঘাটে সন্ধ্যা পড়িয়া মালাটি হাতে করিয়া জপিতে জপিতে বাসা অভিমুখে চলিলেন। বাসায় যাইতে গির্জ্জার পাশ দিয়া যাইতে হয়। সেইখানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন দীনেশ, গণেশ আরও দুই চারিটি ছেলে সাঁ ক'রে গির্জ্জায় প্রবেশ করিল। দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। মনে করিলেন, যাহা দেখিতে আসিয়াছি, তাহা ত অদৃষ্ট দু'পা না হাঁটিতেই দেখাইল। তবে আর কেন, এখন ঘরে ফিরিয়া যাই। পুত্র না হইয়া ভালই হইয়াছে। ফিরিয়া দু এক পা হাঁটিলেন, মনে হইল বাল্যকালের খেলাব সাথী হরিদয়াল বন্ধুর সহিত একবার দেখা করিয়া যান। দুঃখের সময় বান্ধবের মুখ দেখিলেও হৃদয়ে আনন্দ হয়। আবার ফিরিয়া বন্ধু মহাশয়ের বাসার দিকে চলিলেন। বন্ধু মহাশয় একজন বিচক্ষণ লোক—বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। উক্ত ধর্ম্মের এমন কোন গ্রন্থ ছিল না যাহা তিনি উত্তমরূপ অভ্যাস করেন নাই। তাহাতে আবার জীবনটা সরকারী ওকালতী করিয়া কাটাইতেছেন। তাঁহার সহিত তর্কে কেহই আটিতে পারিত না। তাঁহার বলার প্রণালী নিতান্ত সুমিষ্ট ছিল। ধর্ম্মঘটিত কথাগুলি উদাহরণ প্রদান করিয়া সুন্দররূপে বুঝাইতে পারিতেন। ওকালতি করিয়া বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সমস্তই প্রায় মহোৎসব, নারায়ণসেবা ও আখড়ার খরচে শেষ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসায় ও বাড়ীতে

সদাব্রত ছিল। তিনি রায় মহাশয়কে দেখিয়াই আহ্লাদে দৌড়িয়া আসিয়া হাত ধরিয়া নিজ বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন, বলিলেন, "কি হে ভায়া অনেক কাল পরে যে। বুড়ীর কাছ ছেড়ে যে কোথায় যেতে ইচ্ছা হয় না। রস যে দেখি পাক্‌ছে।"

লক্ষ্মণ রায়। বয়স পাক্‌লে রস পাক্‌বে না কেন? তোমার বুড়ী কোথায়, মথুরায় না বৃন্দাবনে?

বন্ধু। বৃন্দাবনে।

রায়। খবর কি?

বন্ধু। একই আর না।

রায়। হরিপ্রসন্ন কেমন আছে?

বন্ধু। ভাল আছে।

রায়। কোথায় গিয়াছে?

বন্ধু। গির্জায় নমাজ পড়্‌তে?

এই উত্তর শুনিয়া রায় মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ চ'খ লাল হইল। আরক্ত নয়নে বলিলেন, "তুমিও দেখি গোল্লায় গিয়াছ। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র দুটী গির্জায় যায় শুনিয়া অধীর হইয়া সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করিতে আসিয়া আজ স্বচক্ষে তাহাদিগকে গির্জায় যেতে দেখিয়া ব্যথিত হইয়া তোমার নিকট হৃদয়ের ব্যথা দূর করিতে আসিলাম। তুমি দেখি পাষাণের মত এই সব দেখিতেছ। নিজের ঔরসজাত পুত্রটী বিধর্ম্মী হইতে চলিল, কোথায় তুমি তাহার প্রতিরোধ করিবে, না তুমি নির্লজ্জের মত অম্লান বদনে বলিয়া ফেলিলে, 'সে গির্জায় গিয়ে নমাজ পড়ছে।' ছি, এখনও তুমি হাসিতেছ, তোমার এখানে ব'সে তামাক খেতে আমার ঘৃণা হয়। তুমি বিধর্ম্মের প্রশ্রয় দাতা।" এই বলিয়া তিনি

উঠিতে উদ্যত হইলেন। বস্থ ঠাকুর "থাম, থাম" বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন,

"তোমার বিবেচনায় আমার কি করা উচিত ?"

রায়। কেন শাসন করা উচিত।

বসু। বেশ কথা। এখন হরিপ্রসন্নের বয়স কত ?

রায়। কেন আঠার বৎসর।

বসু। তুমি যে ছেলে বেলার শ্লোকটি পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছ।

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥

তুমিই ত বলিলে বয়স আঠার বৎসর হইয়াছে। এখন তাড়না করিলে যে নিজেরই তাড়া পেতে হবে। আর এরা এখন সদা সর্ব্বদা সাহেব লোকদিগের নিকট গিয়া থাকে। কিছু বলিলেই যে কলমা না কি প'ড়ে খৃষ্টান হ'য়ে যাবে। তখন হৃদয়ে আরও কষ্ট হবে। ছেলেটারও চিরজীবন কষ্টে কষ্টে যাবে। ঔরসজাত সন্তান, উহার কষ্ট দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা ধরিবে না। তাই চুপ ক'রে ব'সে আছি। এ বয়সটা বড় খারাপ, ছেলেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সোজাসোজি কাজ করিলে গতি প্রতিরোধ করা যায় না। বরং অনিষ্টই ঘটে।

রায় মহাশয় দীনেশ ও গণেশকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, এখনও তাহার হ্রাস হয় নাই। বসু মহাশয়ের এই কথাগুলি শুনিয়া তাঁহার রাগ দ'মে গেল। কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "উহারা যে এখন খৃষ্টান হইবে না তাহা তুমি জান কিসে ?"

বসু। শুন, ইহারা ধ্রুব বা প্রহ্লাদ নহে যে ধর্ম্মের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া গির্জায় যায়। এ ছেলে বয়স। সাহেব মেম একত্র বসিয়া নমাজ পড়ে। ওরা সুন্দর সুন্দর পোষাক পরে। পরিপাটি ও

সুন্দর আসনে বসে, সুন্দর বাজনা বাজে, এই সকল কারণেই মোহিত হইয়া যায়। সাহেবদের সহিত একাসনে বসিতে পারে, তাহাদের সঙ্গে গাইতে পারে, তাইতে যায়। ও গান উঁহাদের হৃদয় হ'তে বাহির হয় না। এ ও একরূপ বিলাসিতা। বাড়ী, ঘর, টাকা কড়ি, বাবুয়ানা করিতে উঁহাদের সবই আছে। এ সমস্ত ইহারা সহজে ছাড়িতে পারিবে না। ধর্ম্মভাব যাহার থাকে, অর্থাৎ যে ধার্ম্মিক হইয়া জন্মগ্রহণ করে, সে নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মের দিকে যায় না। এক ঈশ্বরচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে না। এটি তুমি নিশ্চয় জানিও। তবে সংসর্গদোষে অনেক সময়ে ঠেকিয়া পড়িয়া কেহ কেহ অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করে। তাহারা অবলম্বিত ধর্ম্মেই ধর্ম্মভাব দেখাইতে থাকে। বেচারারা আর করে কি, তখন আর উপায়ান্তর থাকে না। আমার নিকট খৃষ্টান না হওয়ার একটা ঔষধ আছে। তুমি জান এখনকার ছেলেপিলের আর কোন জ্ঞান থাকুক না থাকুক, স্ত্রী,জ্ঞানটি বিলক্ষণ আছে। উঁহাদের নিকট 'মাই ডিয়ার ওয়াইফ' বড় মিঠা কথা। এই বন্ধনে একবার বাঁধিলেই আস্তে আস্তে বক্রভাব দূর হইয়া বাবাজিরা সোজা হ'য়ে আসিবে। না ঘোড়া না গাধা একটা মাঝামাঝি জানোয়ার হ'য়ে থাকিবে।

রায়। তুমি এতদূর চিন্তা কর, তবু তোমার একমাত্র পুত্রটীকে ইংরেজী পড়াইলে কেন?

বসু। ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মিশাতে।

রায়। ওরা অখাদ্য খেয়ে আসে, তাতে তোমার জাতিপাত হয় না?

বসু। হয় বৈ কি। যখন যবন সংস্পর্শে আসিয়াছি তখনই ত জাতির গৌরব নাই। আমি যত দূর পারি সাবধানে আছি। তুমি

একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলে আমি স্বপাকে একবেলা মাত্র আতপ অন্ন আহার করি কেন? তাহার অর্থ আজ তোমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এখন বুঝলে কি?

রায়। হাঁ বিলক্ষণ বুঝিলাম, আমিও আজ হইতে তাহাই করিব।

বসু। বেশ কথা, আজি তোমার আমার এখানে নিমন্ত্রণ, নারায়ণের ভোগ হবে। সবই বৃন্দাবনের ব্রাহ্মণ, আমরা উভয়েই তথায় প্রসাদ পাইব।

রায় মহাশয় সম্মত হইলেন।

এই কথা বার্ত্তার পর রায় মহাশয় দীনেশ ও গণেশের পত্রের কথা, তাহাদের মাতাদের বিদ্বেষভাবের কথা, একে একে অতিদুঃখের সহিত বলিতে লাগিলেন। বসু মহাশয় পোষ্যপুত্র রাখার কথা তোলাতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী উহার বিরুদ্ধে যে যে যুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বিশেষরূপে বলিলেন। বসুঠাকুর শুনিয়া বিমোহিত হইলেন; বলিলেন, "আচ্ছা বাপের বেটী! এমন বুদ্ধিমতি নারী পূর্ব্বজন্মে বহু তপস্যার ফল না থাকিলে ভাগ্যে মিলে না। তুমি বুড়ির কাছ ছাড় না বলিয়া একমাত্র তোমাকে উপহাস করিয়াছি। এমন রমণী রত্ন শিরে বাঁধিয়া সর্ব্বত্র ভ্রমিলেও মনে তৃপ্তি মানে না। তুমি বোধ হয় নিশ্চয়ই আর পোষ্যপুত্র রাখিতেছ না।" রায় মহাশয় বলিলেন, "আমি আরও ভাবিয়া দেখিয়াছি উহাতে কোন দিকেই সুখ সম্ভাবনা নাই। বরং পরে বিষময় ফল ফলিবারই সম্ভাবনা। পূর্ব্বপুরুষদের উপার্জ্জিত ধন সম্পত্তি কেন অপাত্রে ন্যস্ত করিব? কাজেই রাখিব না বলিয়াই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। ভ্রাতুষ্পুত্র দুটি যে মানুষ হইল না, তাহাতেই হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিতেছে। তোমার কথাই ঠিক, ঝাঁকের কৈ

ঝাঁকে মিশুক।" আপত্তি নাই, নিজপথ পরিষ্কার রাখিব। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া একধারে ফারাক হতে পারিলে হ'ত। এই কথা বলি বটে, কিন্তু কুসন্তানদিগের প্রতি মায়া যায় না। আবার আর, একটা বিধবা মেয়ে রহিয়াছে,"—এই কথা বলিতে বলিতেই তাঁহার বিষম ব্যথায় কণ্ঠ অবরোধ হইয়া আসিল। চক্ষু হইতে দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। বসু মহাশয় হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইলেন। তাঁহারও চক্ষু দিয়া জল আসিবার উপক্রম হইল, তিনি শাক্তের হৃদয়ে শান্তিবারি ঢালিবার নিমিত্ত গাহিতে লাগিলেন ঃ—

কি বিষম মায়া পাশে করেছ বন্ধন।
কত যে যতন করি না হয় মোচন॥
দারা পুত্র পরিজন ইথে কিবা প্রয়োজন
কেবল কষ্টের তরে এই সংঘটন॥
কিছুই ঠিক না পাই মনে ওগো মাতঃ ত্রিনয়নে,
(একি) ফণীতে দংশায়ে পরে বিষ-বিমোচন॥
শ্যামা মা তোর পায়ে ধরি, দেহপাশ মুক্ত করি
মুক্ত পক্ষে সদা ভ্রমি এ ভব ভুবন॥

রায় মহাশয় ক্ষণকাল শান্তি বোধ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "মনে করিয়াছিলাম আর বাসায় যাইব না। তোমার সারগর্ভ কথায় মনে প্রবোধ মানিয়াছে। একবার বাসায় গিয়ে যুগল ও কমলের সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিয়া আসি। তুমি আমাকে থেতে ব'লে ভালই করিয়াছ।" এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। বাসামুখি যাইতেছেন, কত লোক জন গাড়ী ঘোড়া যাইতেছে তাহার দিকে তাঁহার মন নাই। বসু মহাশয়ের কথাগুলি মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনে নানা চিন্তার তরঙ্গ উঠিতে-

ছিল। হাতে মালা ছিল কিন্তু কর ঘুরিতেছিল না। সহসা কতকগুলি লোক "হরি বল, হরি বল" বলিয়া তাঁহার পাশ দিয়া একটা শব লইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন সহরের এক জন ধনীর একটী মাত্র পুত্র দুই দিনের জ্বরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যে মানুষটী বড় ক্রন্দন করিয়া পিছনে পিছনে যাইতেছে সেই হতভাগ্য উহার পিতা। পুত্রের মুখে আগুন দিতে যাইতেছে। শুনিয়া তাঁহার মায়াময় চিত্ত আরও অবশ হইয়া পড়িল। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "এই ত ফল। আমি কি অসার অপুত্রক হইয়াও এই অপত্য স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া মায়াপাশদ্বারা বদ্ধ হইতে লালায়িত।" এই ভাবনা হৃদয়ে প্রবেশ করা মাত্রই চরণের গতি নিতান্ত মন্দ হইল। মনে হইতে লাগিল এখনই এ পাপস্থান পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন ভাবে বেড়িয়া বেড়ান। পাখীর মত গগনে ব্যাপিয়া মুক্তকণ্ঠে গান গাইয়া হৃদয় মন পরিষ্কার করেন। এমন সময়ে তিনি ধাঁধার মত দেখিতে পাইলেন তাঁহার উদাসীন ভ্রাতা যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলীদ্বারা তাঁহার স্ত্রীকে দেখাইয়া দিলেন। চক্ষু বুজিলেন তাহাতে সেই মুর্ত্তি সেই ভাবে দেখিতে পাইলেন, চক্ষু মেলিলেন, আর দেখিতে পাইলেন না। মুখ নিতান্ত গম্ভীর হইল। সুগভীর চিন্তা আসিয়া হৃদয় মন অধিকার করিয়া লইল। মনে সিদ্ধান্ত করিলেন "যাহা মনন করিয়া আসিয়াছি তাহা সিদ্ধি করিয়া আপন পথ দেখিব, নিশ্চয় দেখিব। পিতঃ বিশ্বেশ্বর, তোমার চরণ ভরসা।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাসার ফুল বাগানের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, জ্ঞান নাই কোথায় আসিয়াছেন। যুগল রায় মহাশয় তাঁহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দাদা আমার মনে বড় ভয় হইতেছে, আপনি আজ এত উন্মনস্ক কেন? কোন বিপদে ত ঘটে নাই? লক্ষ্মণ রায় মহাশয়ের

চৈতন্য হইল, গম্ভীরস্বরে "কালীকুলাও" বলিয়া, উত্তর করিলেন, "কোন চিন্তার কারণ নাই, সহসা দাদার কথা মনে উঠিয়া হৃদয়টা অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; এই স্থান হইতেই তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেন।" যুগল রায় মহাশয়ের হৃদয়েও আঘাত লাগিল। লক্ষ্মণ রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাসার সমস্ত মঙ্গল ত? "আজ্ঞা হাঁ।" "কমল কোথায়।" "আজ্ঞা একটু কাজে গিয়াছে এখনই আসিবে।" এইরূপ আলাপ করিতে করিতে দুই ভ্রাতাই বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। কমল রায় মহাশয়ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নকড়ী তামাক সাজিয়া হুঁকাটি বৈঠকে রাখিয়া একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল।

লক্ষ্মণ রায় মহাশয় এ কথা সে কথার পর বলিলেন, "আমি আজ একটা কথার নিমিত্ত স্বয়ংই তোমাদের নিকট এসেছি।" উভয় ভ্রাতাই ভয়ের সহিত দাদার মুখের দিকে চাহিলেন। যিনি কোন দিন আদেশ ছাড়া কোন কথা বলেন না তিনি স্বয়ং একটা কথার নিমিত্ত আসিয়াছেন ইহাতেই উভয়ের মনে ভয় হইল। "আমার ইচ্ছা দীনেশ ও গণেশের বিবাহটা এখনই সেরে ফেলি। উহারা বিলক্ষণ লেখা পড়া শিখেছে, সর্ব্বদাই সাহেব মহলে যায়। বিবাহসূত্রে বাঁধ্‌লে আমার আশঙ্কাটা দূর হয়।" উভয়ে বলিলেন, "এতে আবার জিজ্ঞাসা কি? বাড়ী থেকে আদেশ করিলেই হইত। বিবাহ কখন দিতে চান?" লক্ষ্মণ রায় মহাশয় বলিলেন, "যত শীঘ্র হ'তে পারে। তবে একমাসের পূর্ব্বে সমস্ত যোগাড় হইবে না।" কমল বলিলেন, "এখন হাতে বিশেষ টাকাকড়ি নাই, দু তিন মাসে বাদে হইলে ভাল হইত। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় বলিলেন, "তোমাদের হাতে যে কখন টাকা থাকে তাহা আমি জানি না। শুনি তোমরা বিলক্ষণ টাকা উপার্জ্জন কর। টাকাগুলি দিয়ে কি কর? সৎকার্য্য ত কিছু করিতে দেখি না,

কার্য্যের মধ্যে দুই চারিজন স্বজাতীয় লোকদিগকে খেতে দেও। তোমাদের টাকায় আমার কোন প্রয়োজন নাই, পাঁচ সাত হাজার টাকা যাহা লাগিবে তাহা আমিই চালাইতে পারিব। তোমাদের ছেলে ব'লে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন।" যুগল রায় মহাশয় নিতান্ত নম্রভাবে বলিলেন, "বিবাহের কথা আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন কি? আপনি যাহা করিতে ইচ্ছা করেন তাহাই আমাদের করণীয়।" লক্ষ্মণ রায় মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা আমি এখন আসি গিয়ে। তোমরা বউ দু'টির নিমিত্ত সুন্দর সুন্দর গহনা প্রস্তুত করিতে থাক। বিবাহের সমুদয় জিনিসই নিজেরা দেখে শুনে খরিদ করিও, কোন জিনিশই যেন খারাপ না হয়। দুই তিন হাজার টাকা পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই পাঠাইয়া দিব।" যুগল রায় মহাশয় বলিলেন, "এখানকার খরচের নিমিত্ত টাকা পাঠাইতে হইবে না। আর পাঠাইবেন সবই গুছিয়ে নিয়ে যাব।" "গুছিয়ে আবার নিবে কি? ঋণ করিবে না জিনিস পত্রগুলি বাকী নিবে।" "আজ্ঞা তা কিছু নয়, দুই তিন হাজার টাকা আছে, আরও যোগাড় হইবে। কমলের ইচ্ছা ছিল সমস্ত টাকাই এখান হইতে দিবে, তাইতে ও ওরূপ বলেছে। আপনি না খেয়ে যাবেন একি!" "হর দয়ালের বাসা হইয়া আসিয়াছি সে আমায় খেতে বলেছে, আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি।" যুগল "এইখানে নেয়ে পূজা সেরে গেলে ভাল হয়। হয়ত অনেক বেলায় সেখানে আহার হবে, বড় কষ্ট হবে।" "আমি সে বাসায় বিষ্ণুমণ্ডপে বসে পূজা করিব," এই বলিয়া উঠিয়া চলিতে লাগিলেন। দুই ভাইয়েই ভয়ে কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না। কমল হুঁকাটী সম্মুখে ধরিলেন, তিনি বলিলেন "আমি তামাক ছেড়ে দিয়াছি।" দুই ভায়েই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। জয়চন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিল। রায় মহাশয় "কিহে শালা বাবু ভাল আছ?"

বলিয়া মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। দীনেশ ও গণেশ বাবু ও প্রণাম করিলেন, তাঁহাদিগকে বেঁচে থাক বলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন। ঘৃণায় গায় হাত দিলেন না। কিছু দূর গেলে পর লক্ষ্মণ রায় মহাশয় একটু উচ্চগলায় বলিলেন "তোমরা এখন ফিরে গিয়ে যে কাজের ভার দিয়া গেলাম তাহা কিরূপে সম্পন্ন করিবে তাহারই চেষ্টা কর। আমি এবিবাহে দশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম তাহা যে হবে তাহার আকার দেখিতেছি না।" দুই ভায়েই মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন রাগের পূর্ব্বলক্ষণ, অমনি চরণে প্রণাম করিলেন। তিনি একে একে দুই ভ্রাতাকে বুকে চেপে ধ'রে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমরা নিরাপদে দীর্ঘ জীবন লাভ কর।" এই বলিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন, দুই ভ্রাতা সবিস্ময়ে ও বিরস বদনে তাঁহার দিকে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চাহিয়া রহিলেন, যত দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন ততক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে উভয়ে উদাস মনে বাসামুখি ফিরিলেন। যুগল রায় মহাশয় বলিলেন, "এক উমাসুন্দরীর বৈধব্য দশাতেই দাদাকে এত অধীর করিয়া তুলিয়াছে। আর অধিক দিন বাঁচিবেন না। কমল রায় মহাশয় বলিলেন, "এই যাত্রায়ই আমার একটা ছেলে পোষ্য পুত্র দিয়ে আসিব, "তাহা হইলে অনেকটা সুস্থির হবেন।" যুগল রায় মহাশয় বলিলেন, "পাগল তুমি খেপেছ, আমি বধূঠাকুরাণী মহাশয়ার সহিত এবার পূজার সময় আলাপ করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি উহার বিরুদ্ধে যে যে যুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে আমি তাঁহার নিকট নিতান্ত মূর্খ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলাম, তাঁহারই স্বামী লক্ষ্মণচন্দ্র রায় একবার কোন কর্ম্মে অধর্ম্ম জ্ঞান হইলে স্বয়ং বিষ্ণু আসিলেও তাঁহাকে অন্যরূপ বুঝাইতে পারিবে না।" এইরূপ আলাপ করিতে করিতে উভয়েই বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। সেদিন মনের আবেগে কাহারও অন্ন জল হইল না।

নকড়ী দীনেশ ও গণেশ বাবুর নিকট গিয়ে সমস্ত বিষয় রঞ্জিত করিয়া বলিতে লাগিল। তাঁহাদের স্ত্রীদের নিমিত্ত যে সুন্দর সুন্দর গহনা প্রস্তুত করিতে বলা হইয়াছে তাহাও বলিল। দীনেশ বাবুর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "আপনি একদিন ব'লেছিলেন যে আপনার চিঠি লেখার কোন ফল ফলে নাই?" দীনেশ চুপ করিয়া রহিলেন। গণেশ বলিলেন, "yes প্রিয় নকড়ী ফল হয়েছে বই কি?" উভয় ভ্রাতারই মন আজ বড় প্রফুল্ল, খুব উল্লাসের সহিত আজ পেট ভরিয়া ভাত খাইলেন।

লক্ষ্মণ রায় বসু মহাশয়ের বাড়ী আসিয়া বিষ্ণুমণ্ডপে পূজা সমাপন করিয়া দুই বন্ধুতে একখানে বসিয়া তৃপ্তির সহিত প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। খাওয়া সমাপন হইলে রায় মহাশয় বলিলেন, "বিবাহের প্রস্তাব যুগল ও কমলের নিকট করিয়া আসিয়াছি। দেখিয়া অবাক হইবে যে অদ্য হইতে একমাসের মধ্যে মহা সমারোহে বিবাহ সম্পন্ন হইবে। দ্বিতীয় মাসে তোমার এ বান্ধব কাশীবাসী।" বসুমহাশয় বলিলেন, "তিন মাসের মধ্যেই তোমার সহিত আমার দেখা হইবে। ভগবান্ ইচ্ছা করিলে এ অধম বৃন্দাবনবাসী। তোমাকে আরও একটা কথা ব'লে দেই মেয়ে দুটি খুব উচ্চকুল হইতে আনিও, তাহার মধ্যে দেখিও মাতৃকুল গৌরবান্বিত পতিপরায়ণ ও তেজিয়ান কি না। বুঝলে না, বন্ধনটা একটু ভালমত দৃঢ় হওয়া আবশ্যক কি না। অপ্সরার মত সুন্দরী আনিও না, লক্ষ্মী ও শ্রীযুক্ত চেহারা দেখে এন। ছোট লোকের ঘরের মেয়ে এন না। ঐশ্বর্য্য পাইয়া মেম সাজিয়া উঠিবে।" রায় মহাশয় বলিলেন, "তোমার এ কথাগুলি আমিও ভাবিয়াছি। এখন বিদায় হই, শুভকার্য্যে বিলম্ব নাই।" এই বলিয়া দুই বান্ধবে বিদায় হইলেন। বসু মহাশয় ঘরে তিষ্ঠিতে পারিলেন না, পিছনে পিছনে নৌকা পর্য্যন্ত গেলেন। নৌকায় উঠার সময় লক্ষ্মণ রায় বলিলেন, "এ বিবাহে যেতে হবে। কুলীনত্ব জাহির করিও না।"

বন্ধু । অকুলীনের সহিত আবার কুলীনত্ব কি ? নিজ ভগিনীর বাড়ী যাব। (বন্ধু ঠাকুরের ভগিনীর বাড়ী ঐ গ্রামেই ছিল)।

রায় । তোমাকে দিয়া আমার বিশেষ কাজ আছে।

বন্ধু । কাগজ নিয়ে যেতে হবে ?

রায় । মায় মুসাবিদা।

বন্ধু । নারায়ণ না কালী।

রায় । শুধু তা কেন ? গণেশ, দীনেশ, হরি, উমা সমাবেশ। উমা অভিমানিনী জীবিকা সংশয় নিবারনার্থ। আমার হরগৌরী রূপ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের শক্তির হ্রাস হইয়া যায়। রসনায় আস্বাদন থাকে না, নাসিকায় ঘ্রাণ থাকে না, চক্ষুতে জ্যোতিঃ থাকে না, চরণের গতি থাকে না, কর্ণের শ্রুতি থাকে না। তবে এই দশ ইন্দ্রিয়ের বিলাস-আধার স্ত্রী-অনুরাগ থাকিবে কেন? যৌবনে যে চক্ষের বিকাশ দেখিয়া মন উন্মত্ত হইত, যে কথা, যে সুধামাখা প্রেম কথা কর্ণে প্রবেশ করিয়া হৃদয় মন কামিনী হৃদয়ে লইয়া যাইত, "আমাদের বাড়ীর আঁবগাছে পাখী ডাকে, ফুল বাগানে ফুল ফোটে, পুকুরে জল আছে তাহাতে মাছ আছে, মাছ সকলে খায়" প্রভৃতি নীরস কথাগুলি ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্কা নারীকণ্ঠ হইতে রসযুক্ত হইয়া কর্ণে এমনই সুধাবর্ষণ করিত যে অতৃপ্ত কর্ণে শুনিতে শুনিতে রাত্রির উপর রাত্রি যে কেমনে চলিয়া যাইত তাহা অনুভূত হইত না, তাহা কোথায়? কোথায় এখন সেই প্রেমানুরাগ? এখন ত আর সেইরূপ বসিরা বসিয়া অতৃপ্ত নয়নে মুখকমল দেখিতে দেখি না। তাহাতেই বলি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রণয় হ্রাস হইয়া যায়। মন, তোমার এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে ইচ্ছা হয় কর। তাহাতে বাধা নাই, তুমি স্বাধীন; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন প্রেম কমে না কেবল রূপান্তর প্রাপ্ত হয় মাত্র। তপস্যায় রত মানব যেমন প্রথমতঃ কেবল মাতৃচরণ ধ্যান করে, মাতৃচরণ ছাড়িয়া সাকার অবলম্বনে নিরাকার ধ্যান করে, সাকার ছাড়িয়া কেবল নিরাকারই চিন্তা করিতে করিতে আমাতেই ঈশ্বর আছেন, তাঁহার অনন্ত জ্যোতি, অনন্ত শক্তি, অনন্ত প্রেম আমাতেই আছে, অতএব "সোহং," "আমিই সেই"

অবস্থায় উপনীত হইয়া আর কাহাকেও পূজা করা আবশ্যক বিবেচনা করে না ; স্ত্রী ও পুরুষ ক্রমে এরূপ ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়া পরে দুইয়েই এক হইয়া যায়। এক অঙ্গে ব্যথা প্রাপ্ত হইলে উভয় অঙ্গে সমব্যথা পায়। এই কারণেই লক্ষ্মণ রায় মহাশয়ের সহধর্মিণী, মেঝ ও ছোট বধুর বিদ্বেষ-ভাবে, দীনেশ ও গণেশের স্বার্থপরতায়, মর্মকষ্ট অনুভব করিতেছিলেন। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় যখন বাড়ী আসিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিষয় জানাইলেন, তখন তিনি বলিলেন, "ভাল সংকল্প করিয়াছ। তবে বিধবা মেয়েটার নিমিত্ত মন কাঁদিবে। সে আর বেশী কথা কি ? কাঁদিয়া কাঁদিয়াইত জীবন গেল। আর যাহাতে না কাঁদিতে হয় তাহারই চেষ্টা করা উচিত। আমার কষ্ট কি ? তোমার সহিত আমি যেখানে থাকিব সেই ত আমার স্বর্গপুরী।" রায় মহাশয় অনেক রাত্রিতে বাড়ী আসিয়াছিলেন। এই সব কথাবার্ত্তায় রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রাতে গ্রামস্থ পণ্ডিত মহাশয়কে আনিয়া দেখিলেন আর একুশদিনের পর বিবাহের শুভ দিন আছে। তিনি এই তারিখেই কার্য্য সমাধা করিতে হইবে বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। বাড়ী ও গ্রামস্থ সকলে বলিতে লাগিল বড় জাঁকাল বিবাহ আসিতেছে। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় দয়াল ও পুরোহিত ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া পদ্মাপার যাইয়া একটি প্রসিদ্ধ কুলীনের ঘরের দু'টী সুলক্ষণ-সম্পন্না কন্যার সহিত সম্বন্ধ ঠিক করিয়া আসিলেন। সকল কুলীনই রায় মহাশয়কে বিশেষরূপ শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সকলকে যথোপযুক্ত কুল-মর্য্যাদা দিয়া পাত্রী দু'টী স্বগ্রামে উঠাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিলেন। প্রধান প্রধান সমস্ত কুলীনগণকেই এই বিবাহে উপস্থিত হইতে যুক্ত করে অনুরোধ করিয়া আসিলেন।

ধাঁ ধাঁ করিয়া দিন যাইতে লাগিল। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় সমস্ত যোগাড় করিতে লাগিলেন। রায়ত জন আসিয়া আহ্লাদের সহিত বেগার

খাটিতে লাগিল। যুগল ও কমল রায় মহাশয় জায়ের উপর জায়, ফর্দ্দের উপর ফর্দ্দ, পাইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সমস্ত গ্রামখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইল। স্বজাতীয় কোন একজনের অবস্থা কোন গতিকে খারাপ হইয়া গিয়াছিল। ঘর ক'খানা পড়িয়া যাইতেছিল। বাড়ীতে অনেক-স্থল অর্থাভাবে বনে পরিপূর্ণ হইতেছিল। রায় মহাশয় ঐ বাড়ীতেই কন্যা দু'টী আনিয়া রাখিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন সঙ্কল্প করিয়া সমুদয় ঘর দরজা গুলি এমন সুদৃঢ় রূপে মেরামত করিলেন যেন বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ভদ্র লোকটীর উহাতে আর হাত দিতে না হয়। নাবালক ছেলে দু'টী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যথোপযুক্তরূপে রাখিতে পারিবে। গ্রামস্থ যে যে ব্রাহ্মণ নিতান্ত নিঃস্ব ছিলেন তাঁহাদের বাড়ীতেই অভ্যাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বাসা স্থির করিয়া প্রকারান্তরে বাড়ী ঘরগুলি মেরা-মত, জঙ্গল ও আবর্জ্জনা পরিষ্কার করাইতে লাগিলেন। বরযাত্রীর এই স্থল দিয়া যাইতে অসুবিধা হইবে বলিয়া রাস্তাঘাটগুলি মেরামত করিতে লাগিলেন। লোক জনের কমি নাই, অর্থের অভাব নাই, যত্নের ত্রুটি নাই, যাহা মুখ হইতে বাহির হয়, তাহাই তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন হইয়া যায়। রামশরণ সেন মহাশয়কে সপরিবারে বিবাহের অন্যূন সাতদিন পূর্ব্বে আসিতে লিখা হইল। নীলকণ্ঠ সেন মহাশয়কেও সপরিবারে আসিবার নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লেখা হইল। দেবনাথ চৌধুরি মহা-শয়কেও লক্ষ্মণ রায় মহাশয় নিজ হাতে এই মর্ম্মে একখানা চিঠি লিখিলেন যে, তাঁহার এই শেষ কাজ, ইহাতে যোগদান করিলে তিনি নিরতিশয় তুষ্ট হইবেন। আর যদি তিনি অনুগ্রহ না করেন তাহা হইলে তিনি মনে করিবেন যে "তাঁহার উপর তাঁহার দয়া নাই। বিষয় সম্বন্ধে জীবনে যে নানা রূপ কলহ হইয়া গিয়াছে তাহার নিমিত্তই তাঁহার আসা হইল না।" এতগুলি কথা চৌধুরী মহাশয়কে লেখা নিষ্প্রয়োজন হইয়া-

ছিল, তিনি পত্র পাওয়া মাত্রই চলিয়া আসিলেন। বিবাহের অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। লক্ষ্মণ রায় মহাশয়ের গৃহধর্ম্মিনী মঙ্গলার্থ নানা ব্রত ও পূজার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। পুত্রের বিবাহের কথা শুনিলেই মাতার মন পুলকে নৃত্য করিতে থাকে। আনন্দের সময় হিংসা, দ্বেষ ভাবগুলি, মালবৈদ্যের হস্তস্থিত মূলযষ্টি দেখিলেই যেমন ফণিনী নিস্তেজ হইয়া মুখ গুঁজিয়া থাকে, সেইরূপ নিস্তেজ অবস্থায় থাকে। রায় মহাশয়কে এই বিবাহ কার্য্যে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে লিপ্ত দেখিয়া মেঝ ও ছোট বধূ অবাক হইলেন। বড় বধূকে তাঁহাদের পুত্রদের মঙ্গলার্থে নানারূপ দেবার্চ্চনা করিতে দেখিয়া, তাঁহার হাসি হাসি মুখ দেখিয়া, তাঁহাদের উভয়ের মনে বড়ই আত্মগ্লানি হইল। তাঁহারা যে অনর্থক দোষারোপ করিয়া নানা রূপ যন্ত্রণা দিয়াছিলেন সেই সব কথা মনে উঠিয়া তাঁহাদিগকে বিষম যন্ত্রণা দিতে লাগিল। একদিবস উভয়েই সজল নয়নে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "দিদি, আমরা অনর্থক তোমাকে অনেক সময়ে অনেক কথা বলিয়া তোমার মনে ব্যথা দিয়াছি। ঐ সকল কথা মনে হইয়া আমাদের বড় কষ্ট হইতেছে," এই বলিয়া উভয়েই কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহারও চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "ব'ন তোমাদের দোষ নাই, ও আমার অদৃষ্টের দোষ, যখন গ্রহ কুপিত হয় তখন পেটের ছেলে মাকে খেতে দেয়না, পেটের মেয়েতে ঝাঁটা মারে। তোমরা আর সে বৃথা কথা মনে তুলে কষ্ট পাও কেন? আমার মনে ওসব কিছু নাই। সবই ভুলিয়া গিয়াছি। সোণার গোপাল দীনেশ ও গণেশের বধূ দু'টী একবার কোলে লইয়া প্রাণ শীতল করিতে পারিলে আমার বহুদিনের সুখের আশা সফল হইবে। আমার পেটে ছেলে হইল না, তোমাদের পেটে হইয়াছে বলিয়াই আমার এই সুখের স্বপ্ন সফল হইবার ভরসা। তোমরা আমার পর নও।

তোমাদিগকে আমি মায়ের পেটের ব'নের মত প্রতিপালন করিয়া এত বড় করিয়াছি। এখনও পর ভাবি না। যত দিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন ভাবিব না। তোমাদের চারিটি ছেলে, তোমরা হয়ত বিবেচনা করিয়াছ তাহার একজন আমি কাড়িয়া লইতে অভিলাষী। আমি আমার চারিটি ছেলে থাকিতে একটিকে মাত্র বুকের, আর তিনটীকে পিঠের করিব কেন? 'তোমাদের মাতৃকুলের পিণ্ডের আশা লোপ করিয়া আমি পাপ সঞ্চয় করিব কেন? আমার অভাব কিসের? পতি বর্ত্তমান, দু'টী দেবর বর্ত্তমান, তোমাদের মত দুটী ব'ন বর্ত্তমান, আর চারিটি সোণার গোপাল।" এই কথাগুলি শুনিয়া আত্মগ্লানিতে উভয়েই অস্থির হইয়া পড়িলেন। পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা ব্যথা পাইলে যেমন মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকে উভয়েই তাঁহাকে সেইরূপ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উভয়েই বলিলেন, দিদি আমায় ক্ষমা কর, আমি না বুঝিয়া তোমাকে নানা কথায় নানা বিষয়ে কষ্ট দিয়াছি।" তিনজনেই অনেকক্ষণ চক্ষের জল ফেলিয়া হৃদয় মন সুন্দর মত পরিষ্কার করিয়া লইলেন। বড় বধূ বলিলেন, "সব মিটিয়া গিয়াছে, আর ওসব কথায় কাজ নাই, আমারও দোষ আছে। আমি তোমাদিগকে মনের কথা খুলিয়া বলিলে আর ওরূপ হইত না। বড় বেলা হ'য়ে গেল, মা, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের যোগাড় হাতে হাতে করিয়া দেও। পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া বসিয়া থাকিলে তোমাদের ভাসুর বড় চটিবেন।" ভাসুরের কথা শুনা মাত্রই উভয়ে তাড়াতাড়ি সমস্ত কাজ সারিতে লাগিলেন। মনের ময়লাগুলি পরিষ্কার হওয়াতে সকল কাজেই উভয়ে আজি বড় শান্তি ও সুখ পাইতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে খবর আসিল উমাসুন্দরী আসিয়াছেন। শুনা মাত্রই মেজ ও ছোট বউ বলিলেন, "দিদি আপনিই সব করুন, আমরা আসিগিয়ে" এই বলিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির

হইলেন। বাড়ীর ভিতরের দরজার সম্মুখে দু'খানা পালকি নামিল। উমাসুন্দরী বাহির হইলেন। খুড়ীমাতার "মা এসেছ" বলিয়া তাঁহার নিকটে গেলেন, তিনি প্রণাম করিলেন। হরসুন্দরীও নামিলেন, উমাসুন্দরী বলিলেন, "মেঝ খুড়ী ও ছোট খুড়ীকে প্রণাম কর"; হরসুন্দরী উভয়কেই প্রণাম করিলেন। ছোটবধু চিরায়ুস্তি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া মুখের দিকে চাহিলেন; দেখিয়া বলিলেন, "কেমন সোণার মুখ। এ যে আর এক উমা"। হরসুন্দরী কেবল যৌবনে পদার্পণ করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাবয়ব কান্তিযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। এ ছবি যে দেখে তাহারই ভালবাসা আকর্ষণ করিয়া লয়। তাহাতে আবার চলা ফেরা উমাসুন্দরীর শিক্ষায় নিতান্ত সুভাবব্যঞ্জক হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই হরসুন্দরীকে সকলেই নিতান্ত ভালবাসার সহিত গ্রহণ করিতে লাগিল। উমাসুন্দরীর মনে ইহাতে বড় বিমলানন্দ হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল আত্মীয় স্বজন আসিয়া বাড়ীঘর পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সকলেই নানাকাজে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। উমাসুন্দরী আরও দুই চারিজন সমবয়স্কা লইয়া ক্ষীরের ছাঁচ, সরভাজা, সরপুরিয়া প্রভৃতি জলপানি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। হরসুন্দরীর ও শিক্ষা হইবে, আর বিশেষতঃ তিনি নিকটে থাকিলে কোন বস্তু অপরিষ্কার হইতে পারিবে না বলিয়া তাঁহাকেও সঙ্গে রাখিলেন। উমাসুন্দরী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, কোন্‌টা কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় তাহা বলিয়া দেওয়া মাত্রই হরসুন্দরীও তাহা অতি সুন্দররূপে ও তাঁহার অপেক্ষায় পরিষ্কার করিয়া প্রস্তুত করিয়া ফেলেন। এ দেখিয়া উমাসুন্দরীর একজন সখী বলিলেন "ওরা ভাই সেনপাড়ার মেয়ে, উহাদের নিকট কোন কাজ আটকায় না, সবই উহাদের হাতে পরিষ্কার হইয়া যায়। সেন মহাশয়কে পরিষ্কার করিতে পেরেছে কি?" উমাসুন্দরী বলিলেন, "বঙ্গটা

পারে নাই, কিন্তু মনটা পেরেছে। এখন আর ঠাকুরপোর সে ছাড়া ছাড়া ভাবটা নাই।" এই কথায় সকলেই হাসিতে লাগিলেন। হরসুন্দরী মাথাটি নোয়াইয়া বুকের ভিতর নিয়া অলক্ষিত ভাবে একটু হাসিলেন। আর একজন তাঁহার গাল দু'টী দুই হাত দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "ব'ন, তুমি দেখি লজ্জায় ম'রে গেলে। কাল রঙটা ফরসা করিতে না পারিলে তোমার প্রশংসা নাই।" সকলেই হাসিতে লাগিলেন, হরসুন্দরীও সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে লাগিলেন। এইরূপ আমোদ ও উৎসাহের সহিত সকল জিনিস পত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল। হরসুন্দরীর মাতাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরসুন্দরীর অমায়িকতা, সদালাপ, সদ্ব্যবহার, স্বভাব-ব্যঞ্জক চলাফিরা ও কার্য্যনৈপুণ্যে বাড়ীর সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন। ফলটী উত্তম হইলে গাছটী দেখিতে আমোদ হয়, সকলেই যত্ন করিয়া বারি সিঞ্চন করিতে থাকে। কাজেই সকলে পরম সমাদরে কমলাগুপ্তাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সদ্বিবেচনা ও মধুমাখা ভাবে সকলেই বিপুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অনেকেই হরসুন্দরীর পিতা মাতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কহিতে লাগিলেন, "এমন মাতার এমন সন্তান হইবে না। যে যেমন মানুষ বিধি তাহাকে সেইরূপ সন্তানই দিয়া থাকেন।"

চাউল, চিনি, ঘৃত, ময়দা, লবণ, তৈল প্রভৃতি জিনিস পত্র অপর্য্যাপ্তরূপে আসিতে লাগিল। বাড়ীর ভিতরের ভাঁড়ার ঘর পূর্ণ হইয়া গেল। বাহিরেও ভাড়ার ঘর উঠিল, তাহাতেও সমাবেশ হইল না, আর একখানি উঠিল, সে খানিও পূর্ণ হইয়া গেল। কাঁসা পিতলের জিনিস ও নানাবিধ কাপড়ে একখানা কোঠা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দীনেশ, গণেশ, জয়চন্দ্র, তাঁহাদের অনুরোধ মতে বিষ্ণুপদ ও হরিপ্রসন্ন, কমলরায় মহাশয়ের সঙ্গে বাড়ী আসিলেন। যুগলচন্দ্র আসেন নাই দেখিয়া লক্ষ্মণ রায় মহাশয় বড়

অস্থির হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "কর্ম্মকারে অনেকগুলি গহনা দেয় নাই বলিয়া তিনি কিছু বিলম্ব করিয়া আসিতেছেন। আপনার আদেশ সবই প্রতিপালন করা হইয়াছে। বাই, খেমটা, ইংরেজী-বাজা সবই বায়না করা হইয়াছে। বাজির নৌকাও ঘাটে পঁহুছিয়াছে। দীনেশ ও গণেশের চিত্ত বড় প্রফুল্ল, জেঠা মহাশয়ের চেহারা আজ তাহাদের নিকট বড়ই মিঠা বোধ হইতেছিল। উভয় ভ্রাতাই তাড়াতাড়ি জেঠা মহাশয়ের চরণে প্রণাম করিলেন। তিনি চাহিয়া দেখিলেন মাথায় তেড়িকাটা। মনে মনে একটু চটিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন "বেঁচে থাক।" জয়চন্দ্রের একথাটা জানা ছিল, তাঁহারা তিন জনে পরামর্শ করিয়া কেবল চুলগুলি বাবুআনা ভাবে পাইট করিয়া রাখিয়াছিলেন। দীনেশ ও গণেশ নিতান্ত গোঁড়া বলিয়া তাহাদিগকে কিছুই বলেন নাই। ইঁহারা তিন জনেই ক্রমে রায় মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। কমল রায় মহাশয় বিষ্ণুপদের দিকে চাহিয়া বলিলেন "দেবনাথ চৌধুরি মহাশয়ের ছেলে।" লক্ষ্মণ রায় মহাশয় আহ্লাদে তাহার হাত ধরিয়া নানারূপ ভালবাসাব্যঞ্জক কথা কহিতে লাগিলেন। হরিপ্রসন্নকে বলিলেন, "বাবা তুমি যে এসেছ ইহাতে আমি বড়ই সুখী হইয়াছি।" দয়ালের দিকে চাহিয়া বলিলেন "এ ত কুলীন কায়স্থের সন্তান, আমাদের হাতে খাবে না তাতে আবার উহার পিসির বাড়ী এ গ্রামে। তুমি ঘোষ মহাশয়দের বাড়ী ভাল রকম সিধা পাঠাইয়া দাও।" জয়চন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "লালাবাবুর উপর হরিপ্রসন্নের তত্ত্ব তাবাদির ভার রহিল। এ তোমা অপেক্ষায় কম কুলীন নহে।"

দীনেশ, গণেশ, বিশেষতঃ জয়চন্দ্র আসিয়াছে শুনিয়া উমাসুন্দরী বড়ই প্রফুল্ল হইলেন। জয়চন্দ্র ও বিষ্ণুপদ উমাসুন্দরীর সহিত দেখা করিলেন। কমলাকান্তার সহিত দেখা হওয়া মাত্রই তিনি বিষ্ণুপদকে গোপনে জিজ্ঞাসা

কহিলেন, "তুমি যে এ বিবাহে আসিয়াছ তাহা কাকা জানেন কি?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন "আমি বাবার নিকট লিখিয়াছিলাম, তিনি সম্মত হইয়াছেন বলিয়া আসিয়াছি। তিনিও আসিতেছেন।" কমলা-গুপ্তা ইহা শুনিয়া সুস্থির হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা বড় সুখী হলেম।" হরিপ্রসন্ন তাহার পিসীমাতার বাড়ী গেলেন। পিসীমাতা তাহাকে দেখিয়াই মুখ চো'ক লাল করিয়া বলিলেন, "তুমি বরযাত্র হ'য়ে এসেছ নাকি?" হরিপ্রসন্ন একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি যে বিবাহে এসেছি তা আপনাকে কে বলিল?" "চালাকি, কে বলিল? এই যে তোর সিধা পত্র নিয়ে লোক দাঁড়াইয়া আছে।" হরিপ্রসন্ন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবাও আসিতেছেন। বিষ্ণুমণ্ডপখানা সুন্দরমত পরিষ্কার করিয়া রাখুন। আপনি ভাল ক'রে মালা জপেন না, দেখবেন, তিনি এসে আপনাকে কত কি বলেন।" এই কথাগুলি শুনা মাত্রই পিসীমাতার রাগ উড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, "বাবা আমার, মাথার দিবিব, বল সত্যি সত্যিই কি দাদা আসিতেছেন? উমার বাপের সহিত তাঁহার যেরূপ প্রণয় ও ভালবাসা, আসিলে আসিতে পারেন। বাবা, বল সত্যি সত্যিই কি দাদা আসিতেছেন।" হরিপ্রসন্ন বলিলেন, "আচ্ছা আপনি আগে আমাকে বলুন যে, আমাকে আর কোন কথায় বকিবেন না।" "না না বাবা, আমি সত্যি করে বলছি আর তোমাকে মন্দ বলিব না।" "আচ্ছা তবে শুনুন বাবাই আমাকে যত্ন করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি আসিতেছেন, তাঁহার সহিত চারিটা বৃন্দাবনের বৈরাগী বামন আছে, আপনাকে বিষ্ণুমণ্ডপখানা সুন্দর ক'রে পরিষ্কার করিয়া রাখিতে বলিয়াছেন। রায় জেঠাদের বাড়ী হইতে যে সিধা সামগ্রী আসে তাহা আদরে গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন।" এই কথা

শুনিয়া পিসীমাতা বড় খুসি হইলেন এবং বলিলেন, "এখন বুঝিতে পারিলাম রায়দাদা নিজে এসে বাড়ী ঘর পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন কেন ?"

দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। সকল আত্মীয় স্বজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে আত্মীয় স্বজন সম্মিলনে বিবাহকার্য্য সুন্দরমত সম্পন্ন হইয়া গেল। এবিবাহের বিশেষ বর্ণনা পাঠক মহাশয়দের নিকট করা হইল না। দশজন হিন্দুর যেরূপ বিবাহ হয়, রামশরণ সেন মহাশয়ের যেরূপ বিবাহ হইয়াছিল, এ বিবাহও সেইরূপ সম্পন্ন হইয়াছিল। তবে এইমাত্র প্রভেদ যে, এ বড়লোকের বিবাহ, সকল কাজই বিশেষ জাঁকাল গোছের হইয়াছিল। জয়চন্দ্রের মত অনেক কুলীন এ বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল। বিলক্ষণ জনতা হইয়াছিল। দেবনাথ চৌধুরি মহাশয় নিজে সমস্ত দেখিয়াছিলেন বলিয়া কোন লোক জনেরই আহারাদির কোনরূপ অসুবিধা ঘটে নাই। উপস্থিত প্রত্যেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়কে যথোপযুক্ত দক্ষিণা, গরদের যোড়; কুলীনগণের প্রত্যেককে মর্য্যাদা অনুসারে এক এক যোড়, গ্রামস্থ সমস্ত সধবাদিগকে এক এক খানা ঢাকাই সাড়ি, এক থালা পরিপূর্ণ বাতাসা, পান, শুপারি, সিন্দুর ও এক একটি বড় রকমের কাঁসার বাটিপূর্ণ তৈল, দেওয়া হইয়াছিল। কোন বিষয়েই কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই, কেবল বাজে লোকেরা বাইয়ের গান শুনিয়া খুসি হইতে পারে নাই; কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেরই খেমটার নাচে মন মুগ্ধ হইয়াছিল। দুর্ঘটনার মধ্যে কিছুই হয় নাই, তবে নকড়ীর ছোট ভাইটী ওস্তাদি জাহির করিয়া হাতের উপর তুবড়ি লইয়া ছাড়িতেছিল উহা ফাটিয়া তাহার মুখখানা হনুমানের মুখ করিয়া ফুলিয়াছিল। আর তাহার কাকীর ঘরের চালের উপর একটা জ্বলন্ত হাউই

পড়িয়া প্রায় অর্দ্ধেকচাল পুড়িয়া গিয়াছিল। নকড়ী ঐ আগুন নিবাইতে যাইয়া তাহার এক খানা হাত পুড়াইয়া ফেলিয়াছিল।

বিবাহ শেষ হইয়া গেলে পর মহাসমারোহে পাত্র পাত্রী বাড়ী আনা হইল। খাশুড়ীরা এক এক খানা সোণার গহনা দিয়া বউ পরিচয় করিলেন। জেঠীমাতা বড় বউকে নিজের গলার সাতনহরী, মেঝ বউকে নিজ হাতের কাটাতাবিজ দিয়া মুখ দেখিলেন। তাঁহার যৌতুকই বড় জাঁকাল গোছের হইয়াছিল, কারণ তাঁহার ঐ গহনা দু'খানির মত সুডৌল ও মূল্যবান গহনা খুব কম লোকেরই ছিল। এই দু'খানা গহনা তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে দিয়াছিলেন। বাড়ীশুদ্ধ আত্মীয় কুটুম্বগণ আশীর্ব্বাদ দিতে দিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গেল। পর দিন সকলে বধূ দু'টীর রূপ দেখিতে আসিলেন। সকলেই দেখিলেন, কিন্তু সুন্দর না কুৎসিত একথা কেহই ঠিক করিতে পারিলেন না। মেয়ে দু'টি এমনই লক্ষ্মীযুক্তা, তাহাদের মুখ দু'খানি এমনই লাবণ্যমাখা যে, দেখিলেই ভাল না বাসিয়া থাকা যায় না। নাক, কাণ, অধর, গণ্ডবর্ণ প্রত্যেকটা একটা একটা করিয়া ভাবিলে সুন্দরী বলা যায় না, আবার মুখেরদিকে চাহিলেই বড় মিঠা লাগে। সকলেই বড় বেগতিক দেখিয়া এই বলিয়া যে যার বাড়ীতে গেলেন "এমন লক্ষ্মীযুক্তা, শ্রীযুক্তা মেয়ে ত আর দেখি নাই, ইচ্ছা হয় পরাণ ভ'রে ঐ মুখ দু'খানিই দেখি।" মেজ বউ ও ছোট বউ এইরূপ পুত্রবধূ পাইয়া বড়ই সুখী হইলেন। বাঙ্গালীর আচার-রীতি-নীতি বিদ্বেষী দীনেশ ও গণেশ বাবুর কথা এখানে বলা অনাবশ্যক। তাঁহাদের শক্তি সাহস, বিদ্যা বুদ্ধি এই দু'টি বালকাকে কেন্দ্র করিয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ শেষ হইয়া গেল। আত্মীয় স্বজন ছাড়া সকলেই যে যার বাড়ী চলিয়া গেল। দেবনাথ চৌধুরি, হরিদয়াল বসু ও নীলকণ্ঠ সেন মহাশয় বসিয়া আছেন, লক্ষ্মণ রায় মহাশয় বলিলেন, "বাজে লোকগুলির লুচি পুরিতে ভাল করিয়া হয় ত আহার হয় নাই, যে সব গান হইয়াছে উহাতে উহারা বড় আনন্দ লাভ করিতে পারে নাই, আমার ইচ্ছা একটা মহোৎসবের অনুষ্ঠান এই উপলক্ষে করি।" চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "তাহাতে বাধা কি, সৎকার্য্য যত করা যায় ততই ভাল।" রায় মহাশয় বলিলেন, "জিনিস পত্র সবই আছে, কিছুরই যোগাড় করিতে হইবে না। তোমরা ইহাতে যোগদান কর এই আমার ইচ্ছা।" চৌধুরী মহাশয় বসু মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আমাকে কি বল, মোটা মালাধারীই ত তোমার সম্মুখে।" বসু মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "মোটা মালাধারীকে আর বেশী কিছু বলিতে হইবে না, মালাগুলি বেশী মোটা হইলেই যে রুদ্রাক্ষরূপ ধারণ করে, তাইতে তোমাকে বলা আবশ্যক। যোগদান আর কি, তোমাকে আমার সহিত হরির নাম গাইতে হবে।" চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "উহাতে বাধা কি, খুব গাইব, লক্ষ্মণের বাজাইতে হইবে, জামাতা বাবাজির হাত খুব মিঠা তাঁহারও সঙ্গে সঙ্গে বাজাইতে হইবে।" নীলকণ্ঠ সেন মহাশয় মস্তক অবনত করিলেন। বসু মহাশয় তাঁহার গায় মৃদুভাবে আঘাত করিয়া বলিলেন, "সমবয়সী শ্বশুর, লজ্জা কি? চৌধুরি ভায়া তুমি ওঁকে বাপ না ডাক্‌লে হবে না। আচ্ছা বাপ না ডাক্‌লে, অন্ততঃ মামাই ডাক।" এইরূপ আমোদ প্রমোদের সহিত সংকল্প স্থির

হইল। চারি বাবুরে নিতান্ত উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত সমস্ত যোগাড় করিয়া লইলেন। যুগল ও কমল রায়ও খাটিতে লাগিলেন। আয়োজন হইলে যথাবিধি কার্য্য আরম্ভ হইল। অধিকারী ব্রাহ্মণেরা আসিয়া সেকেন্দরি হাতের এক শত আট হাত দীর্ঘ পগার কাটা আকারে চুলা খুঁড়িয়া শতাধিক হাঁড়ি বসাইয়া দাল, দালনা পাক করিতে লাগিল। নৌকা ছেঁচিয়া আনিয়া তাহাতে দাল দালনা রাখা হইল। মণ্ডের হ্রদ, ভাতের পর্ব্বত সৃষ্টি হইল। ক্রমে বৈরাগী বৈষ্ণব লোকজন আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘন ঘন হরিধ্বনি হইতে লাগিল। বেলা দুই প্রহরের সময় জনতা বিলক্ষণ বাড়িল। গোসাঞি ঠাকুর তিলক ধারণ করিয়া গায়ে হরি নামের ছাপ দিয়া দাঁড়াইলেন। নিমীলিত নয়নে মালা জপ করিতে লাগিলেন। দেবনাথ চৌধুরি ও হরিদয়াল বসু তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। খুব মিঠাস্বরযুক্ত কয়েকজন বৈরাগী তাঁহাদের পিছনে দাঁড়াইল। লক্ষ্মণ রায় ও নীলকণ্ঠ সেন দুই জনে দুই দিকে খোল লইয়া দাঁড়াইলেন। হরিদয়াল বসু ও দেবনাথ চৌধুরি গোহড়ায় সংকীর্ত্তন গাহিতে লাগিলেন, পিছনে বৈরাগী ও অন্য অন্য ভদ্রলোকগণ গাহিতে লাগিল। গান সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সুধা ঢালিল। ঢালিবে না কেন? যে গানে একদিন সমুদয় বঙ্গদেশ বিশুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গে আলোড়িত হইয়াছিল, যাহার স্রোতে কত পাপীর পাপ পঙ্ক প্রক্ষালন করিয়া পাপীকে ধর্ম্মের নির্ম্মল নিকেতনে লইয়া গিয়াছিল; যে গানের অচিন্তনীয় প্রসাদে চণ্ডালকে দ্বিজশ্রেষ্ঠ করিয়াছিল; সে গানে হৃদয়ে সুধা ঢালিবে না, তবে আর ঢালিবে কিসে? সে গানে আনন্দাশ্রু আনিবে না, তবে আর আনিবে কিসে? সে গানে হৃদয় মন নাচাইবে না, তবে আর নাচাইবে কিসে? বসু মহাশয় গাহিতে লাগিলেন, গাহিতে গাহিতে চক্ষু ঊর্দ্ধমুখি উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে হাত দু'খানি

ঊর্দ্ধে উঠিল। পুলকে হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল। ক্রমে পা ও উঠিতে লাগিল। দেবনাথ চৌধুরি মহাশয়ের গাহিতে গাহিতে মন মুগ্ধ হইলে বন্ধু মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষুও ঊর্দ্ধে উঠিল, তিনিও নাচিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলেই এই ভাবাপন্ন হইলেন। উন্মত্তের ন্যায় সকলে চত্বর ব্যাপিয়া গাহিতে লাগিল। সকলেই মাতিয়া উঠিল; স্ত্রী পুরুষ সংজ্ঞাহীন হইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল। কতজন হরিপ্রেমে অবসন্ন হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল। শেষে আর কোন শব্দ শুনা গেল না কেবল শুনা গেল হরিবল, হরিবল, হরিবল। দূর হইতে লোকে স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে লাগিল, গৌর নিতাই যেন আবার আসিয়া পোড়া বাঙ্গালাকে প্রেমগুণে উদ্ধার করিতে চেষ্টা ।াইতেছেন। হায়রে, এমন জীবন্ত প্রেমধর্ম্মে না কি লোক ত্রাণ পাইতে ।রে না। মুসলমান, খৃষ্টান, এ কথায় তোমরা আমাদিগকে অপদার্থ ।ান করিও না। তোমাদের ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া ত লোকের এত শান্তি, এত প্রেম, এমন হৃদয় মন পরিষ্কৃত ভাব দেখিতে পাই না। তোমাদের ধর্ম্ম লইয়া তোমরা থাক, আমরা চাই না। আর যদি তুমি ঈশ্বর না মান, শান্তি না মান, প্রেম না মান, তুমি নাস্তিক। তুমি স্বাধীন বটে, পশুও তোমার মত স্বাধীন। আমরা তোমার অনুসরণ করিতে চাহি না।

দীনেশ, গণেশ, বিষ্ণুপদ, হরিপ্রসন্ন ও জয়চন্দ্র বাবু দূরে দাঁড়াইয়া এক একটা মন্তব্য ঝাড়িতেছিলেন। গণেশ বলিলেন, "দাদা দেখ, সাহেবদের ।ান বাজনা, আর এদের গান বাজনায় কত তফাত! কেমন সুন্দর ।ারমনিয়ম বাজে, কেমন সুন্দর দীর্ঘ গলায় গায়!" জয়চন্দ্রের এই ।ানগুলি বড়ই ভাল লাগিতেছিল, তিনি বলিলেন, "হাঁ মামা, যেমন এক শয়ালে ডাকে পিছন হইতে অন্য শিয়াল তান ধরে।" বিষ্ণুপদ বলিলেন

Bravo Joy Chandra ! well remarked !*" গণেশ কিছু দিশাহারা হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা গানটা যেমন হউক, ওদের বাজনাটা ত আর মন্দ নয়।" হরিপ্রসন্ন একটু গাইতে ও বাজাইতে পারিতেন, তিনি বলিলেন, "ওটা একরকম বাঁশি, ওদের আবার বাজনা কি? বাজনার মধ্যে ত দেখি কেবল জয়ঢাক। কাল দেখ্‌লে না বিবি বাঁশি বাজালে তাহার সহিত লয় কল্লে একটা প্রকাণ্ড জয়ঢাক দিয়ে। ওরা যেমন কাঁচা থেকো তেমনি ঢাকের বাজনাই ভালবাসে।" গণেশ উহাদিগের সহিত আঁটিতে না পারিয়া জনতার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "উহারা পাগলের মত নাচিতেছে কেন? আর এক এক জন, সাপে কামড়ালে যেমন ঢলে ঢলে পড়ে, তেমনি ঢলে ঢলে পড়ছে কেন?" হরিপ্রসন্ন বলিলেন, "তাই ত ভাই, কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।" দীনেশ বাবু বলিলেন, "এ একটা হিষ্টিরিক ফিটের মত কিছু হবে।" বিষ্ণুপদ বলিলেন, "এ কিছু বুঝা যায় না ভাই।" জয়চন্দ্র কিছু বলিলেন না, কারণ এই গানে ও ভাবে তাঁহার মন বড়ই আকৃষ্ট হইয়াছিল। এ দলে না থাকিলে হয় ত তাঁহারও এ হিষ্টিরিক ফিট হইত।

সঙ্গীত তরঙ্গ আস্তে আস্তে থামিয়া গেল। বিষ্ণুর ভোগ হইল। সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। ঘন ঘন "মধুরস বাণী, ফের বলত শুনি" শব্দে গগন ভেদ হইতে লাগিল। চারি পাণ্ডের সুবন্দোবস্তে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই দুই তিন হাজার লোকের প্রসাদ গ্রহণ হইয়া গেল। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় যুগল ও কমল রায় মহাশয়কে ইঙ্গিত করিলেন, তাঁহারা উভয়েই দৌড়িয়া গিয়া কতকগুলি নূতন কাপড় ও কয়েকটা পূর্ণতহবিল লইয়া আসিলেন। গোসাঞির আদেশ মত কেহই পত্র ত্যাগ করিল না। নীলকণ্ঠ সেন, যুগল ও কমল রায় মহাশয় সকলকেই একটা একটা সিকি

* সাবাস জয়চন্দ্র। বেশ ব'লেছ।

দিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ রায় বসু মহাশয় ও দেবনাথ চৌধুরি মহাশয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনাথ অনাথিনী, কাণা খোঁড়া, অন্ধ আতুরদিগকে বস্ত্রদান করিতে লাগিলেন। দান শেষ হইল, জনতা কমিয়া গেল। বৃন্দাবনবাসী ব্রাহ্মণগণ প্রসাদ লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সায়াহ্নকাল উপস্থিত হইল। দেবনাথ চৌধুরি মহাশয় সথাগণ লইয়া ঘাটে সন্ধ্যা পড়িতে গেলেন। আজ সন্ধ্যা পাড়তে সকলেরই বড় পবিত্র বোধ হইল। সন্ধ্যা সমাপনান্তে সকলেই বিষ্ণুমণ্ডপের নিকট উপনীত হইলেন। বন্দনাদি পড়িয়া প্রণাম করিলেন। বসু মহাশয় বলিলেন, "চল এখন মায়ের বাড়ী যাই। সকলেই প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই মন্দিরের রোয়াকের উপর বসিলেন। পূজারী ঠাকুর ধূপ দীপ দ্বারা আজ মনের মত আরতি করিলেন। মায়ের বাড়ী আসা মাত্রই নীলকণ্ঠ সেন মহাশয়ের হৃদয় ভক্তিতে উথলিয়া উঠিল। তিনি গাহিতে লাগিলেন :—

"মা আমায় ঘুরাবি কত,
কলুর চখ্‌ বাঁধা বলদের মত,
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত,
এখন খুলে দে মা চখের ঠুলি দেখি তব অভয় পদ"।

* * * * * *

এই গানটী শেষ হওয়া মাত্র দেবনাথ চৌধুরি মহাশয় গাহিতে লাগিলেন :—

"ধরাধাম জীবন আশা গেলনা সকলি গেল"।
কৌমার যৌবন গত, জরা আগমন হ'ল।
ছিল না মা জল পাত্র, কর পাত্র ছিল মাত্র,
বাঞ্ছা ছিল জল পাত্র মাত্র হয় সম্পদ।

তা দিলে না দিলে ঘড়া, বাঞ্ছা তাতে হ'ল বাড়া
ব্রহ্মাণ্ড পাইলে তারা হয় সে ভাল।
সমান বয়সী যত, প্রায়শঃ হইল হত,
ন্যূন জ্যেষ্ঠ গত কত, কত কহিব;
আপন পঞ্চত্ব হবে, মনে মনে জানি সবে,
তবু চিরজীবী ভাবে, ভ্রান্তি রহিল।
চক্ষের মা গেল জ্যোতি, শ্রবণের গেল শ্রুতি,
মনের গেল মা স্মৃতি, চরণের গতি,
আছে কান্তা অভিলাষ, অদর্শনে আসার আশ,
দরশনে জরা বলে কি দায় হ'ল।
তোমার মায়ার গুণে, পদ্মযোনী পঞ্চাননে,
ক্ষীরদ শায়ীরসনে ভ্রান্তে ভ্রমিল।
শ্রীরাম দুলালে ভাষে, সুপ্রসন্ন হও দাসে,
বাঞ্ছাপূর্ণ কর এসে সেই সে মঙ্গল॥

কিছুকাল সকলেই নীরব রহিলেন। বসু মহাশয় গাহিতে লাগিলেন।
"দোষ কার নয় গো মা
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"।

* * * * * *

লক্ষ্মণ রায় গাহিতে লাগিলেন :—
"মায়ের নাম লইতে রসনা,
অলস হ'ওনা যা হবার তাই হবে,
ঐহিকের সুখ হলনা বলে কি ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে"॥

* * * * * *

এইরূপ বিশুদ্ধ ভাবে মায়ের আরাধনা শেষ হইল। সকলে করযোড়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় সকলেরই এই পৃথিবীর সমস্ত অসার বোধ হইতে লাগিল। এইরূপ শান্তি সলিলে হৃদয় পরিষ্কার করিলে উহাতে সার বই আর কিছু থাকে না। সুতরাং এজগতের সকলই অসার বোধ হয়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে মানবহৃদয় লৌহে গঠিত, নিয়ত পরিষ্কার রাখিতে না পারিলে মরিচা ধরিয়া আবার কাল হইয়া যায়। এই কারণেই আর্য্য ঋষিগণ সেইখানে প্রস্থান করিতে আদেশ করিয়াছেন, যেখানে তাপ উত্তাপ নাই, ঝড় বৃষ্টি নাই, কেবল শান্তি বারিই মৃদু মধুর কল্লোলে তর তর করিয়া দিবা নিশি বহিতেছে।

সকলে আসিয়া বিষ্ণু মণ্ডপের রোয়াকে উপবেশন পূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আহার সমাপনান্তে লক্ষ্মণ রায় মহাশয় ভ্রাতৃদ্বয়ের-দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "তোমাদের সহিত একত্রে বসিয়া আমার এই শেষ আহার।" উভয়ে সবিস্ময়ে তাঁহার মুখ পানে বিরস নয়নে চাহিয়া রহিলেন। রায় মহাশয় বলিলেন, "তোমরা অমন করিয়া বিরস বদনে চাহিয়া রহিলে কেন? তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি মহাপ্রস্থান করিতেছি না। আমি কল্য কি পরশ্ব সস্ত্রীক ৺ কাশীধাম যাইতে মনন করিয়াছি। তোমরা মায়াজাল বিস্তার করিয়া আমার গতি রোধ করিও না। তোমরা এখন নাবালক নহ। ধন সম্পত্তি যথেষ্ট আছে।" এই কথা শুনিয়া উভয় ভ্রাতাই বলিলেন, "আমরাও যাব।" লক্ষ্মণরায় বলিলেন, "তোমাদের এখন যাওয়ার সময় হয় নাই। পুত্র পুত্রবধূ প্রভৃতি ভববন্ধন রহিয়াছে। আগে আস্তে আস্তে এই সব হইতে মুক্ত হইতে অভ্যাস কর। তাহার পর যাইও, আমার সহিত সেই সময়ে দেখা হবে। আমি শীঘ্র মরিতেছি না। এত দৃঢ়কায়া শীঘ্র নিপাত হয় না। আমি

আদেশ করিতেছি তোমরা আমার এই সৎকামনায় বাধা জন্মাইও না। যদি ভাইয়ের মত ভাই হও তাহা হইলে আমার যাওয়ার উদ্‌যোগ করিয়া দেও। আরও এক কথা বলি এ কথা অদ্য রাত্রিতে কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।" ভ্রাতার দৃঢ় বাক্যে উভয়েই আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। বসু মহাশয় ব্যতীত আর সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। দেবনাথ চৌধুরি মহাশয় বলিলেন, "বেশ সংকল্প করিয়াছ আমিও যাব হে।" লক্ষ্মণ রায় মহাশয় বলিলেন, "তোমার পুত্র আছে যাইতে পারিবে না।" চৌধুরি মহাশয় বলিলেন, "তাহাতে বাধা কি? পুত্র এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে।" এই কথাতে তিনি উত্তর করিলেন, "যদি যাওই তাহা হইলে ছেলেটাকে বিবাহ করাইয়া যাইও। পিণ্ডের আশা থাকুক আর না থাকুক পরিবারে অন্ততঃ হিন্দু নামটা থাকিবে।" চৌধুরি মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা তাই করিব।" লক্ষ্মণ রায় মহাশয় বলিলেন, "হরিদয়াল তোমার সাথি হইবে।" চৌধুরি মহাশয় বসু মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "ঠিক গোল ক'র না। যোগাড় করিতে থাক।" নীলকণ্ঠ সেন মহাশয় যুগল ও কমল রায় মহাশয়কে প্রবোধ দিতেছিলেন বলিয়া তাঁহারা তিন জনেই এসব কিছুই শুনিতে পাইলেন না। আহারান্তে ছয়জনেই একখানে উপবেশন করিলেন। কিছুকাল পর লক্ষ্মণ রায় মহাশয় যুগল ও কমল রায় মহাশয়দ্বয়কে বলিলেন, "তোমরা এখন বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখ সকলের আহারাদি হইয়াছে কি না। তোমাদের পরিশ্রম করিবার অভ্যাস নাই, বিলক্ষণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, শীঘ্রই গিয়ে শয়ন কর।" তাঁহারা বুঝিলেন এ স্থানে থাকা এখন দাদার অভিপ্রেত নহে সুতরাং উঠিয়া গেলেন। নানারূপ খোস গল্প চলিতে লাগিল। কিছুকাল এইভাবে গেলে পর লক্ষ্মণ রায় মহাশয় বসু মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর

বিলম্ব কেন? লেখা পড়া সেরে ফেল। বসু মহাশয় বলিলেন, "সবই হইয়াছে এখন উমাসুন্দরীর কি করা উচিত?" "কেন, সেনপাড়ার নিকট যে একখানা খারিজা তালুক আছে তাহার এক তৃতীয়াংশে মাসিক পঁচিশ টাকা লাভ হয়। তাহাই তাহার জীবিকাস্বরূপ লিখিয়া দেও, বিধবা কন্যা, জীবন স্বত্ব হইলেই যথেষ্ট, একেবারে দান বিক্রয়ের স্বত্ব লিখিয়া দিলে দীনেশের বিশেষতঃ গণেশের মনে বড় কষ্ট হইবে। উহারাই এখন প্রকৃত উত্তরাধিকারী কি না? উত্তরাধিকারীগণকে নৈরাশ করা উচিত নহে। কন্যাও পালনীয়া, সুতরাং তাহার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া রাখা উচিত। বিশেষতঃ আমি অভাবে চৌধুরি ভায়াদের প্রতাপে অন্য কেহই উহা উপভোগ করিতে পারিবে না; উমাসুন্দরীর উহাতে অংশ থাকিলে এ ভায়ারা কিছু করিবেন না বরং তালুকের উন্নতিই করিবেন।" দেবনাথ চৌধুরি ও নীলকণ্ঠ সেন মহাশয় হাসিতে লাগিলেন। "কোন ভূসম্পত্তি দেবোত্তর দেওয়া আবশ্যক করে না, কারণ বিষয়গুলি পৈত্রিক, তাঁহারাই যাহা দিয়াছেন তাহাতেই সেবা সুন্দর মত চলিতেছে। তবে আমার সঞ্চিত ধন হইতে কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য। পাঁচ হাজার ৺কালী, পাঁচ হাজার ৺বিষ্ণু বিগ্রহের অর্চ্চনার্থ, তৎপর আমার অংশে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা রহিল। ইহার পাঁচ হাজার আমি সঙ্গে লইব, বক্রী টাকা হইতে এক হাজার ইষ্টদেবতা, পাঁচশত নায়েব, এক হাজার দীনেশ ও গণেশের স্ত্রী, বক্রী যাহা রহিল তাহা সকল ভাইয়েই স্থাবর সম্পত্তির সহিত তুল্য ভাগে পাইবে।" এই সকল কথা অনুসারে বসু মহাশয় মুসাবিদা করিলেন। নীলকণ্ঠ সেন মহাশয় উইলখানা পরিষ্কার করিয়া লিখিলেন। লক্ষ্মণ রায় দস্তখত করিলেন। দেবনাথ চৌধুরি মহাশয় সাক্ষিস্থলে দস্তখত করিলেন। এই সমস্ত লেখা পড়াতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

ওদিকে যুগল ও কমল রায় মহাশয় একখানে বসিয়া কথার উপর কথা তুলিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী স্বামীর ইঙ্গিত মতে উমাসুন্দরীর নিকট কথা পাড়িলেন। এ কথা সে কথার পর বলিলেন, উমা মা আমি একটা কাজ করিতে সংকল্প করিয়াছি।"

উমা। কি মা ?

মাতা। তুমি যদি আমাকে করিতে দাও, তাহাতে যদি বাধা না দাও তাহা হইলে তোমার নিকট বলি।

উমাসুন্দরী চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার মুখ বিষণ্ণ। কিছুকাল নীরব থাকিয়া তাঁহার বলিবার পূর্ব্বেই বলিলেন, "মা আমি বুঝেছি। আমাকে ছাড়িয়া যাইতে চাও। ও আশঙ্কা ত আমি, তোমার মাছ না খাওয়া, বিষ্ণুমণ্ডপে সর্ব্বদা পড়িয়া থাকা, আর আজ কয়দিন যাবৎ ঘরের কোন্ খানে কি টাকা কড়ী আছে, সাবেকি জিনিস ও কাগজ পত্র কোথায় কি আছে তাহা তোমাকে নিবিষ্ট মনে খুঁজে খুঁজে বাহির করিতে দেখিয়াই ঠিক্ করিয়া আসিতেছি। এতেই বুঝি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া আসিয়াছ। তা মা, তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই, আমি কোন বাধা দিব না। তুমি আমাকে যাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়া বড় সুখী হইয়াছিলে সেই ত আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার ত আর ছাড়িয়া যাওয়ার কথা ছিল না, তোমারই ত ছাড়িয়া যাওয়ার কথা।" এই কথাগুলি শুনিয়া মাতার মনে বিষম আঘাত লাগিল, তিনি হো হো করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উমাসুন্দরীও কাঁদিতে লাগিলেন। মায়ের কান্না দেখিয়া মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি পাতকিনী মায়ের মনে ব্যথা দিয়া দিয়া জীবনটা কাটাইলাম।" মন দৃঢ় করিয়া বলিলেন, "মা তুমি আর কেঁদ না। আমার মনে ব্যথা

নাই।" মাতা বলিলেন, "আর যেন কাঁদিতে না হয় তাহার নিমিত্তই আমি কাশী যাইতে চাহি।" এবার উমা সরল মনে কহিলেন, "মা, তুমি শান্তমনে যাও। বিশ্বেশ্বরের চরণ দর্শন করিয়া মন শীতল কর। আমি তোমার সঙ্গে যাইতে চাহিব না, কারণ আমি ত তোমার মত যাইতে পারিলাম না। আমি আর এক সাধনায় ব্রতী। তুমি আমাকে যে ধন দিয়াছিলে সেই ধন আর জন্মে পাইব বলিয়া তাঁহার ভিটায় থাকিয়া তপস্যা করিতেছি। মৃত্যু হইলে সেই চিতায় যেন এ দেহ ভস্ম হয়। জন্মান্তরে সেই ধন যেন আবার পাইয়া তোমার মত শাঁখা হাতে, সিঁথিতে সিন্দুর লইয়া বিশ্বেশ্বরের চরণ দর্শন করিয়া পূর্ণ কলেবরে মুক্ত হইতে পারি। মা, তুমি আমার নিমিত্ত দুঃখ করিও না, আমার পূর্ব্ব জন্মের পাপক্ষয় হইতে দেও। তোমাদের যাইবার সময় আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িলে তোমরা কেঁদ না। আমার অন্ন বস্ত্রের ভাবনা ভেব না। আমার ঘরে খাবার আছে। শাশুড়ির পেটের দেবর আছে। নিজের পুত্র সম ভাগিনা আছে। আমার সবই আছে। আমি উহাদের মায়ায় ডুবিয়া রহিয়াছি। তোমাদের ভাবনা আর ভাবিতে পারিব না। তোমাদের নিমিত্ত আর কাঁদিতে পারিব না।" এই সকল শুনিয়া মাতা নীরব হইলেন। চাহিয়া দেখিলেন, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। দেবনাথ চৌধুরি, নীলকণ্ঠ সেন, যুগল ও কমল রায় সকলেরই অনিদ্রায় রাত্রি কাটিয়া গেল।

লক্ষ্মণ রায় মহাশয় প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া সহধর্ম্মিনীর নিকট গেলেন, তিনি তাঁহাকে দেখামাত্রই বলিলেন, "কোন আশঙ্কার কারণ নাই। উমা সম্মত হইয়াছে। তবে আজ না কল্য, কিছু কাজ বাকী আছে। রায় মহাশয় ঘরের বাহির হইবেন এমন সময়ে উমাসুন্দরী তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা,

এ পাপিনীকে জন্মদান করিয়া আপনার ইহকালের কোন কাজই হইল না। পিণ্ডের আশা ত নাই, আমার কষ্টেই আপনার জীবন কষ্টে শেষ হইল। আপনার শান্তির পথে আমি বাধা দিব না। আমি কাঁদিব তাহা দেখিয়া আপনারা কাঁদিবেন না। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন এই জন্মেই যেন আমার সমুদয় পাপ ভোগ শেষ হইয়া যায়।" রায় মহাশয়ের বুক ফাটিয়া আসিতে লাগিল। অতি কষ্টে মনের গতি ফিরাইয়া বলিলেন, "মা আমি তোমাকে আর বেশী কি আশীর্ব্বাদ করিব। যদি ভগবান এই পাপীর কথা শুনেন তাহা হইলে এই আশীর্ব্বাদ করি তুমি শান্তিলাভ কর।" উমাসুন্দরী বলিলেন, আমি আর কাঁদিব না, এই দেখুন আমি আপনার আশীর্ব্বাদে শান্তিলাভ করিয়াছি।" এই বলিয়া উঠিয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কখন যেতে চান?" রায় মহাশয় বলিলেন, 'কল্যই'। এই বলিয়া উদাসমনে বন্ধু মহাশয়ের নিকটে ফিরিয়া আসিয়া জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিনী উমাসুন্দরীকে সঙ্গে করিয়া, আত্মীয়া কুটুম্বিনীদিগকে শুভকার্য্যান্তে ব্যবহার স্বরূপ কাপড় বিতরণ করিতে লাগিলেন। কুলীনপত্নীদিগকে রাসমণ্ডল, গরদ, আর সকলকেই ঢাকাই সাড়ী ও তসর দিতে লাগিলেন। গরীব স্বজনদিগকে এমতভাবে সিধা সামগ্রী দিতে লাগিলেন যেন ছয়মাস কাল খাবার ভাবনা না থাকে। এই ব্যাপারে দিন অবসান হইয়া গেল।

রায় মহাশয়ের সস্ত্রীক কাশীবাসী হওয়ার কথা শুনিয়া কেহ আশ্চর্য্য কেহ স্তম্ভিত, কেহ শোকান্বিত কেহ বা আহ্লাদিত হইলেন। মেজ বউ ও ছোট বউ বড়ই শোকাকুলা হইলেন। দীনেশ, গণেশ, হরিপ্রসন্ন, রামচন্দ্র বসিয়া যাহার মনে যেমন ভাব হইল, সে সেরূপ আলাপ করিতে লাগিল। এমন সময় নকড়ী পোড়া হাতখানা নেকড়া দ্বারা বাঁধিয়া সেথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখা মাত্রই গণেশ বলিলেন, "কিহে

কাল মহোৎসবের সময় যে তোমাকে দেখিতে পাইলাম না?" নকড়ী উত্তর করিল, "আজ্ঞা আসিয়া কি করিব, মহোৎসব ত নয়, টাকার মহোৎসব। দাল দালনা খেয়ে কি হবে?" গণেশ বলিলেন "জেঠা মহাশয় কাশীবাসী হইতে যাইবেন একথা শুনেছ?" আজ্ঞা হাঁ শুনেছি, সকল টাকাগুলিই ত ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন, এখন না যেয়ে করেন কি? হরিপ্রসন্ন, বিষ্ণুপদ, ও জয়চন্দ্র একে অন্যের দিকে চাহিতে লাগিলেন। দীনেশ তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "তোর এত অস্পর্দ্ধার কথা কেন?" "আজ্ঞা আপনাদের টাকাগুলি উড়িয়া যায় দেখিয়া মনে বড় ব্যথা হয়, তাইতে বলিলাম।" "আচ্ছা যা তোর ও সমালোচনা ক'রে দরকার নাই।" নকড়ি কিছু অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া গেল। এই সময়ে জেঠীমাতা কোন কথার নিমিত্ত দীনেশ ও গণেশকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা উঠিয়া গেলেন। বিষ্ণুপদ বলিলেন, "দেখ গোলাম বেটার কত আস্পর্দ্ধা। ও বেটা আমার লোক হইলে মুখে জুত মেরে তাড়াইয়া দিতেম।" হরিপ্রসন্ন বলিলেন, থাম, শীঘ্রই ইহার সদুপায় করিব।" জয়চন্দ্র বলিলেন, "তা হ'লে ভাই বড় সুখী হইব।"

পরদিন প্রাতে লক্ষ্মণ রায় মহাশয়, নীলকণ্ঠ সেন ও দেবনাথ চৌধুরী মহাশয়কে লইয়া উইলখানা হাতে করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। যুগল ও কমল রায় মহাশয়কে ডাকিয়া আনিয়া দীনেশ ও গণেশ প্রভৃতি সকলকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। উমাসুন্দরীকে ডাকিয়া বলিলেন,"তোমার গর্ভধারিণীকে বল তিনি বৌমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া ঐ কোঠায় বসুন। দীনেশ ও গণেশের স্ত্রীকে আমার নিকট লইয়া আইস।" তাঁহারা সকলে বারাণ্ডায় বসিলেন। উমাসুন্দরীর চক্ষু দিয়া আজ জল পড়িতেছিল না। বিষম শোকাগ্নি হৃদয়ে

প্রবেশ করিয়া সমুদয় শুকাইয়া ফেলিয়াছিল। তিনি কলের মত আদেশ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বউ দুইটিকে বাপের নিকট লইয়া গেলেন। তিনি দুইজনকে দুই উরুদেশে বসাইয়া মাথার কাপড় ফেলিয়া গায় মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ক্রমে বারেণ্ডা পরিপূর্ণ হইল। ঘরের ভিতর মেয়েরা এসে পরিপূর্ণ করিল। উমাকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া রায় মহাশয় বলিলেন, "মা, তুমি আমার পিছনে এই দরজার সম্মুখে ব'স।" তিনি বসিয়া পড়িলেন। কাহারও মুখে কোন শব্দ নাই সকলেই চিত্র পুত্তলির ন্যায় রহিলেন। রায় মহাশয় উইলখানা হাতে লইয়া পড়িতে লাগিলেন। সকলেই বিস্ময়ের সহিত শুনিতে লাগিল। এতগুলি নগদ টাকার কথা শুনিয়া যুগল ও কমল আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। উমা বলিলেন, "আমার ঘরে খাবার আছে, আমাকে আবার কেন?" ইহাতে রায় মহাশয় একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "মা, আমার মনে যাহা ভাল লাগিয়াছে আমি তাহাই করিয়াছি, লওয়া না লওয়া তোমার এক্তার।" উমাসুন্দরী এ কথায় কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় ভ্রাতাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "পৈত্রিক জমিদারিতে পিতার বর্ত্তমান অবস্থায় বিশ হাজার টাকা বার্ষিক আয় ছিল, এখন চল্লিশ হাজার আন্দাজ হইয়াছে। এই আয় হইতে আমি গড়ে পনর হাজার টাকার বেশী বাৎসরিক ব্যয় করি নাই। তোমরা মামলা মোকদ্দমার খরচ চালাইয়াছ বলিয়া এত টাকা জমা করিতে পারিয়াছি। তোমরা যখন যে টাকা দিয়াছ তাহা আমি দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাসের বার ক্রিয়াতে ব্যয় করিয়াছি। আমার নিজের নিমিত্ত কোনরূপ ব্যয় করি নাই। আমি তোমাদের ন্যায় ভাল পরা ভাল খাওয়ার নিমিত্ত লালায়িত নহি। এই সমস্ত কারণেই এতগুলি টাকা সংগ্রহ করিতে

পারিয়াছি। আমি আশা করি তোমরা আমার এই বহুপরিশ্রম-উৎপন্ন ধনগুলির অপব্যবহার করিবে না।" এই বলিয়া উঠিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। তিনি ভ্রাতাদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া তাঁহার শয়ন ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিনীর দিকে চাহিলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ঐ কোঠার সংলগ্ন উত্তরের কোঠায় প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণ রায় মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "এই যে পুঁথিগুলি দেখিতেছ উহার প্রায় বার আনাই তন্ত্র। আর চারি আনা ব্যাকরণ, সাহিত্য ও আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ, এই গ্রন্থগুলি দাদা বড় ভালবাসিতেন, সর্ব্বদাই পড়িতেন। আমি সমস্তই অতি যত্নে রাখিয়াছি। তোমরাও রাখিও। এ সম্পত্তি অনেকের ঘরে নাই। তৎপর তাঁহার স্ত্রীরদিকে চাহিবা মাত্রই তিনি একটা বাক্স খুলিয়া কতকগুলি কাগজের তাড়া বাহির করিয়া দিলেন, "এই সমস্তই লগনী টাকার খত।" আরও একটা তাড়া বাহির করিলেন, রায় মহাশয় বলিলেন, "এই সমস্ত জমিদারী সম্বন্ধে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দলিল। ইহার মধ্যে কুরসী নামা প্রভৃতি অনেক গোপনীয় কাগজ আছে।" বড় বধু কাগজগুলি বাক্সে বন্ধ করিয়া চাবিকটি যুগল রায় মহাশয়ের হাতে দিলেন। তৎপর একটা বিলক্ষণ বড় রকমের বাক্স খোলা হইল। রায় মহাশয় উহার মধ্যে যে যে নগদ সম্পত্তি ও জহরাত আছে তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে লাগিলেন। বড় বধু পূর্ব্বের মত চাবিকটি যুগল রায় মহাশয়ের হাতে দিলেন। এইরূপে সোণা রূপার জিনিস পত্র একে একে দেখান হইল পর, লক্ষ্মণ রায় মহাশয় একখানি ফর্দ্দ যুগল রায় মহাশয়ের হাতে দিয়া, "লগনী টাকা যাহাকে যাহাকে রেহাই দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন আর যাহাকে যাহাকে স্বতই রেহাই দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহার বিশেষ বিবরণ ইহাতে লিখা আছে' এই বলিয়া তোষাখানা হইতে বাহির হইয়া সহধর্ম্মিণীকে প্রস্তুত হইতে আদেশ

করিলেন। "আমি প্রস্তুত আছি" এই বলিয়া তিনি হাতের সোণার কঙ্কণ খুলিয়া আর এক যোড়া নূতন কঙ্কণ পরিলেন। গলার সোণার মালা খুলিলেন। এই উভয় অলঙ্কার আঁচলে বাঁধিলেন। সিঁথিতে খুব ভাল করিয়া সিন্দুর দিলেন। বাম হাতে মালার ঠোঙ্গা ডান হাতে একটি সিন্দুরের কোটা লইলেন। উমা তখন তাঁহাদের নিকটই ছিলেন। মায়ের চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "মা তুমি আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির নিমিত্ত ভগবান বিশ্বেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও, তিনি তোমার কথা শুনিবেন"। ইহার পর পিতার চরণে প্রণিপাত করিলেন। মেঝ বউ ছোট বউ প্রভৃতি সকলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। বড় বউ নিজ সিঁথি হইতে সিন্দুর লইয়া সকলের সিঁথিতে দিতে লাগিলেন। হরসুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়াই স্বামী স্ত্রী দুই জনেরই বড় মমতা হইতে লাগিল। উভয়েই একটু স্থির ভাবে রহিলেন। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় দেখিতে পাইলেন যেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে হস্তদ্বারা তাড়াতাড়ি যাইতে ইঙ্গিত করিতেছেন। তিনি বলিলেন "চল"। রায়জায়া আর এ দিগ ওদিক না চাহিয়া স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। উঠানে নামিয়াই উমাকে সম্মুখে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি আসিলে পর অঞ্চল হইতে কঙ্কণ ও মালা খুলিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। তিনি বলিলেন, "ইহাদ্বারা আমি কি করিব ?" মাতা উত্তর করিলেন, "জয়চন্দ্রের বউর মুখ দেখিও। তাহার পড়ার খরচের ভাবনা নাই। ঠাকুরপোরাই চালাইবেন। আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার শ্বশুরের ভিটায় যেন দালান হয়। রামশরণ যেন অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া তোমাদিগকে প্রতিপালন করে। মা, তুমি এখন ঘরে ফিরে যাও আমায় আর মায়া দিয়ে বেঁধ না। পেটের সন্তানইত পিতা মাতার স্বর্গ কামনা করে।" উমা সুন্দরী এই কথা শুনিয়াই আর

এগাইলেন না। দুঃখে অস্থির হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। হরসুন্দরী ও তাঁহার মাতা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া রাখিতে লাগিলেন। দীনেশ, গণেশ সকলেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় জয়চন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দাদা, তোমরা আর আমার পিছনে পিছনে আসিয়া আমার গতি রোধ করিও না। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা নিরাপদে দীর্ঘ জীবন লাভ কর।" সকলেই তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিলেন। জয়চন্দ্রের চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। দীনেশ হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গণেশ, বিষ্ণু, হরি, সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ রায় মহাশয় আর বিলম্ব না করিয়া স্থাপিত দেব দেবীর মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক নৌকা অভিমুখে চলিলেন। দেবনাথ চৌধুরী হরিদয়াল বসু ও নীলকণ্ঠ সেন মহাশয় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। যুগল ও কমল রায় নিঃশব্দে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া নৌকার নিকট দাঁড়াইলেন। রামদিন দোবে, ও হনুমান মিছরকে বলিলেন, "তোমরা খুব সাবধানে পথ চলিও, ধর তোমরা এই পঞ্চাশ টাকা এখন নেও, পঁহুছতক নিয়া ফিরিয়া আসিলে বিলক্ষণ বকসিস পাবে।" উভয়ে উত্তর করিল, "কুছ্ ভয় ন লাগে হুজুর আমরা একলাই পঁহুছিয়া দিয়া আসিতে পারি। আপনারা সুস্থির থাকুন আমরা এহি ফিরিয়া অলাম আর কি।" লক্ষ্মণ রায় মহাশয় নৌকায় যাইয়া দেখিলেন দয়াল গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া ছাথায় বসিয়া আছে। দেখিয়া অবাক্ হইলেন। কিছুকাল পরে বলিলেন, "কি হে দয়াল তোমার এ সাজ কেন?"

দয়াল। আজ্ঞা আপনাদের আজ এ সাজ কেন?

লক্ষ্মণ রায়। তোমার পুত্র সন্তান আছে, ছেলের ঘরে নাতি হইয়াছে সুখ স্বচ্ছন্দে সংসারের সুখ উপভোগ কর। আমাদের সঙ্গে কষ্ট করিতে যাবে কেন?

দয়াল। আমি চিরজীবনটা আপনার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া শেষকালে কি ছেলেপিলের দাসত্ব করিব। আমার স্ত্রী নাই। পুত্রেরা এখন সংসার করিয়া খাইতে পারে। আপনাদের দয়াগুণে যথেষ্ট ক্ষেত খামার আছে। উহাতেই সুখে খাইতেছে তবে আমি আমার চিরজীবনের অনিবের সেবা ছাড়িয়া শেষ কালটা পুত্রগণের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব কেন? (রায় মহাশয়ের স্ত্রীরদিকে চাহিয়া) মা, আপনার কি শেষে এই বিচার হইল?

রায় মহাশয়ের স্ত্রী। এ যেতে চায় তাহাতে বাধা কি? জীবনটা আমাদের দাসত্বে কাটাইয়াছে। ইহার পরকালটাও আমাদের দেখা উচিত।

লক্ষ্মণ রায়। আপত্তি কিছুই নাই বরং নিতেই ইচ্ছা করে ইহার ছেলেরা যেতে দিবে কি?

দয়ালের পুত্র দু'টি সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল। এই কথা শুনা মাত্র বলিল, "আজ্ঞা আমরা অনেক বুঝাইয়াও উহাঁকে রাখিতে না পারিয়া শেষে সম্মতি দিয়াছি।"

লক্ষ্মণ রায়। আচ্ছা বাবারা ভালই করেছ। কমল! ইহারা নিতান্ত অনুগত লোক, ইহাদের প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিও। জমিগুলি যেন বহাল থাকে। নাথারাজ খায় বলিয়া মনে কিছু ভেব না।

দয়ালের মুখ প্রফুল্ল হইল। এই সব গণ্ডগোলে অনেক বেলা হইয়া গেল। বসু মহাশয় বলিলেন, "এখানেই আহারটা সেরে নেওয়া যাউক। বৃন্দাবনী ব্রাহ্মণেরা পাক করিতে লাগিল। খুব সংকীর্ত্তন হইল। আহারান্তে লক্ষ্মণ রায় নৌকা ছাড়িলেন। রামদিন ও হনুমান কমল রায় মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কুছু ভয় ন আছে মহারাজ। আমরা এই

আসিলাম অর কি।” হরিদয়াল ও দেবনাথ বাড়ী রওনা হইলেন। যুগল ও কমল রায় মহাশয় বিরস মনে নানা কথা কহিয়া কহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী আসিতে লাগিলেন।

এদিকে দীনেশ ও গণেশ বাবুর কান্নার বিরাম হইলে পর, হরিপ্রসন্ন দীনেশ বাবুকে বলিলেন, “তোমার জেঠার মত Impartial লোক পৃথিবীতে কম জন্মে। তিনি কি চমৎকার Economical ছিলেন, what a princely income তিনি তোমাদের নিমিত্ত রাখিয়া গিয়াছেন! নকড়ী বেটা কাল কি বলেছিল হে, এমন পাজি লোক ত আর পৃথিবীতে জন্মায় না।” দীনেশ বলিলেন, “হাঁ আমিও উহাই ভাবিতেছিলাম। কেবল ও নয় আরও অনেক রকমের কথা ও বেটা বলেছে।” এই বলিয়া চক্ষু লাল করিয়া বলিলেন, “আচ্ছা দেখ্‌ছি।” হরিপ্রসন্ন বিষ্ণুপদের দিকে দৃষ্টি করিয়া ইঙ্গিতে বলিলেন, “কার্য্যসিদ্ধি হবার গোছ।” বিষ্ণুপদ বলিলেন, “দেখান আর তোমার মতন মেয়ে মানুষের কাজ নয়।” এই ব্যঙ্গ উক্তি শুনিয়া দীনেশ আরও জ্বলিয়া উঠিলেন। এবং বলিলেন, “আচ্ছা ভাই থাম দেখাচ্ছি” এই বলে এদিক ওদিক তাকাইতেছেন এমন সময়ে দুরদৃষ্ট ক্রমে নকড়ী ঐখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দীনেশ, “শালা কাল তুই কি বলে জেঠা মহাশয়কে ঠাট্টা করেছিলি” এই বলিয়া তাহার চুল ধরিয়া সপাসপ্ জুতা মারিতে লাগিলেন। গণেশও দেখাদেখি পাঁচ সাত ঘা বসাইয়া দিল। তাহার চীৎকারে লোক জন আসিয়া জড় হইতে লাগিল কিন্তু নায়েবের ইঙ্গিতে কেহই ছাড়াইয়া দিল না। ছাড়িয়া দেওয়া হইলে পর, সে নায়েবের নিকট গিয়ে নালিস করিল। তিনি বলিলেন, “বড় বাবু মেরেছেন তাহার আমি কি করিব?” বড় পীড়াপীড়ি করাতে বলিলেন, “তোর সব কথাই আমি জানি, মেব কর্ত্তাও আজ জানিবেন। যদি প্রাণ

নিয়ে থাকিতে ইচ্ছা থাকে তাহাহইলে ঘর দুয়ার ভেঙ্গে অদ্যই পলায়ন কর।" নকড়ী দেখিল বড় বিপদ, অমনি ঘর দুয়ার ভেঙ্গে টাকা কড়ী নিয়ে স্থানান্তর পলায়ন করিল। যুগল রায় মহাশয় বাড়ী আসিলে নায়েব সব কথা তাঁহার নিকট বলিলেন। "ও বেটা যে বেল্লিক তাহা আমি অনেক দিন হইতে জানি তবে দাদার ভয়ে এপর্য্যন্ত কিছু বলি নাই। ভালই করিয়াছ এ বেটার মুখ যেন আবার আমায় না দেখিতে হয়। সম্মুখে পড়িলে হয় ত খুন হইয়া যাইবে।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মানব স্বজাতি সম্মুখে না পাইলে ইতর জন্তুর সহবাস করিয়া শান্তি-লাভ করিতে যত্নবান হয়। তাহারই সেবা করে, তাহারই নিকট বসিয়া থাকিতে ভালবাসে। তাহার কথা কহিবার শক্তি না থাকিলেও তাহাকে প্রিয় সম্ভাষণ করে। আর যদি সম্মুখে মানব পায় তাহাহইলে তাহার নিকট যাইয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করে। মনে কর এক দেশে তুমি আর আমি মাত্র দুটি মানব। তাহাহইলে কিরূপ অবস্থা হয়? তুমি কি আমার নিকট আসিতে ইচ্ছা করিবে না? আমি কি তোমার নিকট যাইব না? অবশ্যই দুইজনে একখানে থাকিব। তুমি আমাকে ভালবাসিবে, আমি তোমাকে ভালবাসিব। একে অন্যকে না দেখিলে উভয়েই মনে ব্যথা পাইব। তোমার সহিত আমার কোন বিষয়ে অনৈক্য হইলে তুমি আমাকে মন্দ বলিবে, আমিও তোমাকে মন্দ বলিব। তুমি আমাকে মারিবে আমিও তোমাকে মারিব। মন্দ বলিব বটে, মারিব বটে, কিন্তু একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না, সুতরাং আবার মিল হইবে, আলাপ হইবে, ভালবাসা জন্মিবে। এই গেল সমকক্ষের কথা। আর তুমি যদি আমা অপেক্ষায় শক্তিসম্পন্ন হও, বুদ্ধি বেশী রাখ, তাহাহইলে আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করিব, ভক্তি করিব, আশ্রয়-স্থান বিবেচনা করিব, তোমার সেবা করিব, তোমাকে ভালবাসিব, সুতরাং সুখী হইব। তোমার সহিত আমার মনোবাদ হইবে না। তুমি আমাকে তোমার বশবর্ত্তী দেখিয়া, তোমাকে ভালবাসিতে দেখিয়া সুখী হইবে, আমাকে ছাড়িতে চাহিবে না; কেবল তাহা নহে, অন্যে আমাকে

আক্রমণ করিতে আসিলে তুমি প্রাণপণে আমাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। যদি রক্ষা করিতে না পার তোমার মনে বিষম ব্যথা হইবে। তুমি বিবেচনা করিবে আশ্রয় হীন হইলাম, আমিও তোমার বিলক্ষণ বল ছিলাম। এই গেল দুই মাতার দুটি সন্তানের কথা। এক সাধারণ উপাদানে শরীর ও মন গঠিত বলিয়া এত ভাব এত মমতা। আর তুমি আর আমি যদি এক পিতার ঔরসে এক মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, এক মাতার রক্তে যদি আমাদের শরীর গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি ইহা অপেক্ষায় শতগুণ ভালবাসা জন্মিবে না? স্বাভাবিক নিষ্কলঙ্ক চিন্তায় বলে অবশ্যই জন্মিবে। অন্য কোন জাতির হউক না হউক হিন্দুজাতির জন্মিয়াছিল। এই হেতু কুকুর, ষাঁড় প্রভৃতি জন্তুর ভাব হিন্দুপরিবারে বিকাশিত ছিল না। এই কারণেই প্রতি হিন্দুপরিবার বলীয়ান্ সদাশ্রয়যুক্ত ও ধনসম্পন্ন ছিল। এই ভাবের পূর্ণ বিকাশহেতু ভগিনী অনাথা পিসী, মাসী, খুড়ি, জেঠি প্রভৃতিকে এখন পর্য্যন্ত ভিক্ষা-বৃত্তির কিম্বা অনাথ-আশ্রমের আশ্রয় লইতে হইতেছে না।

একান্নভুক্ত হিন্দু পরিবার ধনশালী একথা শুনিয়া হয় ত কোন কোন আধুনিক সুশিক্ষিত সুসভ্য political economist, ভ্রান্ত লেখক ভ্রান্ত মতপ্রচার করিয়া জগতের অনিষ্ট করিতেছে বলিয়া গালিবর্ষণ করিবেন। আমরা তাঁহাদের নিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আচ্ছা, একান্নভুক্ত পরিবারদ্বারা কেবল দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়; ইহা ব্যতীত আর কোন ফল ফলে না, তাহাই মানিলাম। ধনাগম যে একজনের চেষ্টায় হয় তাহা তোমাকে কে বলিল? আচ্ছা মানিলাম তাহাই হইল। তোমার চেষ্টাতেই ধনাগম হইল। অন্যের সাহায্য না লইয়া তুমি তাহা বিস্তার ও রক্ষা করিতে পার কি? তা'ত তুমি পার না। তোমার অর্থ তোমার পেয়ারের ভৃত্য খায়, দক্ষিণ হস্তরূপ বাজার সরকার খায়

কাপুড়িয়ায় খায়। স্বর্ণকার খায়। তাহাতে তোমার মনে ব্যথা হয় ? না; ব্যথা হয় কনিষ্ঠ কি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাধ্য হইয়া খাইলে। যাউক ও সব কথা ও মরমের ব্যথার কথা, এ রামায়ণে ভূতের কচকচি কেন ? এ পৃথিবী ত ধন ধান্য পরিপূর্ণ হইলেও আমার মন ইহা নিরাশ্রয় স্থান বিবেচনা করে। সর্ব্বদাই ত হতাশ হইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। কেবল একমাত্র ভব-বন্ধনই আমার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। হতাশার মধ্যে আশার বিজলী দেখাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে দিতেছে না। এ বন্ধন যতই জটিল হয় ততই আমার নিকট শুভপ্রদ বোধ হয়। তুমি তাহা সংকীর্ণ করিতে চাহ কেন ? নিজের ঘরের দরিদ্রতা মোচন করিতে ঘৃণা জন্মাইয়া অজানা দেশের, অজানা লোকের অজানা দরিদ্রতা মোচন করিতে অর্থ পাঠাইতে আমাকে মুক্ত হস্ত হইতে বল কেন ? গোড়ায় জল না ঢালিয়া আগায়, কেবল আগায় নয়, শূন্যে জল ঢালিতে আমায় উত্তেজনা কর কেন ? আমি হিন্দু, কেবল হিন্দু নয়, কুসংস্কার-সম্পন্ন বাঙ্গালি-সন্তান। কুসংস্কারে ডুবিয়া রহিয়াছি; কুসংস্কারই আমার ভাল লাগে। এইরূপ কুসংস্কার লইয়া যতদিন বাঁচিব ততদিনই আমি এই নিরাশ্রয় স্থানকে আশ্রয় স্থান জ্ঞান করিয়া কাটাইব। আমি তোমাদের সহবাসে কালকর্ত্তন করিতেছি। তোমাদের মুখে কত অর্থনীতি, সমাজনীতি আরও কত কত বড় বড় নীতির কথা শুনিয়া আসিতেছি। তাহাতে আমার মস্তিষ্ক কত রূপই ঘুরিতেছে। ঘুরিতেছে বটে, কিন্তু তথাপি একান্নভুক্ত পরিবারের কথা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে এই নিরাশ্রয় পৃথিবীতে আশ্রয় একথা ভুলিয়া যাইতে পারিতেছি না। যুগল রায় ও কমল রায় মহাশয়ের কথা আর কি বলিব। তাঁহারা ত অগাধ পারস্য ভাষা, আধা হিন্দি আধা কৃষকের ভাষায় গঠিত ইতর বঙ্গভাষা কিছু কিছু জানিতেন। তাঁহাদের অসভ্য সময়ে এত

নীতির কথা ছিল না, অর্থনীতি কি তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তবে কেবল ভাগ্যবলে টাকা আসিত; ঘর ভরা ধান থাকিত। গোয়াইল ভরা গাভী থাকিত। ভাঁড় ভরা ঘি থাকিত। গায় কাশ্মিরী শাল ঝুলিত। দুয়ারে হাতী বাঁধা থাকিত। লোকজনের হাট বাজার করিবার নিমিত্ত গ্রামে রাস্তা হইত, খাল হইত, খালের উপর খিলান করা পুল হইত। বাসা বাড়ীতে বেহারা থাকিত, পাল্কী থাকিত। ভদ্রলোকের ছেলে পিলে আত্ম-জ্ঞানে পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পারিত। এ সমস্ত ভাগ্য বলেই ঘটে। এমন অশিক্ষিত অনীতিজ্ঞ যুগল ও কমল দাদার কথা কিরূপে ভুলিবেন? দাদা অপরিসীম ধন রাখিয়া গিয়াছিলেন সে দিকে তাঁহাদের মন গেল না। মন গেল দাদার গৃহত্যাগ দিকে। উভয়েই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এত দিনে আশ্রয়বিহীন হইলাম। দাদা বাড়ী থাকাতে কোন ভয় ছিল না, কোন দুঃখ ছিল না, পরিবার প্রতি-পালনের কোন ভাবনা ছিল না। অন্য কথা দূরে থাকুক তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিলে ব্যাধি পর্য্যন্ত আপনা আপনি চলিয়া যাইত। দাদা ও বধূ ঠাকুরাণীর গৃহত্যাগেই এতদিনে পিতা মাতার অভাব অনুভব করিতে হইল। এইরূপ নানা চিন্তার তরঙ্গ উঠিয়া উভয় ভ্রাতার মনকেই আলোড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল। ঘরে বাহিরে কাজ কর্ম্মে সকল দিকেই দাদার অভাব অনুভব করিয়া উভয়েই উষ্ণ শ্বাস নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া সংকল্প করিলেন, আজ কালই সহরে গিয়া বিষয় কর্ম্মে মন লিপ্ত করা উচিত। কাজের আধিক্যে থাকিলে দিন কাটিয়া যাইবে, নিরাশায় দিন দীর্ঘ বোধ হইবে না।

উমাসুন্দরীর কথা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি অশিক্ষিতা, কাজেই মায়াময়ী স্ত্রী মাত্র। আত্ম-সুখে কোন দিনই তাঁহার মন গলে নাই। পিতা মাতা তাঁহার কষ্টে ব্যথিত হইয়া গৃহাশ্রম পরিত্যাগ

করিয়া কঠোর আশ্রম অবলম্বন করিতে গেলেন এই কথা বার বার তাঁহার মনে উঠিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। এ কষ্ট তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, তবে হরসুন্দরী ও তাঁহার মাতা নানারূপ ভালবাসা দেখাইয়া তাঁহার ভালবাসা আকর্ষণ করিয়া লইতেছিলেন বলিয়া রক্ষা।

এ জগতে কতকগুলি লোক জন্মে যাহারা কেবল পরের কষ্ট ভাবিয়া ভাবিয়া নিজে বিষম কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। কেবল হিন্দুজাতির মধ্যেই এই জাতীয় লোকই বেশী দেখা যায়। সমাজের এই ভাব দেখিয়া অনেক সহৃদয় ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরই মনে ভাল লাগে না। এ কুভাব দূর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। পাঠক, তোমাকে অনুনয়ে বিনয়ে অনুরোধ করি, তুমি একটা প্রবন্ধ কি গ্রন্থ লিখিয়া বাঙ্গালির এই মজ্জাগত দোষটা দূর করিয়া ফেল। তুমি অন্ধকার বড় সাধের ও প্রিয়তম হইতেও প্রিয়তর উনবিংশ শতাব্দির লোক, তোমাদ্বারা এ সমাজ সংস্কার সম্ভব বলিয়া তোমাকে অনুরোধ করিতেছি। এই Nineteenth Century র বিলাতের কোন অপূর্ব্ব সমাজ-বিজ্ঞান লিখক chastity is but another name for weakness * লিখিয়া স্ত্রীর শক্তি, সামর্থ্য ও শ্রী অটল রাখিবার নিমিত্ত সন্তান উৎপাদন করার স্বেচ্ছাধীন পথে দেখাইয়া দিবিব সমাজসংস্কার করিয়া তুলিয়াছেন। তুমি কি এই একটা সমাজ দুর্ব্বলতা সমাজ হইতে দূর করিবার একটা পথ দেখাইয়া দিতে পারিবা না? যদি না পার তবে তোমার এত লেখা পড়া শিক্ষার ফল কি? পাঠক মহাশয়গণ মাপ করিবেন, অবান্তর কথায় অনেক এগিয়া পড়িলাম। সমাজ সংস্করণ কি কোন নীতির কথা না বলিলে আখ্যায়িকা গুলজার হয় না তাইতে এতগুলি কথা বলিলাম। এই আমার কৈফিয়ত, অতএব পাঠক মহাশয় আমাকে মাপ করিবেন।

উমাসুন্দরী দেখিলেন তাঁহার চক্ষের জল পড়িলে হরসুন্দরীর চক্ষে জল আসে। হরসুন্দরীর মাতার বুক ফাট ফাট করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হয়। গোপাল কাঁদে। জয়চন্দ্র বৎসহারা গাভীর মত ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া সকল দিক শূন্য দেখে। যুগল রায় মহাশয় তাঁহার কাতর মুখ দেখিলেই কোঁচার কাপড় মুখে চ'খে ঠাসিয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চলিয়া যান। এই সমস্ত দেখিয়া তিনি মনে মনে বড় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। মায়া আসিয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘেরিয়া ধরিল। তিনি এই সকল স্বজনের কষ্ট নিবারণার্থ পিতা মাতার নিমিত্ত অশ্রুবারি ফেলিলেন না। আস্তে আস্তে হৃদয়ের বেগ কমিয়া আসিল। তিনি একদিন গোপনে হরসুন্দরীকে বলিলেন :—

আমার ইচ্ছা বাবা যে বিষয়টা আমাকে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন উহা আমি গণেশ ও দীনেশকে দিয়া ফেলি। উহারাই ইহার উত্তরাধিকারী। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস এই দান উহাদের মনে ভাল লাগে নাই। তোমাকে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাবা আমাকে গোপনে কতকগুলি টাকা দিয়াছেন অনুমান করিয়া উহারা দুই ভাইয়ে কত কি কাণ্ডকারখানা করিয়াছিল।

হরসুন্দরী। তা আপনি দিতে চাহেন তাহাতে কোন বাধা নাই। আপনিই না বলিয়াছেন যে, এখন আমাদের খরচ খরচা বাদে রোজ রোজই দশ পাঁচ টাকা জমিতেছে। আমাদের কোন অভাব নাই। তবে একটা কথা এই কাহার ভাগ্যে কি আছে তাহা বলা যায় না। জানিনা আমাদের অদৃষ্টে বিধি কি লিখিয়াছেন। তবে এ কথা ঠিক, পোড়া অদৃষ্ট হইলেও যে পর্য্যন্ত শেষ পয়সাটি থাকে সে পর্য্যন্ত একখানি বস্ত্র দুই খণ্ড করিয়া দুইজনে পরিয়া কুটীরে বসিয়া খাইব। পরে কি হয় তাহা বলা যায় না। ইহাও দেখি, পেটের জ্বালায় লোকে কত কি না করিয়া থাকে। আপনি আপনার বিষয় লইতে চাহেন না। আর যেরূপ

বিদ্বেষের কথা তাহাতে না লওয়াই উচিত। তবে এই করিলে বোধ হয় ভাল হয়, আপনি উহাদিগকে বলুন যে "বাবা আমাকে এই বিষয়টা দিয়াছেন। উহার কোন টাকা আমার এখন লওয়ার প্রয়োজন নাই। তোমরাই উহা আদায় তহসিল কর, আমার প্রয়োজন হইলে আমি কিছু কিছু চাহিব, তোমরা পাঠাইয়া দিও।"

উমাসুন্দরী নিবিষ্ট মনে এই কথাগুলি শুনিতেছিলেন। পূর্ব্ব স্মৃতি মনে উঠিল। এই কথাগুলি তাঁহার নিকট বড়ই সারবান বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "ব'ন্, তুমি যাহা বলিলে তাহাই ঠিক। অদৃষ্টে কি আছে তাহা কে জানে? কালে যে এই গণেশ ও দীনেশের নিকট ভাতের নিমিত্ত লালায়িত হইতে হইবে না তাহাই বা কে জানে? বাবার সম্পত্তি বাবা আমাকে দিয়াছেন তাহা আমি রাখিব না কেন? অবশ্য রাখিব। প্রতি বৎসরই টাকা, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব লইয়া জমা করিতে থাকিব, খরচ করিব না।" হরসুন্দরী বুঝিতে পারিলেন যে গ্রহবৈগুণ্য হইলে এই সঞ্চিত ধনদ্বারা তিনি তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের চিরব্যবস্থা করিয়া যাইবেন মনন করিয়া টাকা জমা করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি বলিলেন :—

দিদী, আমার একটা মনের কথা শুন। আমি আজ হইতে এই মনন করিলাম যে, অদ্য হইতেই সংসারের ব্যয় কমাইয়া তোমার নামে তুল্য আয়ের তালুক কিনাইয়া এই তালুক তোমাদ্বারা ফেরত দেওয়াইব। তুমি তাহা গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। মা ভগবতী! তুমি ভরসা।

উমাসুন্দরী চাহিয়া দেখিলেন হরসুন্দরীর মুখ গম্ভীর ও প্রশান্ত। নয়ন ও কপোল হইতে কিরূপ একটি পবিত্রভাব প্রকাশ পাইয়া যেন বলিয়া দিতেছে তোমার সাধু ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইবে। কোন চিন্তা

করিও না, ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না। তিনি আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না হরসুন্দরীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন:—

তুমিই আমার মায়ের পেটের ভগিনী, আমার শোক নাই দুঃখ নাই। আজ হইতেই হরসুন্দরী বাড়ী যাওয়ার নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন। উমাসুন্দরীরও মত হইল। যাওয়ার উদ্যোগ হইল, যুগল রায় মহাশয় উমাসুন্দরীকে বলিলেন, "মা, আমরাও এখন দুই এক দিনের মধ্যে সহরে যাইব। তুমি কোন ভাবনা করিও না। আমি বিদ্যমানে তোমার কোন ভাবনা নাই। জয়চন্দ্রের কোন ভাবনা করিও না, উহার সব ব্যয় আমিই বহন করিব। জয়চন্দ্র যেমনই সৎবংশজাত তেমনই সুবুদ্ধি ও সচ্চরিত্র। বাঁচিয়া থাকিলে তোমার শ্বশুরের নাম থাকিবে। গোপালও এখন বড় হইয়াছে, এ ছেলেটিও খুব শান্তপ্রকৃতি, আমার ইচ্ছা উহাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই।" উমাসুন্দরী খুড়ার মিঠা কথাতে বড়ই আনন্দলাভ করিলেন। আহ্লাদের সহিত বলিলেন, "গোপালকে আপনি নিতে চাহেন তাহাতে কোন বাধা নাই, তবে আচার্য্য ঠাকুর বলেছেন যে উহার নাকি আর এক বৎসর রিষ্টি আছে। বাড়ীতে শীঘ্রই উহার মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়ন ও নবগ্রহ পূজা হইবেক। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদে রিষ্টিটা কোন মতে কাটিয়া গেলে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। আপনারাই ত উহাদের আশ্রয়স্থান।" রায় মহাশয় শুনিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, খগেশ ও রমেশকেও এখন নেওয়া হইল না। ওরা তিনজনে একত্রে যাইবে।"

সব ঠিকঠাক হইল। উমাসুন্দরী ও হরসুন্দরী বাড়ী চলিয়া গেলেন। দুই এক দিনের মধ্যেই যুগল ও কমল রায় মহাশয় দীনেশ, গণেশ প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া সহরমুখে রওনা হইলেন। যাওয়ার সময় নায়েবকে বলিলেন, "তোমার উপরই বিষয় সম্পত্তির সমগ্র ভার। তুমি

বয়সে বড়, দাদার সমবয়সী তোমাকে আমরা দাদার মতই জ্ঞান করি। বিষয় রহিল, তুমি জ্ঞান আর তোমার ধর্ম্মে জানে। কোন ছেলেপিলের কথায় কাণ দিও না। আমরা যে পর্য্যন্ত জীবিত আছি সে পর্য্যন্ত তোমার ভাবনা নাই। আর মরিয়া গেলেও তোমার সংস্থান করিয়া যাইব। আর একটা বিশেষ কথা এই যে, দাদা যে তালুকের অংশ উমাকে দিয়া গিয়াছেন তাহার আয় যেন বিলক্ষণরূপ বৃদ্ধি পায়।” নায়েব বলিলেন, “সে আশা বিরল, ও মায়ের যে দয়া, খাজনা বৃদ্ধি কি অন্য কিছু করিতে গেলেই রায়তজন তাঁহার নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িবে। অমনি সব রেহাই হইয়া যাইবে। এখন ন্যায্য খাজানা সম্পূর্ণ আদায় করিতে পারিব কি না তাহাই সন্দেহ। যাহা হউক আপনাদের হুকুম মনে রাখিলাম। দেখা যাবে কোনরূপ মিষ্টি ব্যবহারে যদি কিছু করিয়া তুলিতে পারি। একটি ভরসা এই যে উমা মায়ের কথা শুনিলেই প্রজাগণ বড় কর্ত্তার একমাত্র কন্যা বলিয়া অনেকেই নরম হইয়া আসিবে। হায়! তাঁহাকে প্রজারা এমনই ভালবাসিত। এমন মনিব কি আর হয়। প্রজার নিমিত্ত প্রাণ মন, প্রজারও মনিবের নিমিত্ত প্রাণপণ। আপনারা হয়ত জানেন না এই বিবাহে যে ১৯।২০ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে তাহার আট নয় হাজারই প্রজারা ইচ্ছাপূর্ব্বক মাথট করিয়া আপনা আপনিই আনিয়া দেয়। বেগার যে কত খাটিয়াছে তাহার ত কথাই নাই।” যুগল রায় মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে।”

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

উমাসুন্দরী ও হরসুন্দরী ভবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েক দিন অনুপস্থিত থাকাতে বাড়ী ঘরগুলি নিতান্ত আবর্জ্জনা পূর্ণ হইয়াছে। যাহার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছিলেন সে বিশেষ কিছুই করে নাই। এইরূপ অবস্থা দেখিয়াই হরসুন্দরী একটু বিরক্ত হইলেন। পতির নিকট একদিন শুনিয়াছিলেন নিজের কাজ নিজে না করিলে, নিজের জিনিস পত্র নিজে না দেখিলে পরদ্বারা তাহা সম্পন্ন ও রক্ষা হয় না। সেই কথাটি তাঁহার মনে পড়িল। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ী ঘরের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিলেন। যেখানকার যে জিনিস সেইখানে বিন্যস্ত করিলেন। কোন একটা জিনিস অপরিষ্কার দেখিলে তাঁহার মনটাও অপরিষ্কার বোধ হইত, যে পর্য্যন্ত জিনিসটি পরিষ্কৃত না হইত সে পর্য্যন্ত তাঁহার মনও পরিষ্কৃত হইত না। ঘরের জিনিস পত্র এল মেল ও বেসিজিল থাকিলে তাঁহার মনও এল মেল ও বেসিজিল বোধ হইত সেগুলি শৃঙ্খলা মত না রাখিলে তাঁহার মন প্রকৃতিস্থ হইত না। এই কারণেই তাড়াতাড়ি কাজ করিতে হইলে তৈল বলিয়া ঘি ঢালিতেন না, চিনি দিতে হইলে লবণ দিতেন না, মৌরির পরিবর্ত্তে জিরা পানে স্থান পাইত না, বেগুন ভাতে ভ্রমে কাহারও পাতে নেতা পড়িত না, কাপড় পরিতে গিয়া পিপ্‌ড়ার কামড়ে মুখ কাল হইয়া চক্ষু দিয়া জল পড়িত না, সুঁয়া পোকা গায় লাগিয়া সর্ব্বাঙ্গে চুণ মাখাইতে হইত না, বিছানায় শয়ন করিলে ছারপোকা দংশনে কপোল রক্তের আভায় রঞ্জিত করিত না, শিল নোড়ার নিকট পরিত্যজ্য মসলার অংশ পচিয়া নাক সঙ্কোচ

করাইত না। ভাতের হাঁড়ী ধরিতে গেলে নাকে মুখে কালী লাগিত না, নিতম্বের কাপড় হলুদে রঞ্জিত হইত না, জল পান করিবার সময় কাঁসার গ্লাস মাছের গন্ধ ছড়াইয়া পেটের ভিতরের নাড়ী টানিয়া আনিত না।

বাড়ীঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখা মাত্রই অনুভব হইত এ বাড়ীতে লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। গৃহের অভ্যান্তরে প্রবেশ করিলে হৃদয় মন শীতল হইত। ব্যারাম প্রবেশ করিতে ভয় পাইত। ব্যাধি পাপ, ময়লাতেই ইহার আবাস ভূমি, ময়লাই ইহা ভালবাসে, ময়লাতেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সুতরাং সাদা পরিষ্কার স্থানে যায় না, যদিও যায় সভয় চিত্তে যায়।

রামশরণ বড় ভাগ্যবান। স্ত্রী কুৎসিতই হউক, আর অপরিষ্কারই হউক গৃহীরপক্ষে যে রত্ন তাহার আর ভুল নাই। এখন গৃহে না থাকিলে গৃহ নানা সাজে সজ্জিত থাকিলেও শূন্য, কেবল শূন্য কেন? শ্মশান। কাজেই রামশরণ যে ভাগ্যবান তাহার আর ভুল কি? তাঁহার যশঃ চারিদিকে বহিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগম বৃদ্ধি পাইতেছে, এখন তাঁহার বড় অবসর নাই, ব্যবসার অনুরোধে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে হয়, কোন দিনই রিক্ত হস্তে বাড়ী আসিতে হয় না, অনেকে বাড়ীতে আসিয়াও টাকা দিয়া যায়। যখন যাহা পান তাহা মাতৃসমা ভ্রাতৃবধু উমাসুন্দরীর হাতে দেন। পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে আসিলে শরীর মন জুড়ায়, হরসুন্দরীর সুবন্দোবস্তে যখন যাহা আবশ্যক তাহাই হাত বাড়াইয়া পান। পরিধান বস্ত্রগুলি পর্য্যন্ত নিজের বিন্যস্ত করিয়া রাখিতে হয় না, হরসুন্দরীর হাসি হাসি মুখ দেখিয়া, তাঁহার নির্ম্মল বিশুদ্ধ প্রেমপূর্ণ কথা শুনিয়া তাঁহার মন শান্তিসলিলে অবগাহন করে। এই পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ অনুভব করে। এহেন রত্নের পোষণের পর্য্যন্ত ভাবনা নাই, কোনরূপ আবর্জ্জনা আসিয়া স্পর্শ করিবে তাহার আশঙ্কা নাই। উমাসুন্দরীই আবরণ করিয়া

রাখিতেছেন, তাহার মায়ার অমৃতময়ী অঙ্কে প্রতিপালিত হইতেছে, রামশরণের কেবল উপভোগ করা মাত্র। এ সুখ সকলের ভাগ্যে ঘটে না কেন? সকল নর নারী এ স্বর্গসুখের সরল পথে পদচারণ করে না কেন? ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী দুষ্টা, পতি শঠ ও প্রবঞ্চক, মিত্র কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক, ভৃত্য উত্তরদায়ক, ভ্রাতা স্বার্থপর, জ্ঞাতি শত্রু হইয়া, গৃহকে অরণ্য করে কেন? স্বর্গসুখকে নরকযন্ত্রণায় পরিণত করে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? একি পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল? একি পূর্ব্বপুরুষগণের কর্ম্মফল? না আত্মকৃত ব্যাধির ফল? এসব চিন্তায় মন যায় না, মন যায় সমাজ-সংস্কারের দিকে। কি বিপদ! আমাকে আর তোমাকে লইয়া সমাজ গঠিত, তোমার ও আমার মন হিংসায়, স্বার্থে, ক্রোধে বিলাসিতায় পরিপূর্ণ, তাহার সংস্কার চিন্তায় মন না দিয়া নির্ব্বোধ বালকের ন্যায় স্বর্ণপত্রের আশায় ইন্দ্রধনুর মূলদেশে উপনীত হইতে আমরা সকলেই উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইতেছি। এ মরীচিকা মন্দ নয়। আমরা যেরূপ অসার তাহাতে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মরুভূমিতেই আমাদের প্রাণ বিসর্জ্জিত হওয়া উচিত। এ সফরীর ফড়ফড়ী, মাতালের উত্তম পাগলের ক্রন্দনে হৃদয়ে আর ব্যথা ধরে না।

রামশরণের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। চারিদিক হইতে অর্থাগম হইতেছে। লোকজন দাস দাসীর সংখ্যা বাড়ীতেছে; বাড়িতেছে বটে, কিন্তু হরসুন্দরীর বিলাসিতা বাড়িতেছে না। ধন জন বৃদ্ধির সহিত তাঁহার সংসারের কার্য্যের প্রতি উৎসাহ ও যত্ন বাড়িতেছে। কিন্তু হিন্দু পরিবার, নিতান্ত অর্থাগমের সহিত মিতব্যয়ী হইলেও উহাতে ব্যয় কমে না, বরং বাড়িতে থাকে। দেব-অর্চ্চনা, ব্রাহ্মণ ভোজন, স্বজাতির নিরন্ন ব্যক্তিদিগকে অন্ন বস্ত্রদ্বারা প্রতিপালন প্রভৃতি হিন্দুর নিকট অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত, সুতরাং এজাতির মধ্যে যক্ষের

অধিকার থাকে না। এই কারণে প্রায় সকলেই নিঃস্ব, তবে যাঁহার গৃহলক্ষ্মী সৎবিবেচিকা, বুদ্ধিমতী ও কর্ম্মনিষ্ঠা তাহারই ধন যায় না, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চিত হয় ও বাড়িতে থাকে, এই কারণেই রামশরণের ধন সঞ্চিত হইতেছে। তিনি আর এখন পেটের চিন্তায় আকুল নহেন, কোন ভাবনা নাই, চিন্তা নাই। সকলের সহিতেই সদালাপে, আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইতেছেন। অবসর সময়ে সাহিত্য অলঙ্কার পড়িয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেছেন। এখন সংবাদ প্রভাকর প্রভৃতি পত্রিকা বাহির হইয়াছে। জয়চন্দ্র পড়িয়া পাঠাইতেছেন, তিনি তাহা মনোযোগ ও আহ্লাদের সহিত পড়িয়া থাকেন। বিদেশীয় চিকিৎসাপ্রণালী আধুনিক ব্যক্তিরা উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া তাহার অনুসরণ করে, ইহা দেখিয়া তিনি বড় ব্যথা পান, নিজ শাস্ত্র সমর্থনার্থ নানারূপ প্রাচীন গ্রন্থ নিতান্ত যত্নের সহিত অধ্যয়ন এবং কার্য্যদ্বারা ফল প্রদর্শন করাইতে চেষ্টা পান। গোঁড়ামি প্রকাশ করেন না বলিয়া সকলেই তাঁহার কথাগুলি যত্নের সহিত মনে, এবং চিকিৎসা করাইতে ইচ্ছা না করিলেও তাঁহার ব্যবস্থা না নিয়া কাজ করে না।

এইরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত হইতেছে এমন সময়ে সেনপাড়া হইতে সংবাদ আসিল যে নীলকণ্ঠ সেন মহাশয় জ্বররোগে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, বাঁচিবার আশা মাত্র নাই। পত্রখানা পড়িয়া রামশরণ আকুল হইলেন। তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতরে যাইয়া উমাসুন্দরীর নিকট বলিলেন। তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। হরসুন্দরী অধীরা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উমাসুন্দরী রামশরণকে বলিলেন, "এমন সময়ে বিলম্ব করা উচিত নহে, অবিলম্বে হরকে লইয়া সেনপাড়া রওনা হউন। আমারও যাইতে ইচ্ছা করে কিন্তু পিতাঠাকুরের কাশী যাত্রা করার দিন হইতে মনন করিয়াছি অন্য কোথাও যাইব না, তাইতেই যাইব না।"

তাড়াতাড়ি দুইখানি পালকি আনা হইল, রামশরণ ও হরসুন্দরী সেনপাড়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দীর্ঘকাল পরে বাড়ী মুখি রওনা হইলে যাত্রা করা মাত্রই পথিমধ্যে নানা সন্দেহ ও ভয় মনে উপস্থিত হয়। বাড়া যাইয়া আত্মীয় স্বজনকে ভাল দেখিতে পাইব কি? মায়ার মূর্ত্তি মা, আরাধ্য দেবতা পিতা, প্রাণসমা পত্নী, স্নেহের ভাই ভগিনীদিগকে সুস্থকায় দেখিতে পাইব কি? কে জানে ইহাদের কাহারও যদি,—আর মন স্থির থাকে না, অস্থির হইয়া উঠে, উদাসে চারিদিক আধার দেখিতে থাকে, উপনীত হইয়া সকলের মুখ না দেখিলে আর প্রকৃতিস্থ হয় না। এত পিতার ব্যারামের কথা শুনিয়া হরসুন্দরী পিত্রালয় যাইতেছেন, তাঁহার হৃদয়ে যে দুর্ভাবনার তরঙ্গ উঠিতেছে তাহা থামিবার নয়। মৃত্যু যন্ত্রণাকে লোকে নিতান্ত ভয়ানক বলে; কিন্তু আমরা বলি এইরূপ অবস্থায় অন্তরে যে যাতনা উপস্থিত হয় তাহা ভয়ানক অপেক্ষা ভয়ানক, কারণ উহাতে কেবল নিরাশার যন্ত্রণামাত্র, ইহাতে নিরাশার যাতনা বেশী অনুভব করাইবার নিমিত্ত মাঝে মাঝে আশার বিজলী খেলা করে। হরসুন্দরীর চক্ষু হইতে জল পড়িতেছে না, পড়িবে কেমনে, দুশ্চিন্তার আগুনে সব শুকাইয়া ফেলিয়াছে, হৃদয় পুড়িতেছে। তাঁহার পালকি গ্রামের সম্মুখে আসিলে তিনি নিজ হস্তেই দ্বার উন্মুক্ত করিলেন, করিলেন বটে কিন্তু কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলেন না, পাছে পথিমধ্যেই কেহ কিছু বলিয়া ফেলে। যে মুখ দেখেন তাহাতেই তাহার সন্দেহ বোধ হইতে লাগিল। আবার পালকির দ্বার অবরুদ্ধ করিলেন, ভাল লাগিল না আবার খুলিলেন। এইরূপ করিতে করিতে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পালকি হইতে নামিয়াই তাড়াতাড়ি পিতার নিকট গেলেন। পিতাকে দেখা মাত্রই মনটা অনেক পাতলা হইল। নীলকণ্ঠ সেন মহাশয় বলিলেন, "মা এসেছ! বাবা আসে নাই?" হরসুন্দরী মাতার মুখের দিকে

চাহিলেন। তিনি উত্তর করিলেন "বোধ হয় এসেছে" এমন সময়ে রামশরণ তথায় উপস্থিত হইলেন। নীলকণ্ঠ সেনের মুখ প্রফুল্ল হইল। পুত্র, কন্যা, জামাতা এই পৃথিবীর মধ্যে এমনই আনন্দের ধন যে ইহারা নিকটে থাকিলে মৃত্যুযন্ত্রণাও লাঘব বোধ হয়। এমন সুখের ধন কাহার কাহার ভাগ্যে অসুখের হয় কেন। পুত্র পিতাকে গলগ্রহ, মাতাকে ধানের খোসা; জামাতা শাশুড়ীকে গুদাম, শ্বশুরকে গুদামরক্ষক ভাবে কেন? তাই ভাবি এ অমৃতেও গরল কেন?

নীলকণ্ঠ সেন মহাশয় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে আমাশয় হইয়াছে। পিতার কষ্ট দেখিয়া হরসুন্দরীর অন্তঃকরণে বিষম আঘাত লাগিতেছে। মাতা যেমন শিশুকে মল মূত্র প্রক্ষালন করিয়া সর্ব্বদাই পরিষ্কৃত রাখেন হরসুন্দরী সেইরূপ পিতার সেবা করিতে লাগিলেন। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি পিতার নিকট বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। রামশরণও ব্যাধির উপশমের নিমিত্ত যত দূর করিতে হয় তাহা করিতে লাগিলেন। নীলকণ্ঠ সেন মহাশয়ের বোধ হইতে লাগিল তাঁহার পিতামাতা যেন স্বর্গধাম হইতে আসিয়া তাঁহার ব্যাধির শান্তি করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন এবার তাঁহার পরিত্রাণ নাই। এ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, প্রাণসমা পত্নীকে আশ্রয়হীন করিয়া, নাবালক পুত্র দু'টীকে অনাথ করিয়া যাইতে হইবে, এই সব চিন্তা আসিয়া হৃদয়ে বিষম ব্যথা দিতে লাগিল। ইহা অপেক্ষা আরও গভীর চিন্তা আসিয়া অস্থির করিতে লাগিল :—কোথা হইতে আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি, কে আনিয়াছে, আবার কোথায় যাইতেছি কিছুই ত ঠিক করিতে পারিতেছি না, যদি আপন ইচ্ছায় এখানে না আসিয়া থাকি, আপন ইচ্ছায় এখানে থাকিতেও পারিব না, কিছুই যে সাধ্যায়ত্ত দেখি না, তবে আবার এ মায়া

মমতা কেন? এই স্থান পরিত্যাগ করিতে মন চায় না কেন? ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখে কেন? হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হয় কেন? মন কাঁদে কেন? কালী করুণাময়ী তোমার খেলা বুঝা ভার! আমার মন বড় অস্থির হইতেছে, হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইতেছি, মা, তুমি আমায় তোমার কোলে লইয়া, আমার ভয় দুঃখ দূর করিয়া, আমাকে সুস্থির কর, শান্তি প্রদান কর। আমি নির্ব্বোধ অজ্ঞ শিশু সন্তান, যাহা দেখি তাহাতেই ভয় পাই। তুমি মা আমাকে আবরণ করিয়া রাখ। এইরূপ নির্ভরের ভাবে নীলকণ্ঠের মনে শান্তি বোধ হইতে লাগিল। মৃত্যু সময়ে যে এইরূপ ঈশ্বরের মাতৃভাবের উপর নির্ভর করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে পারে তাহারই মৃত্যুযাতনা অনুভব হয় না।

হরসুন্দরী পিতার পথ্য প্রস্তুত করিতে গিয়াছেন। রামশরণও নিজ হস্তে একটি ঔষধ প্রস্তুত করিতে অন্য গৃহে গিয়াছেন। কমলা শুশ্রূষা পতির নিকট বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন। নীলকণ্ঠ সেন মহাশয় পত্নীকে বলিলেন, "এ ব্যাধি হইতে এবার আমার রক্ষা নাই, আজ কা'লের মধ্যেই আমায় তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে।" এই কথা শুনামাত্রই কমলা শুশ্রূষা দরদর করিয়া চক্ষের জল ছাড়িয়া দিলেন। নীলকণ্ঠের মনে বড় ব্যথা লাগিল; তিনি জীবনে এক দিনের তরেও কোন কথা বলিয়া তাঁহাকে কাঁদান নাই। তাঁহার চক্ষের জল পড়িলেই তাঁহার হৃদয়ে বিষম ব্যথা লাগিত। তিনি বলিতে লাগিলেন, "তুমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া এ সময়ে আমার মনে ব্যথা দিও না, একে রোগের যন্ত্রণাতেই অস্থির আছি, তাহার উপর আবার মায়া ঢালিয়া আমাকে আরও অস্থির করিও না। জন্ম মৃত্যু ইচ্ছাধীন নহে। মানুষ কর্ম্মফলে এখানে জন্মধারণ করে, কর্ম্মফল শেষ হইলেই ঈশ্বর লইয়া যান। তাইতেই বলি জন্ম মৃত্যুতে মানুষের হাত নাই। কর্ত্তব্য সাধনই ধর্ম্ম, তুমি সে

ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে থাক। হতাশের ছবি হৃদয়ে আঁকিয়া মন কাল করিও না, উহাতে কোন ফল নাই। কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাক, আরাধ্য দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন হও, নিরাশার সময়,—কেবল তাহা কেন—জীবন ভারবহ ও দীর্ঘ বোধ হইবে না। অনন্তকাল সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার তুলনায় মানবজীবনের স্থিতি কিছুই নয়, সমুদ্রের জলরাশির নিকট এক বিন্দু জলের পরিমাণ যেমন কিছুই নয় মানব জীবনের স্থিতি তাহা অপেক্ষাও কিছু নয়। এহেন জীবনে আবার সুখের গুরুত্ব কি? দুঃখেরই বা গুরুত্ব কি? সুখ বহে বহুক, না বহে দুঃখই বহুক, ক্ষতি কি? অভ্যন্তরস্থ জ্যোতি যে অনন্ত জ্যোতিতে মিশিয়া যাইবে তাহার আর ভুল নাই, তবে কথা এই যে, কাহার শীঘ্র কাহারও বা কর্ম্মদোষে বারংবার শোক তাপের বশবর্ত্তী হইয়া বিলম্বে মিশিয়া যায়। যাহাতে এই জীবনেই সমুদয় কর্ম্মফলের শান্তি হয় তাহাই করিও। উমা মায়ের দয়ার উপর একমাত্র নির্ভর করিও। আহার চিন্তায় ব্যাকুল হইও না, তিনিই অন্নপূর্ণারূপে তোমাদিগকে পোষণ করিবেন। আমি অবর্ত্তমানে তুমি নিজ ভিটা ছাড়িয়া পুত্রগণসহ কন্যা-বাড়ীতে গিয়া আশ্রয়গ্রহণ করিও না। রামশরণের নিকট কোন দিন কিছু চাহিও না, ও নিজ অভাব জানাইও না। সে যদি নিজ পুত্রসম জামাতা হয় তাহা হইলে নিজ ইচ্ছাতেই করিবে। আত্মীয় স্বজনের নিকট কিছু যাজ্ঞা করিও না, কারণ ভিক্ষাতে জীবন লঘু করে, ধর্ম্ম লাভ হয় না। যিনি মুখ দিয়াছেন তিনিই, আহার দিবেন, উহার নিমিত্ত কোন ভাবনা করিও না।"

ক্রমেই ব্যারামের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পিতার কষ্ট দেখিয়া হরসুন্দরী হৃদয়ে বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিলেন; পাইবারই ত কথা। মানব মনের স্বাভাবিক প্রকৃতি এই যে পরের কষ্ট দেখা মাত্রই সমবেদনায়

আঘাত হৃদয়ে লাগে। আপন জনের কষ্ট দেখিলে ত আর কথাই নাই; এই কারণে মাতা নিজ সন্তানের ব্যারামের যন্ত্রণা দেখিলেই উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উদাস ও ব্যাকুল মনে যাচ্ঞা করেন, "দেব দেব মহাদেব আর সহ্য হয় না, আমার এই নির্ব্বোধ শিশু সন্তানের ব্যথা আমাকে দিয়া উহাকে সুস্থ কর।" বৃদ্ধাবস্থায় কন্যাই মাতৃরূপ পরিগ্রহ করিয়া পিতাকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, মাতার মায়া, মমতা, সবই কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কাজেই পিতার যন্ত্রণায় হরসুন্দরীর হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা দিতে লাগিল। যদি শক্তি থাকিত তাহা হইলে নিজ শরীরে ঐ সকল কষ্ট ধারণ করিয়া পিতাকে সুস্থকায় করিতেন। অনেকে বলেন মানব নিজ অপেক্ষা অন্যকে বেশী ভালবাসে না, এ কথার প্রতিবাদ করিতে আমাদের সাহস হয় না, কারণ এ পৃথিবী এমনই একটি স্থান যে, ইহাতে যেই যাহা করুক কি বলুক তাহা অবিশ্বাস করিবার ক্ষমতা চিন্তাশীল ব্যক্তির নাই। জল জমিয়া প্রস্তরময় হয়, তাহার উপর দিয়া গাড়ী দৌড়ান যায়, আকাশের বিজলী ধরিয়া আনিয়া পত্রবাহকের কাজ করান যায়, জল ও আগুন একত্রে সমাবেশ করিয়া এমনি কৌশল করা যায় যে, তাহাদ্বারা উচ্চৈঃশ্রবা অপেক্ষাও দ্রুতবেগে চলা যায়। মানব সাধনার বলে এমনই অবস্থায় উপনীত হইতে পারে যে ইচ্ছা করিলে সূক্ষ্ম শরীরে এক স্থানে বসিয়াই নানা স্থানে যাইতে পারে, মৃত্যু ইচ্ছাধীন করিতে পারে, ভুতভবিষ্যৎ বলিতে পারে, এক সের চাউল কি এক খণ্ড রুটিদ্বারা সহস্রাধিক লোকের উদর পুরণ করিয়া খাওয়াইতে পারে। এ সমস্ত নিজে না দেখিলে মানব কখনই গ্রহণ করিতে চায় না বরং অসম্ভব বলিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না, সুতরাং মানুষ নিজ অপেক্ষা অন্যকে বেশী ভালবাসে না এ কথায় আমরা অবিশ্বাস করি না, কিন্তু ইহাও শুনিতে পাই যে, মাতা সন্তানকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত

কত সময়ে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন, স্ত্রী মৃত পতিকে আলিঙ্গন করিয়া চিতাতে ভস্মীভূত হইয়াছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের শোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইয়াছেন।

নীলকণ্ঠ সেন মহাশয়ের মুমূর্ষু কাল উপস্থিত। রোগের বড়ই বৃদ্ধি হইয়াছে। রামশরণ বুঝিতে পারিলেন অদ্য আর রক্ষা নাই, দিন পার পাইতে পারে, কিন্তু এ কাল রাত্রি প্রভাত হইলে আর এ শীর্ণদেহে প্রাণবায়ু আবদ্ধ থাকিবে না। ঠিক দুই প্রহরের সময় অবস্থা বড় খারাপ হইল, কমলা গুপ্তা পাথার ভাবিতে লাগিলেন। হরসুন্দরী মৃত্যু যাতনা হইতেও বেশী যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। বৈতরণীর যোগাড় হইল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত ঝটিকা বহি বহি করিয়া বহিল না, দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। কমলা গুপ্তা আশার মূল দৃঢ় করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় আবার খারাপ হইল, দেখিতে দেখিতে এটাও কাটিয়া গেল, চারিদণ্ড রাত্রি গেল, প্রহর গেল, সমস্ত পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে ঘেরিল। সকলই নীরব ও নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শিবার রব, ঝিল্লির রব, পেচকের শব্দ নিস্তব্ধতার গাঢ়ত্ব বেশী অনুভব করাইবার নিমিত্ত কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। রাত্রিটা ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। সেনপাড়ার সকলেই সুষুপ্ত, কেবল চারিটি জীবের নিদ্রা নাই, নীলকণ্ঠ সেন, কমলা গুপ্তা, হরসুন্দরী ও রামশরণ। একটি দীপাধারে প্রদীপ ক্ষীণালোক প্রদান করিতেছে। কমলা গুপ্তা অবসন্ন হৃদয়ে পতির শিয়রে বসিয়া ঘন ঘন ঔষধ খাওয়াইতেছেন। রামশরণ গভীর চিন্তার সহিত ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন, আর এক একবার নিবিষ্ট মনে চক্রদত্তের পাতা উল্টাইতেছেন। হরসুন্দরী বসিয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। রাত্রি দুই প্রহর হওয়া মাত্রই নীলকণ্ঠ সেনের ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মহাশ্বাসে পরিণত

হইয়া নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত খিচিতে লাগিল। হরসুন্দরী পতির মুখের দিকে চাহিয়া হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি আর একটি ঔষধ সেবন করাইলেন। এ ঔষধে ধরিল, শ্বাস কমিয়া গেল, নীলকণ্ঠ চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন। এ অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল ব্যারাম যেন একবারে চলিয়া গিয়াছে। কমলা গুপ্তা ও হরসুন্দরীর মন প্রফুল্ল হইল। রামশরণ নাড়ী ধরিলেন, দেখিলেন অসামান্য বেগে বহিতেছে। নিতান্ত হতাস হইয়া বিরস বদনে শ্বশুরের মুখপানে চাহিলেন। তিনি নিতান্ত ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "বাবা দীপ নির্ব্বাণ প্রায়, কর্ম্মভোগ শেষ। বাবা, এই সময়ে আমায় একটি মালসী গান শুনাইয়া আমার মনের গতি মায়ের চরণের দিকে প্রয়োগ কর। মৃত্যুকাল বড় সঙ্কটকাল, সে সময়ে হয় ত মায়ের ধ্যান করিতে পারিব না, তাই এখনই করি। কুম্ভকার চক্র আবর্ত্তন করিয়া ছাড়িয়া দিলেও তাহাদ্বারা ক্ষণকাল কার্য্য সম্পন্ন হয়। বাবা তুমি একবার ললিতকণ্ঠে মায়ের নাম গাও, আমি শুনি, লজ্জা নাই, উপযুক্ত পুত্র কি তৎস্থানীয় জামাতার মুখে ধর্ম্ম গান বড় মিঠা, বড় শান্তিপ্রদ, এই বলিয়া নয়ন নিমীলিত করিয়া বক্ষে হস্ত রাখিয়া কর জপিতে লাগিলেন। রামশরণ গাহিতে লাগিলেন :—

মন স্মর তাঁরে এ সঙ্কটকালে,
আমি ভাবি পাথার দেখি আঁধার—
তুমি তরিবে কোন বলে॥
যে করে ভাবনা যেমন, সিদ্ধি হয় রে তার তেমন,
দেখনা যথা কুমিরা পোকার—
রূপলভে, আরশুলে ভাবি মৃত্যুকালে॥

তাই বলি ওরে মন, মায়ের পদে হওরে মগন
একালে, তাতে হবে লাভ মোক্ষফল
ভবসিন্ধু তরবে অবহেলে ॥

রাত্রি অবসান হইল, প্রভাত হইল। প্রভাত কাল! কি ভয়ানক কাল! এই সময়ে যে কত জনের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, কত মাতার অঙ্ক হইতে অমৃত পুতুল, কত পত্নীর প্রেমের মূর্ত্তি, কত অন্ধের যষ্টি, কত অনাথিনী মাতার অন্নদাতা, এই লীলাময়ী পৃথিবী হইতে বিচ্যুত হইয়া কালের চিরান্ধকারময়, অনাবিষ্কৃত, অপরিজ্ঞেয়, স্থানে ডুবিয়া গিয়া একবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা কে করিতে পারে। এ ভয়াল আতঙ্কময় সময়ও পার হইল। বিহঙ্গমগণ কলরব করিয়া উঠিয়া বৃক্ষ শাখায় বসিয়া গান করিতে লাগিল, মাতিয়া উঠিয়া সমস্ত গগনে সুধা ঢালিতে লাগিল, প্রাতঃসমীরণ প্রস্ফুটিত কুসুম হইতে গন্ধ লইয়া সমস্ত দিকে ঢালিতে লাগিল, সূর্য্যদেব দিঙমণ্ডল স্বর্ণাভরণে ভূষিত করিতে লাগিলেন, প্রকৃতিদেবী নানা সাজে সজ্জিত হইয়া সকলকে আমোদিত করিতে চেষ্টা পাইলেন, পাইলেন বটে কিন্তু নীলকণ্ঠ সেনের গৃহে সুধা ঢালিতে পারিলেন না, সকলের মনকেই আসন্ন শোকের আঁধারে ঢাকিয়া রাখিয়া এ সকলই কাল করিয়া ফেলিল। প্রকৃতি! তুমি সুখের পায়রা, সুখের সময়েই তুমি সুখ দিতে পার দুঃখের সময় তুমি কিছু নও, সে সময়ে কেবল সেই অনাদি অনন্ত পুরুষ মাত্র ভরসা।

দেখিতে দেখিতে তিন চারি দণ্ড বেলা হইল। নীলকণ্ঠ তাঁহাকে বাহির করিতে ইঙ্গিত করিলেন। রামশরণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তিনি নিজ কপালে হাত দিলেন। রামশরণ বুঝিতে পারিলেন ঘরে মৃত্যু হইলে অগতি হইবে। আশঙ্কায় তিন শিরে হাত দিলেন।

তিনি আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে বাহির করিতে প্রস্তুত হইলেন। ক্রন্দনের রোল পড়িল, স্ত্রী পুত্র কন্যা মাথা কুটিয়া কাঁদিতে লাগিল। আর কাঁদিলে কি হইবে? কর্ম্মভোগ শেষ হইয়াছে, আর রাখে কে। যথা বিধি বৈতরণী হইল, নীলকণ্ঠের প্রাণবায়ু অনন্ত বায়ুতে মিশিয়া গেল।

কোন জল জন্তুদ্বারা বিনষ্ট হইলে অপর জনে যেমন ভগ্ন সাহস হইয়া অকূল পাথার নদীর দিকে চাহিয়া উদাস মনে অবসন্ন হইয়া পড়ে তিনি সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইলেন। বুঝিলেন তাঁহারও আসন্নকাল। কোন বিষয়ে আর তাঁহার আশা উত্তম রহিল না। পুত্রটিকে বিবাহ দিয়া কাশীবাসী হইবেন বলিয়া যে একদিন মনন করিয়াছিলেন সেই মনন এখন সংকল্পে পরিণত হইল।

নীলকণ্ঠ সেন মহাশয়ের শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেল। রামশরণ ভবদ্বীপে ফিরিয়া যাইবেন। হরসুন্দরী মাতা ও ভ্রাতাদ্বয়ের ভাবনায় বড় ব্যথিত হইলেন, হইলেন বটে কিন্তু পতিকে কোনরূপ সহায়তা করিতে কিছু-মাত্র বলিলেন না। তিনি বড় অভিমানিনী ছিলেন। নিজ স্বার্থের নিমিত্ত তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইত না। তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার পতি যদি এক মন এক প্রাণ হয়েন তাহা হইলে তাঁহার মনেও তুল্য কষ্ট হইবে, সুতরাং তিনি স্বতই এ সময়ে যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করিবেন। যদি না হয়েন করিবেন না। বাধ্য করিয়া প্রাণান্তেও কোন কাজ করাইবেন না। এ অভিমানে আমরা হরসুন্দরীকে দুষি না, বরং এইরূপ অভিমান যে স্ত্রীর থাকে তাঁহাকে আমরা মনের সহিত শ্রদ্ধা করি। এই ভাব বশতঃ রামশরণ হরসুন্দরীকে কেবল ভালবাসিতেন না, পূজা করিতেন। যাহাতে তিনি সর্ব্ব বিষয়ে সুখী হয়েন তাহাই তাঁহার পক্ষে অবশ্য করণীয় ছিল। তিনি কমলা ঠাকুরাণীকে বলিলেন, "মাতঃ, আপনি কোন দুশ্চিন্তা করিবেন না। আমি আপনার আশীর্ব্বাদে আমি এখন বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন করিতেছি। আমি জীবিত থাকিতে আপনার অভাব কি ?" জামাতার এইরূপে ভক্তি ও ভালবাসা-পূর্ণ কথা শুনিয়া কমলা ঠাকুরাণীর উত্তপ্ত হৃদয় বড়ই শীতল হইল। কিন্তু তিনি বলিলেন, "তাইত, তোমার মত পুত্র থাকিতে আমার কোন

ভাবনা নাই। তুমি আমাদের ভাবনা ভাবিয়া দুঃখ পাইও না, ঘরে যাহা আছে তাহাতে আমার অন্ন বস্ত্র একরকম চলিবে, যদি না চলে, তুমিই অবলম্বন। আমার এখন কোন সহায়তার আবশ্যক করে না। আবশ্যক হইলে জানাইব। রামশরণ জানিতেন ঘরে বিশেষ কোন সঞ্চিত ধন নাই, মনে মনে ভাবিলেন যেমন কন্যা, তেমন মাতা,—ভালবাসাপূর্ণ, মায়াপূর্ণ, অভিমানপূর্ণ।

রামশরণ সস্ত্রীক বাড়ী চলিয়া গেলেন। কমলা গুপ্তা নিজের যে দুই চারিখানি গহনা ছিল তাহা সমুদয়ই বিক্রয় করিলেন, ইহা হইতে যে আয় হইল তাহা ও ঘরে যাহা ছিল তাহাতে ছয় শত টাকা হইল এই টাকাগুলি লগনি করিয়া রাখিলেন। মাসিক ছয় টাকা সুদ পাইতে লাগিলেন, ইহাদ্বারাই নিতান্ত কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন করিতে লাগিলেন। পুত্র দুইটিও নিতান্ত সুশীল, বিদ্যানুরাগী ও প্রতিভাসম্পন্ন, এবং এই অল্প বয়সেই ধর্ম্মানুরাগী। মাতা পিতার সদগুণগুলি ইহারা উভয়েই পাইয়াছিল। দুই ভ্রাতা, টোলে ব্যাকরণ পড়িতেছেন। অধ্যাপক মহাশয় ইহাঁদের স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ে বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত। প্রতিদিনই টোল হইতে আসিয়া সাধ্যানুসারে সংসারের কাজ করেন। কেহ বা বৃক্ষের শুষ্কশাখা সংগ্রহ করিয়া মাতার রন্ধনের সহায়তা করেন। যাহা যোটে তাহাই আহার করেন, যে বস্ত্র সংগ্রহ হয় তাহাই পরিধান করেন। ভাল মন্দের দিকে দৃষ্টি নাই, দৃষ্টি কেবল বিদ্যা উপার্জ্জনের দিকে। কমলা গুপ্তার সংসার দরিদ্রতার সঙ্গে সঙ্গে যেরূপ শান্তিতে চলিতেছে এরূপ শান্তি কোন ধন কুবেরের ঘরে আছে কি না সন্দেহ।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মণ রায় ও তাঁহার স্ত্রীর সংসার পরিত্যাগ করার পর হইতেই যুগল রায় মহাশয়ের বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার সংসার হইতে লক্ষ্মী অন্তর্ধ্যান হইয়াছেন। কয়েক দিন পরই খবর আসিল নায়েবের অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে। ইহাতে তিনি আরও হতাশ হইয়া পড়িলেন। বুদ্ধিমান ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারি এ জগতে বড় দুর্লভ, তাহাতে আবার প্রাচীন কর্ম্মচারি। অর্থ উপার্জ্জন অপেক্ষা রক্ষা কঠিনতর। তিনি কেবল উপার্জ্জন করিতেই শিক্ষা করিয়াছিলেন, রক্ষার দিকে তাঁহার মন যায় নাই। কাজেই তিনি চারি দিক আঁধার দেখিতে লাগিলেন। নানা চিন্তাতে স্বাস্থ্যের হানি হইতে লাগিল। মনে করিলেন, এখন দুই ভ্রাতাই কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া বিষয় রক্ষার্থ লিপ্ত হইবেন। পুত্র দুটিও এখন অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন।

দীনেশ ও গণেশ বাবুর বিবাহ করার পর হইতেই খৃষ্টান হওয়ার রোকটা অনেক কমিয়াছে। এক এক বার মনে করেন উক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, আবার মনে হয় এমন ভালবাসা পূর্ণ মিঠা মুখ দুইখানি পরিত্যাগই বা কেমনে করি? ইহার কি কোন সমাবেশ হইতে পারে না? এইরূপ চিন্তায় তাহাদের মন তোলপাড় করিতেছে।

এই সময়ের অনেক পূর্ব্বেই রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এ দেশে তাহার সম্পূর্ণ মত বাহির হয় নাই। কেবল দুই একটি গান মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ গাহিয়া থাকে। "মনরে ভ্রান্তি

তোমার আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার" এ গানগুলি শুনিতে ভাল লাগে বটে, কিন্তু এ গুলিও একরূপ মালসী গান বলিয়া দীনেশ ও গণেশ বাবু গ্রহণ করিতে বড় অভিলাষী হইলেন না। এইরূপ কাল চলিয়া যাইতেছে এমন সময় রাজধানী হইতে একজন ব্রাহ্মণ সদর-আলা এই সহরে বদলি হইয়া আসিলেন। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী, একজন বিচক্ষণ লোক, ইংরেজী, পারস্য ও সংস্কৃত ভাষাতে বিশেষ অধিকারী, ন্যায়বান, সৎবিবেচক আদর্শ চরিত্র বিশিষ্ট। তিনি আসিয়াই "একমেবা দ্বিতীয়ং" মত প্রচার করিতে লাগিলেন। জাতিভেদ কিছু নয়, ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই, ঈশ্বর নিরাকার, সাকারে তাঁহার পূজা করা ভ্রান্তি মাত্র, প্রভৃতি নিতান্ত প্রাচীন মতগুলি নূতন আকারে প্রচার করিতে লাগিলেন। সহরে বড়ই হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সমাজ-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইল, আবালবৃদ্ধ সকলেই সমাজ-গৃহে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণকে বেদিতে বসিয়া বেদের এক ঈশ্বরবাদিত্ব মন্ত্র পাঠ করিতে শুনিয়া, "তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যুর্মাহ মৃতংগময়" প্রভৃতি নিগূঢ় ধর্ম্মের উপাসনা শুনিয়া হিন্দুমাত্রই মোহিত হইতে লাগিলেন; কিন্তু উপাসনান্তর জাতিভেদ সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত কথা বলিলেন তাহা অনেকেই গ্রহণ করিলেন না বরং উহাতে ঘৃণা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু রামমোহন রায় ও ঠাকুরপরিবারের ব্রাহ্ম-সঙ্গীত শুনিয়া সকলেই সাধকের গান বলিয়া সাদরে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্ম সদর-আলা মহাশয়কে আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের তীব্র সমালোচনা করিতে দেখিয়াও ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাবে কেহই দেখিলেন না, কারণ তাঁহার কোন কার্য্যেই হিন্দু আচার ও রীতিনীতির ব্যভিচার পরিলক্ষিত হইত না। নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারুন আর না পারুন জাতিভেদ কিছু নয়, এই কথাই বিশেষ আদরের

সহিত গ্রহণ করিয়া তাহা কার্য্যে দেখাইতে লাগিলেন। ইহাতে বড়ই হুলস্থুল পড়িয়া গেল। প্রাচীন সম্প্রদায় ক্ষেপিয়া উঠিলেন। রাজধানীর ঠাকুরপরিবারের ও মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্মভাবের বিমল জ্যোতিঃ তত্ত্ববোধিনী সমস্ত বঙ্গদেশে বিকিরণ করিতে লাগিল, লাগিল বটে কিন্তু আধুনিক সম্প্রদায়ের ঔদ্ধত্যে তাহা হিন্দুর হৃদয়ে সম্যকরূপে প্রবেশ করিতে পারিল না। ব্রাহ্মণ লুপ্তপ্রায় বেদের ব্যাখ্যা সাদরে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইল না, কেবল একটি মাত্র কথার নিমিত্ত, কথাটি জাতিভেদ না মানা,—নিজ জাতিতে যে খাদ্যের কথা শুনিয়া সিহরিয়া উঠে তাহা সন্তান সন্ততিদিগকে অবাধে খাইতে দেখিয়া এ ভ্রমের ফল দত্ত মহাশয় পরে নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা দিয়াও সংশোধন করিতে পারিলেন না। প্রাচীনেরা গ্রহণ করুন আর না করুন নব্য সম্প্রদায় সাদরে এই মত গ্রহণ করিতে লাগিলেন, কেহ ধর্ম্ম পিপাসু হইয়া কেহ বা স্বেচ্ছাচারের প্রশস্ত পথ ভাবিয়া। ইহাতে আর কোন ফল হউক আর না হউক প্রকারান্তরে হিন্দুজাতির একটি মহৎ উপকার হইল। সকলেরই খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি আগ্রহ রহিল না। এই কারণেই দীনেশ ও গণেশ বাবু গির্জ্জায় যাওয়া বন্ধ করিলেন। প্রতি রবিবারই সমাজ-গৃহে যান, সদা সর্ব্বদাই তত্ত্ববোধিনী পড়েন। মনে ভাল লাগে। হেট কোট পরা, আধা ইংরেজী ও আধা বাঙ্গলায় কথা কহা আর বেশী ভাল লাগে। ইঁহাদের এখন পাঠ সমাপন হইয়াছে। দীনেশ বাবু সিনিয়ার পাস করিয়া কালেজের স্কুলের একজন মাষ্টার হইয়াছেন। গণেশ বাবু বার বার চেষ্টা করিয়াও জুনিয়ারের উর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। জয়চন্দ্র, বিষ্ণুপদ ও হরিপ্রসন্ন সকলেই তাঁহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি কমিসনার আপিসের একজন কেরাণী হইয়াছেন; কিন্তু তিনি ধর্ম্মরাজ্যে সকলের অপেক্ষায় এক কাটি বাড়া হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণের

যজ্ঞোপবীত ছেঁড়া, পাঁওরুটি দুধে মিশাইয়া সত্যনারায়ণের প্রসাদ বলিয়া লোকদিগকে খাওয়ান, বিনাজলে, কখন কখন বা দাঁড়াইয়া সাহেবী কেতায় প্রস্রাব করিয়া লোকের কুসংস্কার দূর করিতে লাগিলেন।

যুগল ও কমল রায় মহাশয় এ সমস্ত দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। যুগল রায় মহাশয়ের পীড়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বুঝিতে পারিলেন এ রোগ হইতে তাঁহার আর মুক্তি নাই, অতএব কমল রায় মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া কাশী যাত্রা করিলেন। মনের আবেগে বিষয় সম্বন্ধে কোন লেখা পড়া করিয়া গেলেন না। কেবল যাওয়ার সময় দীনেশকে এই মাত্র বলিলেন, "তোমরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া আর যাহাই কর মেয়েটাকে আর বেশী দিন অবিবাহিতা রাখিয়া আমার নির্ম্মলকুলে কালী দিও না। তাহার বয়ঃক্রম প্রায় একাদশবর্ষ হইয়া আসিল। দশমবর্ষে পড়া মাত্রই আমার বিবাহ দেওয়া ইচ্ছা ছিল। উমার দশা সর্ব্বদা আমার মনে জাগরূক আছে। কন্যার বিবাহে আর আমার আমোদ নাই, তাহার উপর আবার তোমরা বাল্য বিবাহ বলিয়া আমার প্রতি চেষ্টাই নানারূপ গুপ্ত অভিসন্ধিদ্বারা বিফল করিয়াছ। তোমরা যাহা যাহা করিয়াছ আমি সবই জানিতে পারিয়াছি তবে পিতা পুত্রে বিবাদ সংঘটন বিষময়, সুতরাং আমি সে বিষ পান করিয়াছি, প্রকাশ পাইতে দেই নাই। কুলাকুলের বিচারের আর প্রয়োজন নাই, তোমাদের পরিচিত ও চেলা বিষ্ণুপদের সহিতই বিবাহ দিও। আবার বলি কন্যা যেন আমার গৃহে রজঃস্বলা হইয়া আমার সাতপুরুষ নরকগামী না করে।" দীনেশ বাবু এ কথাগুলি শুনিয়া কিছু দমিলেন। গণেশ বাবু চক্ষু লাল করিয়া, "Old fool, d'n early marriage" স্বগত বলিতে বলিতে অন্য গৃহে গেলেন, পিতা ও জেঠার চরণে তাঁহার মস্তক নমিল না।

রওনা হওয়ার সময় যুগল রায় মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ইহারা যোদ্ধা বটে, কিন্তু পিতৃহন্তা।" একথাটি দীনেশ বাবুর কর্ণে প্রবেশ করিল; কিন্তু যৌবনের উন্মত্ততা ও অনং জ্ঞানমদে ইহার গুরুত্ব তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

যুগল ও কমল রায় মহাশয়ের গৃহত্যাগ করার পর হইতেই দীনেশ বাবু বিষয় রক্ষার্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নানারূপ মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে লাগিল। সাক্ষী প্রভৃতির যোগাড় না করিলে মোকদ্দমায় জয়লাভ হয় না, সুতরাং বিষয়ও রক্ষা হয় না। এত বড় সম্পত্তিটা নাশ হইয়া যাইবে ইহাও প্রাণে সয় না, এক এক বার মনে করিতে লাগিলেন সমুদয় বিক্রয় করিয়া কোম্পানীর কাগজ করেন, কিন্তু তাহা হইলে জমিদার বলিয়া নামটা থাকিবে না, নাবালক ভাইদের অংশই বা কিরূপে বিক্রয় করিবেন, পিতা ও খুড়ার মৃত্যু হয় নাই, তাঁহারা কাশীবাসী হওয়ার সময় দান বিক্রয়ের সত্ত্ব লিখিয়া দিয়া যান নাই। মহাবিপদে পড়িলেন। যতই বিষয় রক্ষার্থ জড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন ততই সোজা হইয়া আসিতে লাগিলেন। নায়েব একদিন তাঁহাকে কোন মোকদ্দমার যোগাড় করিতে বলেন, ইহাতে তিনি নিতান্ত চটিয়া তাঁহাকে গালি দিয়াছিলেন। পরিণামে যখন দেখিলেন উহা না হইলে চলেনা তখন এই নীতির অনুসরণ করিতে লাগিলেন "সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠে না", "যে যেমন মানুষ তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত"। তবে শপথ করার এই একটু পথ রাখিলেন যে, তিনি নিজে কিছুই করিতেন না, নায়েব ও আমলারাই যাহা করার তাহাই করিত। দীনেশ বাবু এই বলিয়া মন দৃঢ় করিতে লাগিলেন, "একজন যদি আমার নিমিত্ত চুরি করে সে চোর, আমি তাহার নিমিত্ত চোর হইতে পারি না।" বিবেক! তুমিই মূর্ত্তিমান দুর্ব্বলতা, তুমি যেমন সামান্য কারণে অসহ্য ব্যথা পাও, সেইরূপ সামান্য কারণেই আবার আশ্বস্ত হইয়া সব ভুলিয়া যাও। ঊর্দ্ধগতিতে পা এগোয় না, নীচ হইতে যেন কে টানিতে থাকে।

অধোগতির দিকে এক পা ফেলিলে ধাঁ ধাঁ করিয়া তিন পা নীচমুখী চলিয়া যায়। কেহ কেহ নামিতে নামিতে আঁধার দেখিয়া আবার উদ্ধমুখী উঠিতে প্রয়াস পায়, কেহ বা চিরকালই আঁধারে ডুবিয়া থাকে। দীনেশ বাবু ধাঁ ধাঁ করিয়া নামিতে লাগিলেন। মিথ্যা মোকদ্দমাতে প্রজা উৎপীড়নে তাঁহার মনে রুচি হইতে লাগিল। গণেশ বাবুর কথা এখানে বলা অনাবশ্যক, তিনি ত পুণ্যাপরহ দাদার ভাই, সৎকর্ম্মে হউন আর না হউন অসৎকর্ম্মে দাদার উপর এক কাটি চড়া। তাঁহার মুখে সত্য কথা ছিল কি না, ইহা লোকে বহু কষ্টেও জানিতে পারেন নাই। তাঁহার ও তাঁহার দুইজন অনুচর সম্বন্ধে একজন গ্রাম্য কবি একটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। শ্লোকটির এক চরণ নিম্নে দেওয়া গেল—

"শত্তো তিয়া, ভুল সত্তো, সর্ব্ব মিথ্যা"

গণেশ বাবু এই শেষ সংজ্ঞায় পড়িয়াছিলেন।

পাঠক মহাশয়গণ, দীনেশ ও গণেশ বাবুর এই হঠাৎ পতন দেখিয়া আপনারা অবাক হইবেন না, আর পতনই বা কি? তাঁহাদের চরিত্র অর্থের নিমিত্ত এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, না হইবার কথা কি? অর্থের নিমিত্ত কে কিনা করিয়া থাকে? মাতা পুত্র বিক্রয় করে, মানব সমুদ্রগর্ভে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে, কামানের মুখে বিচরণ করে। সিংহের মুখে মস্তক ন্যস্ত করিয়া তামাসা দেখায়, সাপ ধরে, ছুরি গিলে আরও কত কিনা করিয়া থাকে।

দীনেশ ও গণেশ বাবু ইংরেজী জানাতে সাহেব মহালে উভয়েই খুব সরফরাজি লাভ করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রায় মামলা মোকদ্দমাতে জয়ী হইতে লাগিলেন। লোকে ভয়ে ত্যক্ত করিতে বিরত রহিল, বিরত রহিল বটে, কিন্তু দীনেশ ও গণেশ বাবু তাহাদিগকে ছাড়িলেন না। বেশ অর্থাগম হইতে লাগিল। মিতব্যয়ী না হইলে অর্থ থাকে না,

সুতরাং বাড়ীর অতিথিশালা উঠাইয়া দেওয়া হইল। বৈরাগি বৈষ্ণবের ফকির ফকরার ভাগ্যে অর্দ্ধচন্দ্র লাভ হইতে লাগিল। ব্রহ্ম-উত্তরভোগী কুলপুরোহিতগণ "ত্রাহি মাং মধুসূদন" ডাক ছাড়িতে লাগিলেন। প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুঠাকুর ও কালীঠাকুরাণীর নাখারাজ দেব-উত্তর না থাকিলে তাঁহাদের যে কি দশা হইত তাহা বলা যায় না। অর্থলালসার বশবর্ত্তী হইয়া দীনেশ বাবু ধর্ম্মভাবে জলাঞ্জলি দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম নামটা ছাড়িতে পারিলেন না। প্রতি রবিবারেই সমাজে যাওয়া আছে। মাস মাস চাঁদা দেওয়া আছে। রাজার বাড়ীর মত বাসাবাড়ী, নিজেরাই এখন কর্ত্তা। জমিদারে ছেলে লোকজনের অভাব নাই, টাকা কড়ীর অভাব নাই। প্রতি শনিবারই রাত্রিতে সিলেক্টেড পার্টি লইয়া ছলিমের খানাতে ভোজ হইয়া থাকে। সকল ধর্ম্মের সারই গ্রহণ করা উচিত অতএব খৃষ্টধর্ম্মের মত অনুসারে flesh and blood ও কিছু কিছু গ্রহণ করা হইতে লাগিল। উভয় ভ্রাতাই এইরূপে উন্নতির পথে ধাঁ ধাঁ করিয়া উঠিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুপদ লোকমুখে শুনিলেন যে, পিতা তাঁহার বিবাহের চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রকৃত প্রস্তাবে অতিশয় প্রবল ছিল। তিনি ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভ্রান্তিমূলক হিন্দুধর্ম্ম অনুসারে বিবাহ করিতে হইবে। যাহাকে বিবাহ করিবেন সে আবার বালিকা, বালিকাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবেন, সে এ ধর্ম্ম-বন্ধনের কি বুঝিবে? এই সব কথা বারংবার চিন্তা করিয়া অস্থির হইতে লাগিলেন। পিতাও পূজনীয়, বিবাহ না করিলে পিতার হৃদয়ে অসহ্য ব্যথা লাগিবে, এ কথা ভাবিয়া বিষম কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। মনের আবেগে কাঁদিতে লাগিলেন। ধর্ম্মই বেশী না পিতা মাতাই বেশী ইহা ঠিক করিতে সমর্থ হইলেন না। এই উভয় সঙ্কটে

হৃদয়ে নরক-যন্ত্রণা অপেক্ষা বেশী যন্ত্রণা অনুভব করিয়া দিন যামিনী কাটাইতে লাগিলেন। ধর্মভাব অপরাজিত রহিল। মন নিতান্ত দৃঢ় করিয়া পিতার নিকট লিখিলেন যে, তিনি নিজ মতের বিরুদ্ধে বিবাহ করিবেন না। পিতা মাতার হৃদয়ে কষ্ট দেওয়া যে অধর্ম্ম এ কথাটি বিষ্ণু বাবু চিন্তা করিয়া দেখিলেন না। দেবনাথ চৌধুরী মহাশয় যদিও নিতান্ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তথাপি নিতান্ত ক্রোধী ছিলেন। এই পত্র পাওয়া মাত্রই ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইলেন ; কিন্তু তাঁহার এই একটি মাত্র পুত্র বই আর সন্তান নাই, তাহাতে আবার সহধর্ম্মিনী নিতান্ত মায়াশীলা, ভাবনা করিলে যদি পুত্রটি বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে পাগলিনী হওয়া অসম্ভব নয় সুতরাং কষ্টে মন স্থির করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, বিষ্ণুপদ লিখিয়াছে তাহার এখন বিবাহ করার মত নাই, এ মন্দ নয়, বয়স বড়বেশী হয় নাই, আমার ইচ্ছা কিছুকালের নিমিত্ত কাশীবাস করিয়া আসি।" তাঁহার সহধর্ম্মিনী জানিতে যে, তিনি যাহা একবার বলেন তাহা নিশ্চয়ই করেন, তিনি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষের জল ছাড়িয়া দিলেন। চৌধুরি মহাশয় নানারূপ প্রবোধবাক্যে একটু স্থির করিয়া কাশী রওনা হইয়া গেলেন। চৌধুরিজায়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন না। সহগামিনী হইতে ইচ্ছা হইল ; কিন্তু প্রাণের অপেক্ষাও বেশী পুত্রকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। স্বামিই বেশী না পুত্রই বেশী, গাছই ভাল না ফলই ভাল, সকল সময়ে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না।

এখন ধর্ম্মবিভাগে যেমন হুলস্থূল পড়িয়াছে শিক্ষা-বিভাগেও তদ্রূপ। ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারে প্রতি বিভাগেই অনেক পরিমাণ ইংরেজীওলা বাঙ্গালী প্রবেশ করিয়াছেন। রাজকীয় অনেক কাজই ইংরেজিতে হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসাদে অনেক বাঙ্গালী-সন্তানই ইংরেজের

বশবর্ত্তী। চিন্তাশীল রাজপুরুষগণ শিক্ষার সুফল দেখিয়া শিক্ষাদানরূপ মহাদান প্রায় পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। রিজলিউসন বাহির হইল, "শিক্ষার বিস্তারই সভ্যজগতের নীতি। বৃটিশ শাসনের এই নীতি আদর্শ। যাহাতে ধনী, নির্ধন, ছোট, বড়, সমভাবে সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে, যাহাতে কৃষক উলঙ্গগাত্রে কোট ও খালি পায় জুতা পরিতে সমর্থ হয় সেইটি একমাত্র করণীয় সুতরাং গ্রাণ্ট-ইন্-এইডফণ্ড, সার্কেল ফণ্ড প্রভৃতি নানাবিধ ফণ্ড সৃষ্টি হইল। ইহার প্রসাদে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মও প্রচারিত হইতে লাগিল। যে বিদ্যালয়ে যাও সেই বিদ্যালয়েই ব্রাহ্ম মাষ্টার কেবল তাহা কেন, পরিদর্শক হইতে তাঁহার আরদালী পর্য্যন্ত সকলেই ব্রাহ্ম। হিন্দুর মধ্যে মাষ্টার পরিদর্শকের মা ও স্ত্রী মাত্র। ভারতবর্ষ বড়ই আশ্চর্য্য স্থান। ইহার উর্ব্বর ভূমিতে যাহা ফেল তাহাতেই যেমন আশার অধিক ফল ফলে, ইহার পর্ব্বতে যেমন জগতের যে ধাতু চাও তাহাই আছে, ইহাতে যেমন উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমের বায়ু বহিয়া থাকে ইহাতে যেমন মারাত্মক সর্প হইতে শান্ত প্রকৃতি মেষ-শাবক পর্য্যন্ত সমস্তই প্রভূত পরিমাণে আছে; এ দেশের ধর্ম্ম রাজ্যের অবস্থাও তদ্রূপ। আজ হিন্দুমত প্রচার হইল সকলেই হিন্দু, কল্য বৌদ্ধমত প্রচার হইল সকলেই প্রায় বৌদ্ধ। অদ্য জৈনমত প্রচার হইল অনেকেই জৈন, কল্য নানক এক নূতন মত বাহির করিলেন অনেকেই নানক-পন্থী। ইহাতেও ভারতবাসী তৃপ্তি মানিল না, সাঙ্খ্যদর্শন পড়িতে লাগিল, চার্ব্বাকদর্শন বড় মিষ্টি বোধ হইল। অনেকেই নাস্তিক হইলেন, কবি পর্য্যন্ত ঈশ্বর না মানিয়া দেব দেবী না মানিয়া "নমঃ কর্ম্মভ্যো" বলিয়া বন্দনা পড়িলেন। মুসলমানগণ মহম্মদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে

লাগিলেন। অনেক হিন্দু সন্তানই মুসলমান হইলেন। ইহাতেও উর্ব্বর ভারতভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইল না। চৈতন্যদেব পুরাণ হরির নাম নূতন করিয়া গাহিতে লাগিলেন, হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া হরির নাম গাইতে লাগিল। হিন্দুজাতির সৃষ্টি হইতে এপর্য্যন্ত এ ভূমিতে কত সহস্র ধর্ম্মের খেলা হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এমত অবস্থায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এমন ঝটিত প্রচার দেখিয়া অবাক্ হইবার কথা কি? তবে বাঙ্গলাতে সমস্তই যেমন তড়িৎ বেগে ছড়াইয়া পড়ে ভারতের অন্য অন্য প্রদেশে তত বেগে ছড়ায় না। ইহার কারণও উর্ব্বরতা এ দেশটা কয়েক শত বৎসর মাত্র হইল সমুদ্রতল হইতে উঠিয়াছে বলিয়া ইহার উর্ব্বরতা শক্তি বড় বেশী, সেই কারণেই সকলই নিতান্ত তাড়াতাড়ি জন্মে ও ফল প্রদান করে, এই কারণে এখানে মানুষ মাতৃস্তন্য ছাড়িয়াই পণ্ডিত হয়, ধার্ম্মিক হয়, সমাজ-সংস্কারক হয়, রাজনীতিজ্ঞ হয়।

পুরুষ-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার দিকে আধুনিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়িল। ধর্ম্ম শিক্ষা বিহিন শুধু লেখা পড়া শিক্ষা কোন কার্য্যকারক নহে অতএব সঙ্গে সঙ্গে তাহাও চলিতে লাগিল। বাঙ্গালী নারী এমনি অসামান্য উপাদানে গঠিত যে, ইহাকে যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে গঠন করিয়া লওয়া যায়। দীনেশ ও গণেশ বাবুর স্ত্রীদ্বয় এখন যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা এখন পতির সঙ্গেই থাকেন। উভয় ভ্রাতাই স্ত্রীশিক্ষায় রত হইলেন। তাঁহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, অল্পকালের মধ্যেই উভয়েই বাঙ্গালা পড়িতে শিক্ষা করিলেন। তবু তাঁহাদিগকে রাত্রিতে ভিন্ন দিনে কেহই পুস্তক হাতে লইতে দেখে নাই। এই লজ্জাশীলতার নিমিত্ত উভয় ভ্রাতাই মনে মনে একটু বিরক্ত ছিলেন, কিন্তু সাহস করিয়া মুখে কিছু বলিতে পারিতেন না কারণ দুই বধুরই অভিমান পূর্ণ মাত্রায় ছিল। তাহার উপর আবার রসিকতাচ্ছলে তীব্র সমালোচনায় উভয়েই

বিশেষ পটু ছিলেন, অথচ তাঁহারা পতিপরায়ণতার একশেষ ছিলেন। এক দিন গণেশ বাবু তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "তোমাকে কামিজ পরিয়া, জুতা পায় দিয়া আমার সহিত সমাজে যাইতে হইবে।" ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "তুমি যাহা বল তাহা আমার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু মাতা, যেরূপ কাপড় পরিয়াছেন, খাশুড়ী যেরূপ কাপড় পরেন ও যেরূপে চলাফিরা করেন, আমার সেইরূপই করিতে ইচ্ছা করে। আমি তাহাই করিব। তুমি না বল, এ পৃথিবীতে সকলেই স্বাধীন, তবে আমার রুচি তোমার রুচির অধীন করিতে চাহিয়া স্বাধীন ধর্ম্মের অবমাননা কর কেন"? ইহাতে গণেশ বাবু বিলক্ষণ চটিয়া বলিলেন, "তুমি আমার স্ত্রী, আমি যাহা বলিব তাহা তোমাকে করিতেই হইবে।"

"স্ত্রী যে এ কথায় আর ভুল কি? কেবল তাহা কেন? দাসী।"

"তবে দাসীর এত অবাধ্যতা কেন?"

এই কথাতে একটু অভিমানের সহিত মুখ লাল করিয়া তিনি বলিলেন "তুমি চক্ষু লালই কর, আর ইংরেজী বোলাই বল আমি গায় কামিজ দিয়া, জুতা পায় দিয়া, ইতর কন্যার মত লজ্জাতে জলাঞ্জলি দিয়া, পরপুরুষ ঠেলিয়া চলা ফিরা করিতে পারিব না। জুতার উপর দাম্নগুকাটা মল। বা! কেমন সুন্দর দেখায়! আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্ম কি পোসাক আর জুতায়? আর আমি সমাজেই বা যাব কেন? আমি জানি আমার কি ধর্ম্ম, তাহাতে উনিশ বিশ দেখিলে কাটিয়া ফেলিও, তোমার সেবা শুশ্রূষায় ত্রুটি দেখিলে পরিত্যাগ করিও, তোমার এ অশিষ্ট কথায় আমি ভয় পাইনা।

গণেশ বাবু পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন আগুন জ্বলিতেছে। তাঁহার ক্রোধ ভস্ম হইয়া গেল, এখন এ আগুন যে কেমনে নিবাইবেন তাহার চেষ্টাতেই অস্থির হইয়া পড়িলেন।

দীনেশ বাবুর কি অবস্থা তাহাও এখানে বলা আবশ্যক। তিনি মানুষটা একটু চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান, গোঁজামিল কোন কাজ করেন না। কার্য্যটি কৌশলে সম্পন্ন করিতেই তিনি যত্নবান। তিনি সদা সর্ব্বদাই স্ত্রীর সহিত ধর্ম্ম বিষয় লইয়া মিষ্টভাবে আলাপ করিয়া থাকেন। একদিন তিনি জাতিভেদ সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, "সকলেই এই বিশ্বমাতার সন্তান, তাঁহার চক্ষুতে সকলই সমান, ব্রাহ্মণ, শূদ্র আবার কি ?" তিনি যেসমস্ত যুক্তি প্রদান করিলেন তাহার প্রতিবাদ করিতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী পারিলেন না ; কিন্তু তিনি নিতান্ত উচ্চকুলের মেয়ে ছিলেন তাহাতে আবার বড় মানুষের ঘরে বিবাহ হইয়াছে, সেই হেতু তাঁহার জাত্যভিমান বড়ই বেশী ছিল সুতরাং এ যুক্তিগুলি তাঁহার মনে ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন, "ঠিক বলেছ, কেবল খাবার বিচার না করিলেই জাতিভেদ চলিয়া যায় না। তোমাকে পেঁজ রসুন রাঁধিয়া খাওয়াইতেছি, ইহাতেও ত দেখি পরিবারের হিন্দু নামটা একবারে গেল না। আমার ইচ্ছা ঠাকুরঝির বিবাহটা দাশু ভুঁইমালির পুত্র শরচ্চন্দ্র দাসের সহিত দিয়া ফেলি। শরত বাবু বেশ সুশ্রী, বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পাস করিয়া, এখন ইংরেজী পড়িতেছেন তোমার মুখেই শুনিয়াছি বাবুটি বিলক্ষণ ধার্ম্মিক, সমাজে খুব আইটের সহিত যাইয়া থাকেন। তবে তাঁহার পিতা দাশু ভুঁইমালি এখনও আমাদের পায়খানা সাফ করিয়া থাকে, তাতে কি ? শরৎ বাবু ত আর ওকাজ করে না। আর রমেশ ও খগেনের বিবাহটা আমাদের রহিম সরদারের মেয়ে দুটির সহিত হইলেই ভাল হইবে, মেয়েদুটি দেখিতে সুন্দরী, তোমাদের ইহাতে বেশ সুবিধা ও হইবে, তোমরা আমাকে কত কি রাঁধিতে বল, আমি তাহা পারি না বলিয়া তোমাদের মনে আর দুঃখ থাকে না, মুসলমানের কন্যা ঘরে আনিলে বেশ সুবিধা হইবে, বৈদ্যের কুলীনের মেয়ের কাজ তোমাদের নয়।" দীনেশ বাবু খাওয়া দাওয়াটা

সম্বন্ধে যেরূপই হউন, এদিকে বিলক্ষণ Aristocratio গোছের ছিলেন, এই গভীর ভাবসম্বলিত ব্যঙ্গ উক্তিতে কিছু দিশাহারা হইয়া বলিলেন, থাম, আমি উহাকে ভাল ঘরেই বিবাহ দিব। কোন ভয় করিও না।”

“আর দিবে কবে ? বারবৎসর উত্তীর্ণ প্রায়, বিয়ে দিয়ে আর কাজ কি ? গৃহস্থেরা সমুদয় লাউ উঠাইয়া নিয়ে একটা “বস” রাখে ও তাই থাকিবে।”

“না না, বাল্য বিবাহটা বড়ই খারাপ তাহাতেই দেরি করিতেছি।”

আমি হিন্দুর মেয়ে আমার পিতৃ, মাতৃ, ও শ্বশুরকুলে এই রীতি চৌদ্দ পুরুষ যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। উহাতে স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে কোন কলঙ্ক এ পর্য্যন্ত আসিয়া স্পর্শ করিতে পারে নাই। বড় ঠাকুরঝি পূর্ণ যৌবনকালে বিধবা হইয়াও সাবিত্রির মত পূজা পাইতেছেন। তাঁহারও বাল্যকালেই বিবাহ হইয়াছিল ; ইহাতে যে মন্দ কি তাহা আমি বুঝি না। মেয়ে বয়োধিকা হইয়া পিত্রালয়ে থাকিলে, বয়সের দোষে অনিষ্ট হওয়ারই আশঙ্কা এই বলিয়া নিরব হইলেন। কিছুকাল পর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পরিত্যাগ করিয়া নিজের উদরস্থ ছয় মাসের জ্রূণের উপর দৃষ্টি করিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, “জগদীশ্বর তুমি আমাকে কন্যা প্রদান করিও না, হিন্দুর কুলে যেন আর কন্যা না জন্মে!” দীনেশ বাবুর মুখ ও গম্ভীর হইল। বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে কত ওজস্বিনী বক্তৃতা, কত সারবান প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন, তাহার সার একটি হিন্দুকুলস্ত্রীর নিশ্বাস বায়ুতে তৃণবৎ উড়িয়া গেল। তিনি কিছু বলিলেন না ভগিনীর বিবাহের নিমিত্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

আমরা এখন সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার হইতে এ পর্য্যন্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক কত যে বিচিত্র পরিবর্ত্তন হইয়াছে, দিন দিন কত রূপই যে হইতেছে, আর কতই যে হইবে তাহা আত্মজাতির প্রতি সম্মান ও প্রীতির দৃষ্টি রাখিয়া, একটু স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলে পাঠক মহাশয়গণ নিজেরাই জানিতে পারিবেন। প্রতি গ্রামে গ্রামে প্রতি পল্লীতে পল্লীতে, কত উমাসুন্দরী, কত হরসুন্দরী, কত জয়চন্দ্র বিরাজ করিতেছেন। জয়চন্দ্রের বিচিত্র লীলা, রামশরণের সৌম্যভাব, উমা ও হরসুন্দরীর সুখ দুঃখময় কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিতে সাহস হয় না, কারণ দেখা বিষয় ও জানা কথা বলিয়া মনোরঞ্জন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, এই কারণেই জলাঞ্জলির ভিত্তিস্থাপন করিয়া পাঠক মহাশয়দিগের নিকট এখন বিদায় গ্রহণ করিলাম। আপনারা নিজ ইচ্ছামত প্রাসাদ গঠন করিয়া লইবেন। আর যদি এই অসারের দ্বারাই কার্য্যটি শেষ করিয়া লইতে ইচ্ছা করেন, সে প্রস্তুত; কিন্তু পাঠকের দয়া ও সহানুভূতি না পাইলে তাহাদ্বারা এ গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। এ অসার ক্ষমতা অনুসারে পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করে নাই, এখন সুখ্যাতি অখ্যাতি পাঠকের হাতে।